# বিদ্রোহী ভারত

(৩য় পর্ব)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

প্রথম প্রকাশ—আশ্বিন, ১৩৫৮
প্রকাশ করেছেন—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-১২
ছেপেছেন—কার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা,

৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা
প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা—নরেন মল্লিক
বেঁধেছেন—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স
দাম চার টাকা

'বিদ্রোহী ভারতে'র শেষ পর্ব প্রকাশের অতিরিক্ত বিলম্বের জন্য আমি লজ্জিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। কয়েকটি বিষয়ে 'বিদ্রোহী ভারতে'র তৃতীয় বা শেষ পর্বে অনিবার্যভাবে ত্রুটি থেকে গেল যেগুলো দ্বিতীয় মুদ্রণে নিশ্চয়ই আমি যথাসম্ভব সংশোধন করে দেবো। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটা ধারাবাহিক ইতিহাসই বিদ্রোহী ভারত ১ম, ২য় ও ৩য় পর্বে বর্ণনা করবার সাধ্যমত চেষ্টা করেছি একটি কাল্পনিক উপন্যাসের মাধ্যমে। 'বিদ্রোহী ভারতে'র একটি বিস্তৃত ভূমিকা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য লিখে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। এবং বন্ধুবর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'বিদ্রোহী ভারতে'র ৩য় পর্বের সুন্দর কবিতাটি লিখেছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ হ'তে সুরু করে যে যে কবির কবিতা হ'তে আমি চরণ বা পংক্তি এই পুস্তকে ব্যবহার করেছি এই সুযোগে তাঁদের প্রতিও আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি এবং যে সব লেখকের পুস্তক হতে আমি বিদ্রোহী ভারতের মালমশলা সংগ্রহের জন্য সাহায্য নিয়েছি তাদের প্রতিও আমার সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

/

অশ্বের খুরে ঝলসে আগুন—ঝলকায় তলোয়ার :
কাঁপে কানপুর—কাঁপিছে মীরাট—কাঁপে হিন্দুস্থান
ঝান্সীর রাণী, নানা তাতিয়ার রক্তের স্বাক্ষরে
কালপুরুষের পাণ্ডুলিপিতে লেখা হলো ইতিহাস।

লেখা হলো ইতিহাস :
চৌরিচোরায়, কত ধলঘাটে, জালিয়ানওয়ালায়
বুড়ীবালামের বলিমণ্ডপে আহুতির উপচারে
শৃঙ্খল-ভাঙ্গা দিনগুলি জাগে অমর মরণ লয়ে।

*　　　*　　　*

স্বাধীনতা এল—আকাশে জেগেছে নবজাতকের দিন :
ধন্য হল কি রক্তের অভিসার ?
তোমার আমার জীবনের 'পরে গুরুভার দুঃসহ
কাঁটাবন আর শঙ্খচূড়ের ফণা—
কিউ কণ্ট্রোল—কালোবাজারের অযুত অক্টোপাস ;
এপারে গঙ্গা ওপারে গঙ্গা—ভারত-পাকিস্তান
মাঝখানে বালুচর।

আমাদের বালুচর—
যূথিবন নেই—বিকচ কেতকী কোথা,
ভাগাড়ের হাড়ে হাতছানি দেয় প্রেতপঞ্চাশ সাল,
এল কি বন্ধু নবজাতকের দিন ?

গুরু গুরু মেঘ কোথা ধমকায় কালবৈশাখী আসে,
ক্ষাত্রবিনাশ কোটি কোটি মুঠি মৌর্বী-কিণাঙ্কিত
তেলেঙ্গানায়, গোল্ডেন্ রকে, তেভাগার মাঠে মাঠে
কতদূরে স্বাধীনতা ?
মরা বালুচরে, ভাগাড়ের হাড়ে আমরা স্বপ্নাতুর :
তুমি আর আমি স্বাধীন মানুষ আকাশে তুলেছি মাথা !

আজো পথে পথে ফণিমনসায় শঙ্খচূড়ের ফণা—
আশা নেই—নেই আলো ?
ওইতো মেদিনীপুর !
পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয় ;
বুকের ভেতরে জ্বেলেছি মশাল—সমুখে ত্রিবাঙ্কুর !

# বিদ্রোহী ভারত

তাদের আমরা ভুলি নি !

ভুলতে পারি না। সুজলাং সুফলাং ভারতের এই মাটি। শত শহীদের বুকের রক্তে রাঙ্গা এই ভারতের মাটি। এর প্রতি ধূলিকণায় কণায় শুকিয়ে যাওয়া রক্তকণিকাগুলো রেণু রেণু হয়ে মিশে আছে। বাতাসে এখানকার আজও শুনি দীর্ঘশ্বাস। বিহগের কলকাকলীতে শুনি সেই মরণজয়ীদের অতৃপ্ত কামনার অন্তিম গুঞ্জরণ। উড্ডীয়মান তেরঙ্গা পতাকার অশোক-চক্র আমাদের, স্মরণ করিয়ে দেয় যে—ফিরিঙ্গীর শ্বেত-চক্রতলে দীর্ঘ দুই শত বৎসর ধরে আমরা নিষ্পেষিত নির্যাতিত হয়েছি।

দীর্ঘদিনের সে যন্ত্রণা ত' ভুলবার নয়।

ভুলবার নয়।

কিন্তু তবু বুঝি ভুলেছি !

ভুলেছি আজকের এই দিনটি কত রক্তপিচ্ছিল সড়ক ডিঙ্গিয়ে এল ?—

অবিরাম কাশতে কাশতে ভলভল করে খানিকটা তাজা লাল রক্ত গলা দিয়ে বের হয়ে এল।

সতী স্তম্ভিত হয়ে বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

চর্মসার শুষ্ক হাড়-জাগানো মুখখানার মধ্যে কেবলমাত্র দু'টি চক্ষু যেন আজও শানিত ছুরির ফলার মতই ঝকঝক করছে।

রুক্ষ তৈলহীন রেশমের মত চুলগুলো খোলা বাতায়ন পথে আসা সাগর-বাতাসে উড়ছে এলোমেলো হ'য়ে।

পরিশ্রান্ত বিনয় তখনও হাঁপাচ্ছে।

'আবার যে রক্ত পড়া শুরু হলো বিনয় ?' কোন মতে কথা ক'টি উচ্চারণ করে সতী।

বিনয় কিন্তু হাসে।

মুমূর্ষু প্রদীপশিখার মতই ক্ষীণ হাসিটুকু।

ভেবে ভেবে বেদনায় ও দুশ্চিন্তায় সতীর সমস্ত মুখখানা বিবর্ণ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছে।

সতীর একখানা হাত নিজের রোগ-জীর্ণ কঙ্কালসার হাতের মধ্যে টেনে এনে পরম স্নেহে চেপে ধরে, মৃদু ক্লান্ত কণ্ঠে বিনয় বলে : হাঁ, রক্ত। ভয় পেলে সতী ?

'ভয় !—না।'

বিনয় বলে : দীর্ঘ নিষ্পেষণের রক্তরাঙ্গা পৃষ্ঠাগুলো আজ একটির পর একটি ঝরে পড়ছে সতী ! বিষাক্ত এ রক্তের প্রতিটি বিন্দু। তোমাদের অনাগত মানুষদের দিন আসছে। অন্ধকার কণ্টকে ভরা পথ ধরে আমরা যাত্রা সুরু করেছিলাম, সে যাত্রা আজ শেষ (?) হতে চললো। আমরা ত' চলে যাবো, তোমরাও আমাদের ভুলে যাবে, কিন্তু এই রক্তের ফোঁটাগুলো শুকিয়ে গেলেও এ নিঃশেষ হয়ে যাবে না। একদিন যে আমরা এই ভারতের মাটিতে বাস করে গিয়েছি, চলাফেরা করে গিয়েছি, এগুলো তারই স্মৃতিচিহ্ন হয়ে রইলো।

'কিন্তু আমার ! আমায় কি থাকলো ? অনাগত ভবিষ্যতের জন্য আমার কি থাকলো ?'—সতী বলে।

'জানি আমি তোমার দুঃখ, সতী! কিন্তু তার জন্যই বা দুঃখ কি? তোমার মত কত সতী, কত অনুসূয়া, তোমারই পাশে পাশে হয়ত আছে, চেয়ে দেখো। তোমার মত তাদেরও ঘর বাঁধবার স্বপ্ন এমনি করে হয়ত ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে গিয়েছে। বিদ্রোহী ভারতের এ তামস তপস্যার শেষ যেদিন, যেদিন সত্যিকারের হবে অবসান এই ঘন তিমির রাত্রির, সেই মুহূর্তটিতেই জানবে আমাদের ও তোমাদের নতুন করে জীবনযাত্রা শুরু হলো। তোমাদের ও আমাদের কামনা ছিল সেই মুহূর্তটিরই, না? সেদিনই আমরা বাঁধবো পৃথিবীর মাটির 'পরে নতুন করে আমাদের বাসা। আত্মার যদি সত্যিই শেষ না থাকে, মৃত্যুর পার হ'তে আবার আমরা ফিরে আসবো নতুন পরিচয়ে, নতুন নাম ও গোত্র নিয়ে, চিনে নেবো আমরা আমাদের; স্বাধীন দেশের ছেলেমেয়ে আমরা, গড়ে তুলবো নতুন করে নিজেদের ঘর বাড়ী এই পৃথিবীর মাটিতে।'

সতী তবু বিনয়ের কথায় কান দেয় না। বলে: ডাক্তার চৌধুরীকে আজ একবার ডেকে পাঠাবো, হঠাৎ আবার রক্ত পড়া শুরু হলো কেন?'

'না। না। আর ডাঃ চৌধুরী নয় সতী। কি করবে আর ডাক্তার? এ রক্ত বন্ধ করবার মত তাঁর শক্তি কোথায়? ডাঃ বলবে এসে বুকটা আমার ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে, সেই ঝাঁঝরা পথে রক্ত ক্ষরে পড়ছে। কিন্তু তারা ত' জানে না এ রক্ত আমার বুক থেকে নয়, অন্তর থেকে, দেহের প্রতিটি কোষ থেকে চুঁয়ে চুঁয়ে প'ড়ছে। অনেক অনেক দিনকার জমা রক্ত হঠাৎ আজ বাঁধ ভেঙ্গে নেমে এসেছে; সমস্তটুকু ঝরে না পড়া পর্যন্ত ত' এর শেষ হবে না।' শেষের দিকে বিনয় হাঁপাতে থাকে।

সতীর চোখে আজ আর অশ্রু নেই—দৃষ্টি জুড়ে জ্বলে উঠেছে অকম্পিত এক আগুনের শিখা।

স্থির অকম্পিত অগ্নিক্ষরা দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে থাকে বিনয়ের মুখের দিকে।

কৈশোর থেকে যৌবন পর্যন্ত বিনয়কে ঘিরে সতী যে স্বপ্ন দেখেছিল, তার নিভৃত মনের আকাশে যে কল্পনার সাতরাঙা রামধনু জেগেছিল, আজ সবকিছু তার রৌদ্রতাপদগ্ধ চৈত্র-শেষের ঝরা পাতার মতই অগ্নিতাপে নিঃশেষে ঝরে ঝরে পড়ছে।

১৮৫৭র আগুন থেকে শুরু করে খণ্ডে খণ্ডে যে আগুনের শিখা বার

বার এই ভারতের মাটিতে জ্বলে জ্বলে উঠেছে এবং সেই আগুনে সত্যিকারের যারা পুড়ে মরেছে, যাদের পোড়া কঙ্কালগুলো আজও ভারতের পোড়া মাটিতে ছড়িয়ে আছে ; তাদেরই শ্মশানশয্যার পাশে পাশে আজ সেখানে যেন সে দেখতে পাচ্ছে আরো দু'টি নতুন কঙ্কাল।

বিনয় ও তার।

বিনয়কে সান্ত্বনা দেবে! কিন্তু কি সান্ত্বনা আজ আর সে দেবে ওকে ?

হাজারো দেশব্রতীর রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম যদি শেষ হয়েই থাকে, প্রায় পৌণে দুই শত বৎসরের দীর্ঘশ্বাসরোধী তমিস্রার অবসান সত্যিই যদি আজ অত্যাসন্ন হয়ে থাকে, ভারতের পোড়া মাটির নিভৃত গহ্বরে শিলীভূত কঙ্কালের বুকে যদি আজ সত্যিই প্রাণ-সঞ্জীবনীর স্পর্শ লেগেই থাকে, ত' লাগুক। কিন্তু তার তাতে কি লাভ ?

সে সৃষ্টিধর সান্ন্যালও নয়, বিনয় বোসও নয়।

সে সতী। সামান্য সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে একটি মেয়ে মাত্র।

সতী আবার বিনয়ের দিকে তাকাল : বালিশের .'পরে হেলান দিয়ে অর্ধশায়িত ভাবে পড়ে আছে বিনয়। ক্লান্ত চোখের পাতা দু'টি বোজা।

খাড়া খড়্গের মত নাক ; চকচকে মসৃণ রক্তহীন চর্ম ভেদ করে গালের দু'পাশের হাড় দুটো যেন উদ্ধত হয়ে জেগে আছে।

সামনের মেঝের দিকে তাকাল : অনেকখানি জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে আছে : কালো রক্ত, লাল নয়।

মৃত্যুর অমোঘ নির্দেশ জারী হ'য়ে গিয়েছে।

নিঙ্ড়ানো প্রাণনির্যাস! রক্ত নয় : প্রাণসঞ্জীবনী।

মুঠোভরে যেন দেশমাতৃকাকে অঞ্জলি দেওয়া হয়েছে।

বিনয় কি ঘুমিয়ে পড়লো ?

বক্ষের মৃদু উত্থান-পতন ধীরে—অতিধীরে যেন উচ্চারণ করছে মৃদুচ্চারিত নিঃশব্দ সতর্কতায় : আমি যাই !—আমি যাই—আমি যাই।

একটা বালতিতে করে জল ও খানিকটা ছেঁড়া কাপড় এনে সতী মুছে নিতে থাকে জমাট রক্তটা মেঝে থেকে ঘষে ঘষে।

এখন আর কালো নয়, বালতির সমস্ত জল রাঙা হয়ে ওঠে।

দুর্জয় বজ্র একটা আক্রোশে সতীর সমস্ত অন্তর যেন সহসা গর্জন করে

ওঠে' : চলে যাচ্ছে ! চলে যাচ্ছে ! ১৫ই আগষ্ট সাড়ম্বরে হচ্ছে ক্ষমতার হস্তান্তর ! কিন্তু এ রক্তের ঋণ কে শোধ করবে ?

দুই শত বৎসরের এই রক্ত-ঋণকে ! কে শোধ করবে ?

সরকারী ফতোয়া জারী হয়েছে : ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা-দিবসে গন্ধ পুষ্প মাল্যে পল্লবে সাজাবে ঘর-দুয়ার। জ্বালাবে প্রদীপ : করবে শুভ শঙ্খধ্বনি ।

কিন্তু তা না করে যদি এই সব শহীদদের প্রত্যেকের কবর রচনা করতো দেশবাসী এবং সেই শুভ চরমাকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তটিতে একটি করে জ্বালিয়ে দিত সেই কবরের 'পরে মাটির প্রদীপ—ছড়িয়ে দিত নিঃশব্দে একমুঠো সাদা ফুল ! লুটিয়ে পড়ে প্রণাম জানাত ! বলতো : তোমাদেরই স্মরণ করি সর্বাগ্রে। তোমাদের দুস্তর সাধনার বেদনাসিন্ধু মন্থন করে আজ আবির্ভূতা হয়েছেন দেশলক্ষ্মী। তোমাদের আমরা ভুলি নি ! ভুলতে পারি না।

তবেই না বোঝা যেতো সত্যিকারের স্বাধীনতা-উৎসব !

আজকার এই শুভদিনটির পশ্চাতে কত দুঃখ, কত বেদনা, কত রক্ত-পাতের ইতিহাসকে আমরা পার হয়ে এলাম এবং আজ যেখানে এসে পৌঁছেছি এও আমাদের পথের শেষ নয়।

এখনো অনেক পথ যে বাকী !

১৮৫৭র পর জুন ১০ই-এর এক চন্দ্রালোকিত রাত্রে প্রজ্বলিত বিপ্লবের মশাল হাতে, মীরাট হতে তৃতীয় অশ্বারোহী দল দিল্লী অভিমুখে ছুটে চলেছিল ; পশ্চাতে ফেলে রেখে প্রজ্বলিত ধূম্রাচ্ছন্ন আর্ত কোলাহল, মুখরিত রক্তাক্ত মীরাট শহর : সে যাত্রার ত' আজও শেষ হয় নি।

দিল্লী দূর অস্ত,।

দূর ! এখনো যে অনেক দূর !

শুধু নামেই স্বাধীন নয়, বা নামেই 'স্বাধীন ভারতবর্ষ' নয়।

বাঁচতে চাই ! মানুষ আমরা মানুষের মত বাঁচতে চাই !

শুধু ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, বেনিয়ার বেচা-কেনা নয়।

প্রাসাদের কোন আলোকিত কক্ষে বসে, এপক্ষ ও ওপক্ষের মধ্যে রাজকীয় উৎসবে ক্ষমতা-হস্তান্তর নয়। সত্যিকারের শোষকের হাত হ'তে শোষিতের হাতে তুলে দেওয়া—সম্প্রদান। মুক্তি ও স্বস্তির মন্ত্রোচ্চারণ।

আমরা যে ভুলতে পারি নি এই দিনটির জন্যই বার বার আগুন জ্বেলেছি।

আর সে আগুনের শিখা এখনো নেবে নি !

সিরাজের বুকের রক্তে মুর্শিদাবাদের মাটিতে যে বিপ্লবের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়েছিল, মহারাজ নন্দকুমার, মীরকাশিম, বাঘা যতীন, কানাইলাল বিপ্লবের যে মশাল এক হাত হ'তে অন্য হাতে তুলে দিয়ে গেল এবং যে মশালের অকম্পিত আলোকশিখাকে নির্বাপিত করতে ক্ষ্যাপা শ্বেতাঙ্গের স্বৈরাচার অন্ধ আক্রোশে বার বার ভারতবাসীর কণ্ঠ চেপে ধরেছিল, সে ইতিবৃত্তের পাতাগুলো ত' এত সহজেই উল্টে যাওয়া যায় না। ভোলাও যায় না!

তাই ত, মাইকেল ওডায়ারের দানবীয় নিষ্ঠুর জিঘাংসায় রাইফেলের গুলিবিদ্ধ জালিয়ানওয়ালাবাগ শহীদভূমি ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হ'লো।

তখনো যে রক্তদান শেষ হয় নি, স্বাধীনতার যজ্ঞাগ্নিতে সমিধ সংগ্রহ শেষ হয় নি। দিতে হবে ফাঁসির দড়িতে আরো কত প্রাণ। কারাগারের লৌহপ্রাচীরের অভ্যন্তরে লোকচক্ষুর অন্তরালে, নির্মম অত্যাচারের অলিখিত অনেক পর্ব যে তখনও বাকী!

ফিরিঙ্গীর অদ্ভুত কল্পনা-প্রসূত 'রৌলাট আইন' বিধিবদ্ধ হওয়ার তীব্র প্রতিক্রিয়া ও জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাযজ্ঞে তার পূর্ণাহুতি : চারিদিকে বিক্ষুব্ধ জনতা ভারতীয় তদানীন্তন নেতারা এগিয়ে এলেন, সবার পুরোভাগে এলেন উত্তর ভারতের সর্বপূজ্য অর্ধউলঙ্গ অবিসম্বাদী নেতা মহাত্মা গান্ধী।

গুলিবিধ্বস্ত পাঞ্জাবে কোন নেতাকেই প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো না, ফিরিঙ্গীর সামরিক আইনের বলে।

মহাত্মা ব্যর্থ হলেন।

ব্যর্থ হলেন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়।

অনাচার ও অকথ্য অত্যাচার তখনও চলেছে পাঞ্জাবের ঘরে ঘরে—ধূর্ত শয়তান ফিরিঙ্গী সেখানে কি নেতাদের প্রবেশাধিকার দেয়?

পদদলিত অত্যাচার-জর্জরিত ভারতবাসী,—কোটি কোটি ভারতবাসী, গান্ধীজীর নেতৃত্বে যেন নতুন আশার স্বপ্ন দেখতে লাগলো।

প্রথম বিশ্বসংগ্রামের পরে, মিত্রশক্তি তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করে', তুর্কী সুলতানের 'পরে নানাবিধ অপমানজনক সন্ধি-শর্ত আরোপ করে; ফলে ভারতের সমগ্র মুসলিম সমাজ বিক্ষুব্ধ ও আলোড়িত হয়ে উঠলো।

সূত্রপাত হলো খিলাফৎ আন্দোলনের।

ওদিকে তারও আগে প্রবল বিক্ষোভের মধ্যেও ১৯১৯এর ২৩শে ডিসেম্বর মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার, ভারত-সংস্কার-আইন ক্রমে বিধিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে।

সত্য। ফিরিঙ্গীর মত এমন বন্ধু (?) বুঝি আর ভারতের ছিল না।

কত না সংস্কার করলে তারা, কত না পরিকল্পনা!

তবু হলো না সন্তুষ্ট মূর্খ, নিরীহ ভারতবাসী, তবু অভিযোগ! তবু অসন্তোষ!

মণ্টেগু-চেম্‌স্‌ফোর্ডের শাসন-সংস্কার বা ভারত-সংস্কার-আইনের অন্য নাম ডায়ার্কি! অর্থাৎ আরো সোজা ও সরল কথায়, দ্বৈতশাসন পরিকল্পনা।

সঙ্গে সঙ্গে ভারতের প্রদেশগুলোতে দ্বৈত-শাসন শুরু হয়ে গেল।

দ্বৈত-শাসনে সবই স্বীকৃত হলো, হলো না কেবল ভারতীয় ব্যবস্থা-পরিষদে মহামান্য সদস্যগণের সৈন্যব্যয়, সিবিলিয়ান কর্মচারীদের বেতন অর্থাৎ ফিরিঙ্গীর ভারত সরকারের পোষ্যপুত্ত্রদের বেতন ভাতা ইত্যাদির ব্যাপারে ভোটদানের ক্ষমতা। কিন্তু কোন প্রস্তাব অধিকাংশ ভোটে অগ্রাহ্য হলে বড়লাট বাহাদুর তাঁর প্রতি শ্বেতাঙ্গেশ্বর কর্তৃক ন্যস্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে তা বহাল রাখতে পারবেন স্থির হলো। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ভারতীয় ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা-পরিষদগুলোর 'পরে বড়লাট ও প্রাদেশিক লাটদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হলো। মহাপ্রভুরা তাঁদের নিজের ইচ্ছা ও খেয়াল-খুশিমত অবশ্য নিজ দায়িত্বে (?) ছয় মাসের জন্য অর্ডিনান্স বা জরুরী আইন জারি করতে পারবেন। শ্বেতাঙ্গ রাজত্বে এই অর্ডিন্যান্সই ছিল ভানুমতীর খেলা। যা হোক, ওর মধ্যে আবার একটা হাস্যকর পরিকল্পনাও ছিল, অর্থাৎ ছয় মাস পরে ঐ অর্ডিন্যান্স বা জরুরী আইনের ব্যাপারটা ব্যবস্থা-পরিষদে পেশ করতে হবে। কিন্তু পরিষদ অগ্রাহ্য করলেও লাট বাহাদুরের আবার নিজ দায়িত্বে সেটাকে স্থায়ী আইনে পরিণত করবার ক্ষমতা থাকবে। অর্থাৎ তোমরা রাজী হও ভাল, বহুৎ আচ্ছা, না হও মরগে! হামারা বাত রহেঙ্গে।

শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত নীতি অনুসারে আর এক দফায় অভাগা ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারটুকুও এইভাবে সোজাসুজি অস্বীকার করা হলো।

রাজাধিরাজের মন্ত্রণাকক্ষে আইন প্রবর্তিত হল: এবং আইনবলে

প্রাদেশিক বিভাগগুলোকে দু'ভাগ করে, দেশ শাসনের পক্ষে আসল চাবিকাঠিটা অর্থাৎ রাজস্ব, পুলিস, আইন, আদালত সংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিজের হাতে রেখে, ফলোয়া করে নাম দেওয়া হলো—রিজার্ভ বা সংরক্ষিত। বাকী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি সংরক্ষণের ভুয়ো ভারগুলো সাড়ম্বরে দেশীয় লোকেদের হাতে তুলে দেওয়া হলো।

বহুৎ মিলা!

মুঠি ভর গিয়া!

আদাবরস্! স্তক্রিয়া!

জনাব খোদাবন্দ! আপকো মেহেরবানী। ওগো করুণাময়! তোমার করুণার অন্ত নেই।

সেলাম! তোমার বুটজুতাকে সেলাম!

এতবড় বঞ্চনার মধ্যেও সামান্য সান্ত্বনা রইলো হতভাগ্য ভারত-বাসীর, সাক্ষাৎভাবে ভোট দিয়ে প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকারটুকু পেলে তারা।

ক্রমে খিলাফৎ আন্দোলনে, এক সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর প্রবর্তিত অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হলো।

১৯১৯ খৃঃ জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের অমৃতসরের অধিবেশনে পাঞ্জাবের অত্যাচার অনাচারের বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২০ খৃঃ সেপ্টেম্বর মাসে লাল লাজপৎ রায়ের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে কলকাতায় গৃহীত হলো মহাত্মার অসহযোগ প্রস্তাব।

হাতিয়ার নয়, মারামারি কাটাকাটি নয়, অহিংস সংগ্রাম! অসহযোগ। No violence! Non-violence! Passive resistance!

পৃথিবীর দেশে দেশে জাতির মুক্তি-সংগ্রামে, কত অভিনব পন্থা কলা-কৌশলের পরিকল্পনার নিদর্শনই না আমরা পাই! কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে, অসহযোগের যে পরিকল্পনা—এর তুলনা নেই। অভূতপূর্বই নয় শুধু, অচিন্তনীয়। কল্পনাতীত, স্বপ্নাতীত।

পৃথিবীর ইতিহাস আবার যখন একদিন শতবর্ষ বা হাজারবর্ষ পরে রচিত হবে, এই অপূর্ব মহিমা—জাতির হিংসামথিত রক্ত-সাগরে ভেসে থাকবেন শ্বেতশতদলের মত মহাত্মা আর তাঁর অসহযোগ আন্দোলন।

ভারতের ইতিহাসে শক, হুণ, মুঘল, পাঠান, তাতার কত না জাতি এলো গেলো! পদচিহ্নক্ষত ভারতের এ মাটিতে কত স্মৃতি জড়ানো। এখানে দেখেছি আমরা রাজার ছেলে গৌতমের বৌদ্ধ-তপস্যা—তাঁকে স্মরণ করে সেই বাণী: সঘং স্মররং গচ্ছামি! শুনেছি নদের পাগল শ্রীশ্রীচৈতন্যের প্রেমগান: মেরেছো কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেবো না। দেখেছি তাতার দস্যু তৈমুরের রাজ্যবিস্তার, মহম্মদ তুঘলকের মত একাধারে মহাজ্ঞানী চিন্তাশীল অথচ উন্মাদ খেয়ালী সম্রাটের যথেচ্ছাচার। বাবরের প্রজাপ্রীতি, আকবরের হিন্দু-মুসলমান ঐক্য-সাধনা, শাহজাহানের প্রিয়ার লাগি দিগ্‌দেশাগত মণিমুক্তাপ্রবালখচিত দেশবিশ্রুত অপূর্ব মর্মরসৌধের প্রেম-স্মৃতি প্রতিষ্ঠা। ঔরঙ্গজীবের অহং প্রতাপ। মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর স্বপ্ন: এক ধর্মরাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত বেঁধে দিব আমি; দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণের ভগবতসাধনা, শুনেছি রামপ্রসাদের গান ও কালী-বন্দন। বিবেকানন্দের সমাজ ও ধর্ম সংস্কার। কিন্তু সব কিছুকে যেন ছাপিয়ে গিয়েছে, করেছে অতিক্রম এক অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসীর অহিংস সংগ্রাম-নীতি। সমগ্র ভারতের আত্মার যেখানে পড়েছে নাড়ীর বন্ধন। দেশে দেশে নতশিরে যাঁর সংগ্রাম ও সাধনাকে জানিয়েছে অন্তরের প্রীতি ও নমস্কার।

সমগ্র ভারতের আত্মা যার মধ্যে গন্ধে সৌন্দর্যে আপন কৃষ্টি ও সত্তায় প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে আপন মহিমায়—আপন গৌরবে।

হাজার বছর পরে হয়ত একদিন উত্তরমানুষের দল যখন শুনবে: একদা হিংসামত্ত পৃথিবীর বুকে এমনি একটি মানুষ এসেছিলেন, এই পৃথিবীরই মাটির বুকে যিনি পদচিহ্ন রেখে গিয়েছেন: কল্যাণ ও শান্তির সাধনায় যিনি আমাদেরই হাতে পিস্তলের গুলিতে হাসিমুখে প্রাণ দিয়ে গিয়েছেন—সেকি সত্যিই বিশ্বাসযোগ্য? না গল্পকথা, রূপকাহিনী?

তিনি বলেছিলেন: বাঁচবার পথ হিংসা নয়। রক্তারক্তি মারামারি নয়।

মানুষকে হতে হবে আরো মহৎ! আরো আরো ক্ষমাশীল।

কিন্তু যাক সে কথা।

বলছিলাম মহাত্মার অহিংস অসহযোগ পরিকল্পনা ও তাঁর প্রাণের কথা, তিনি বললেন: না। আর সরকারের কাছে দীনতম ভিক্ষুকের মত মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা নয়। সরকারের সাহায্য ও আশ্রয়কে

বর্জন করে এবার হতে অহিংস সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুক্তির একমাত্র পথ সেইখানেই।

আত্মশক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার।

শুরু হলো আন্দোলন, অভিনব অহিংস সংগ্রাম।

সরকারী বিদ্যালয়, আইনসভা, বিচার প্রতিষ্ঠান সব—সব বর্জন করো।

মাদকদ্রব্য বিদেশী পণ্য—করো, করো সব বর্জ্জন।

দেশের বুকে এলো যেন নব অভ্যুদয়ের এক সাড়া।

সচকিত হয়ে উঠল সহসা ভারতের অগণিত নরনারী।

নাই। নাই ভয়। হবে হবে জয়। খুলে যাবে এই দ্বার।

১৯২১ সাল। প্রিন্স অব ওয়েলস্ ভারতপরিদর্শনে আসবেন ২১শে নভেম্বর। ভারতবাসী মহাত্মার নির্দেশে ঘোষণা করলে হরতাল: যাও। ফিরে যাও।

হঠাৎ কোথাও কিছু নেই বোম্বাইতে শুরু হলো সংগ্রাম, মারামারি, রক্তারক্তি—দাঙ্গা!

মহাত্মার অন্তর উঠলো কেঁদে, বললেন: উপবাসই আমার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত! জলস্পর্শও করবো না। এ কি লজ্জা!

সরকারও ততক্ষণে ক্ষেপে উঠেছে: অর্ডিন্যান্স রচনা করে বজ্ররবে ঘোষিত হলো: স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী বেআইনী!

দেশবন্ধু, মোতিলাল, জওহরলাল-দেশের তদানীন্তন নেতারা লৌহশৃঙ্খল আবদ্ধ হয়ে রাজরোষে অন্ধকার কারাগৃহে প্রেরিত হলেন একের পর এক।

এদিকে মহাত্মা প্রথম 'করবন্ধ' আন্দোলন শুরু করবেন বললেন বার্দোলীতে।

১৯২২এর ৫ই ফেব্রুয়ারী: পীড়িত অত্যাচারজর্জরিত জনসাধারণ সহসা আবার গর্জন করে উঠলো: ভাঙ! ভাঙ! ভাঙরে কপাট। কারার ঐ লৌহকপাট!

গোরক্ষপুর জেলায় যুক্তপ্রদেশের অন্তর্গত ছোট একটি থানা চৌরি-চৌরায়, জনসাধারণের 'পরে সেখানকার শেতাঙ্গের খয়ের খাঁ একদল লালপাগড়ী ও তাদের কর্তারা যথেচ্ছ অত্যাচার করছিল। আচমকা কোণ-ঠাসা লগুড়াহত ক্ষিপ্ত পশুর মত সেখানকার জনসাধারণ ক্ষেপে উঠলো।

পিনাকীর প্রলয় ডমরু উঠলো বেজে, ডুম্-ডুম্-ডুম্।

জ্বলে উঠলো আগুন, লেলিহান শিখায় আকাশ লাল হয়ে উঠলো।

একুশজন কনেষ্টবল সহ দারোগা সাহেবকে সেই অগ্নিযজ্ঞে আহুতি দেওয়া হলো।

অহিংসায় চিরবিশ্বাসী মহাত্মার অন্তর এ সংবাদ শ্রবণে কেঁদে উঠলো: তিনি বললেন: জনগণ এখনো অহিংস সংগ্রামের জন্য দেহ ও মনে প্রস্তুত ত' হয় নি। অতএব বন্ধ কর অহিংস সংগ্রাম, বন্ধ কর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। ফলে ১২ই ফেব্রুয়ারী মহাজাতির অধিবেশনে বর্দোলীতে মহাত্মা প্রস্তাবিত 'করবন্ধ'-আন্দোলন বন্ধ করা হলো।

১৯২২এর ৫ই ফেব্রুয়ারীর অগ্নিকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ১২ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তার ভাল বা মন্দের বিচার আজ থাক্, কিন্তু সামান্য ঐ একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় পাতায় অগ্নিশিখা আবার নতুন করে দেখা দিল।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কারারুদ্ধ অনেক গুপ্ত বিপ্লবীকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল; এঁরা ছাড়াও আরো অনেক গুপ্ত বিপ্লবী স্বাধীনতা-সংগ্রামী যারা এতকাল ধরে সরকারের শ্যেনচক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করে, ভারতের সর্বত্র এখানে ওখানে আত্মগোপন করে সংগ্রামে লিপ্ত ছিল, তাঁদের মধ্যেও অনেকে মহাত্মার ঐ 'করবন্ধ' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণেচ্ছু হ'য়ে সংগ্রামে এসে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অন্তরের নিরুদ্ধ দুর্বার কর্মপ্রেরণা যা এতকাল মুক্তির পথ না পেয়ে অন্তরের মধ্যেই আবর্ত রচনা করে চলেছিল, সহসা মহাত্মা-প্রবর্তিত গণ-আন্দোলনের মধ্যে সে যেন মুক্তির ইশারা পেয়েছিল। তাই অতর্কিতে মহাত্মা যখন 'চৌরীচৌরা'র অগ্নিযজ্ঞকে প্রাধান্য দিয়ে অভিমানে নিজেকে দূরে টেনে নিয়ে বলে বসলেন: বন্ধকর 'করবন্ধ'-আন্দোলন। সংগ্রামীদের হৃদয়ে বিপ্লবের আগুন আবার জ্বলে উঠলো দ্বিগুণ হয়ে।

মানুষের কল্পনায় বহু উর্ধ্বে! মহাত্মার কল্পনা! সুখ দুঃখ হিংসা মান অপমানে গড়া সাধারণ মাটির মানুষ হয়ত বা তখনও মহাত্মাকে চিনতে পারেন নি। বাংলার পলাতক বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের দৌত্য নিয়ে এলেন অবনী মুখোপাধ্যায় রাশিয়ার পরিকল্পনায় ভাবতেও কমুনিষ্ট দল গড়ে তোল্‌বার বাসনা ও প্রেরণা নিয়ে।

দেশের তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে কমুনিষ্ট মতবাদ গড়ে উঠতে শুরু হলো। শুধু তাই নয়, সমগ্র ভারতে ব্যাপক গণ-আন্দোলন ও নানা গণ-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে লাগল একটি দুটি করে ক্রমে ক্রমে।

মহাত্মার মতবাদের সঙ্গে বিপ্লবী সংঘের গরমিল এবং তার তীব্র প্রতিক্রিয়ার ফলে দেশের জনগণের মধ্যে আবার দু'টো দল হয়ে গেল।

এক দল নরমপন্থী—অন্য দল চরমপন্থী।

সেই সঙ্গে ঐ প্রতিক্রিয়াকে কেন্দ্র করে শ্বেতাঙ্গ সরকারের চণ্ডনীতি আবার করলো ধারালো বিষাক্ত নখর বিস্তার।

যথেচ্ছ দানবীয় উল্লাসে অত্যাচার ও পেষণ আবার হলো শুরু।

কোণ-ঠাসা জর্জরিত পশুর মত আবার জনসাধারণ গর্জে উঠলো।

নাই! নাই ভয়! হবে হবে জয়।

অত্যাচারের নির্মম কশাঘাতে দেশের হাওয়া বিষাক্ত: সরকারের বেতনভুক গুপ্তচরের দল কুত্তার মত মানুষের গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে: আবার আকাশের কোণে দেখা দিয়েছে কালো মেঘ ও বিদ্যুতের ইশারা।

•

১৯২৩য়ের ৩রা আগষ্ট, কলকাতা শহরে—বেলা প্রায় গড়িয়ে এসেছে: মাঝে মাঝে দুএক পশলা বৃষ্টি হচ্ছে। বর্ষণক্লান্ত মেদুর আকাশ।

শহরের কর্মতৎপরতার বিরাম নেই।

এই বর্ষামেদুর অপরাহ্ণে বরেন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি চারজন যুবক সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবি পরিহিত হয়ে প্রবেশ করল শাঁখারীটোলা পোষ্ট-অফিসের মধ্যে।

টক্ টক্ ক'রে টেলিগ্রাফের আওয়াজ মাঝে মাঝে শোনা যায়।

পিওনরা যে যার ডাক বিলি করতে বের হয়েছে।

জন দুই কেরানী কেবল নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত।

পোষ্টমাষ্টার শ্রীঅমৃতলাল রায় মহাশয় তাঁর নিজের টেবিলে একটা মোটা খাতা খুলে কি সব লিখছেন: হঠাৎ পদশব্দে মুখ তুলে চাইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর তারা দুটি গোলাকার ও স্থির হয়ে গেল, সামনেই একজন মুখোশধারী, হাতে তার উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র। ইতিমধ্যে কখন সেই নিরীহ চারজন পথিক এসে পোষ্ট-অফিসের মধ্যে চূড়াও

হয়েছে। দলপতি বরেন্দ্র ঘোষেরই বজ্রনির্ঘোষ শোনা গেল : মাষ্টার মশাই, দেশের নামে ডাকঘরে আজ যত টাকা আছে দাবী করছি। ভালয় ভালয় দিয়ে দিন—নচেৎ দেখতেই পাচ্ছেন।

অমৃতলাল রায়ের মাথায় যেন বজ্র ভেঙ্গে পড়লো : অ্যাঁ অ্যাঁ একটা অস্পষ্ট শব্দ।

অন্য দুজন কেরানীও হতবাক্।

'সময় হাতে অত্যন্ত অল্প। তাড়াতাড়ি করুন।' আবার বজ্র-কঠোর নির্দেশ।

অমৃতলাল তবু ইতস্তত করছেন—সহসা চোখের সামনে অগ্নি ঝলক : ধোঁয়া বারুদের গন্ধ ও বিস্ফোরণের শব্দ।

দলপতির আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছে!

এর পর আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সমীচীন নয়—বিপ্লবীরা পলায়ন করে।

কিন্তু পোষ্ট-অফিসের কর্মচারী দুজন বাঙ্গালী, একজন কেরানী শ্যামদুলাল দাস, দ্বিতীয় প্যাকার হরিপ্রসাদ দাস বরেন্দ্রকে অনুসরণ করে পশ্চাদ্ধাবন করে—বরেন্দ্রও ছুটছে।

কর্মচারী দুজনও ছুটছে।

ছুটতে ছুটতে সামনেই সেণ্ট জেম্‌স্ স্কোয়ার : বরেন্দ্র তার মধ্যেই ঢুকে পড়ে।

স্কোয়ারে তখন সান্ধ্যভ্রাম্যমানদের ভিড় জমে উঠেছে : সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে পালাবার ফাঁকা রাস্তাও নেই!

বরেন্দ্র ধরা পড়ল।

পুলিসের জিম্মায় তাকে তুলে দেওয়া হলো।

অন্ধকার লৌহবেষ্টনী : শ্বেতাঙ্গের লৌহকারাগার : বরেন্দ্রর চোখের 'পরে ভাসতে থাকে সিন্দূরচর্চিতা ঢলঢল কমনীয় একখানি মুখ বুঝি।

মাত্র তিন মাস আগে সে বিবাহ করেছে, গৃহে নববধূ।

সেই রাত্রেই বরেন্দ্রর বাসস্থান খানাতল্লাসী করে পুলিস দু'টো রিভলভার পেল।

আবার শুরু হলো বিচার প্রহসন।

নির্ভীক সত্যাশ্রয়ী বিপ্লবী মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করলে : হাঁ, আমি দোষী। আমি হত্যা করেছি।

বিচারপতি শ্বেতাঙ্গ মিঃ পেজের আদেশ হলো : প্রাণদণ্ড! To be hanged till death!

অবশ্যি পরে রাজানুকম্পায় প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে বরেন্দ্রর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

আসল দলপতি এ-ব্যাপারের ছিলেন সন্তোষ মিত্র—পরবর্তী কালে যে সৈনিক ১৯৩১য়ে ১৬ই সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দী-নিবাসে পুলিসের রাইফেলের গুলিতে প্রাণ দিয়েছিলেন, এবং সকলেই ছিলেন শ্রীবিপিন গাঙ্গুলী মশাইয়ের দলভুক্ত।

যা হোক : চক্রীর চক্রান্তের অভাব হয় না—কর্মতৎপর শ্বেতাঙ্গ-পদলেহীদের প্রাণপণ চেষ্টায় এক বিরাট ষড়যন্ত্র মামলা খাড়া করা হলো—অভিযুক্ত হলো সন্তোষ মিত্র, গিরীন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি আরো কয়েকজন।

১৯২৩য়ের সেপ্টেম্বরেই ডাঃ যাদুগোপাল মুখুজ্জে, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী প্রভৃতি ১৯১৮য়ের '৩' নং আইনানুযায়ী গ্রেপ্তার হয়ে কারাগৃহে আটক হলেন।

ইতিমধ্যে দুর্দান্ত সরকারী গ্রেহাউণ্ড সুদক্ষ অনুসন্ধানী পুলিসের কর্তা চার্লস টেগার্টের অত্যাচারে জনসাধারণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছিল।

ইংলণ্ডের তথা ব্রিটিশ রাজশক্তির যে সব অনুচর ভারতের মাটিতে এসে অশান্তির আগুন জ্বালিয়েছে—মিঃ চার্লস টেগার্ট তাদের অন্যতম।

অতবড় সত্যিকারের সুদক্ষ পুলিস কর্মচারী ভারতে বড় একটা আসে নি।

টেগার্টের কর্মতৎপরতা ও কর্মশক্তি ছিল অনন্যসাধারণ।

বাংলার গুপ্ত সংগ্রামীদের অতবড় শত্রু আর দ্বিতীয় ছিলনা।

গুপ্তসংগ্রামীরা টেগার্টের তৎপরতায় সচকিত হয়ে উঠলো : সাড়া পড়ে গেল সংঘের মধ্যে—যেমন করে হোক ঐ গ্রেহাউণ্ডটিকে সরাতেই হবে।

এবং টেগার্টকে নিহত করবার সঙ্কল্প নিল গোপীনাথ নিজের মনে।

কলকাতার নিকটবর্তী হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে ক্ষেত্রমোহন সাহা লেনের একটি বাড়ীতে বাস করতেন মধ্যবিত্ত একজন গৃহস্থ শ্যামচরণ সাহা—তাঁরই কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীগোপীনাথ।

গোপীনাথ তখন বয়সে কিশোর, শ্রীরামপুর ইউনিয়ন ইন্‌ষ্টিটিউটের

নবম শ্রেণীর সামান্য একজন ছাত্র মাত্র। কিশোর-মনের কিশোর কল্পনায় রঙিন মনের রক্ত স্বপ্নে বিভোল!

কিশোর ক্ষুদিরামের মত কিশোর গোপীনাথও স্বপ্ন দেখেছিল বন্দিনী মায়ের শৃঙ্খল-মোচনের। আরো দশজন কিশোরের মত শুয়ে বসে, খেয়ে ঘুমিয়ে, গল্প করে জীবনের সহজ দিকটাকে সে গ্রহণ করতে পারে নি।

এ জীবন নহে নিশার স্বপন : এ বাণী পৌঁছেছিল তার দুকান ভরে।

দুর্গম পথে যাত্রা যাদের, পথে পথে তাদের কণ্টক বেদনা : মৃত্যুর হিম আবেষ্টনী তাদের কণ্ঠের ভূষণ, এ জেনেও সে দুরাশার সে ডাককে এড়াতে পারি নি।

কে দিয়েছিল তার কানে ও মরণমন্ত্র কে জানে?

মৃত্যুসংগ্রামীরা তখন বাংলার অন্ত প্রত্যন্তে ছড়িয়ে আছে : মাঝে মাঝে শুধু ঘোর অন্ধকারে বিজলীচমকের মত ঝিলিক হেনে চকিতে লুকিয়ে যেত।

এদেরই মধ্যে হয়ত কেউ কোন এক গভীর নিশীথে তার রুদ্ধ শয়নকক্ষের দ্বারে করাঘাত হেনে বলে গিয়েছিল : বাংলার কিশোর জাগো! আর ঘুমিও না।

দুর্ধর্ষ টেগার্টের কথা গোপী পূর্বে বহুবার শুনেছে : ব্লাডহাউণ্ডের মত সে বিপ্লবীদের অনুসরণ করে বেড়ায়. তাদের গতিকে দেয় বাধা!

অন্তত টেগার্টকেও যদি সে ইহলোক থেকে সরাতে পারে কিছুটা অন্তত সেবা করা হবে দেশ-মাতৃকার।

হায় রে! কিশোর-কল্পনা।

বুকের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়াতে লাগল স্বপ্নচারী কিশোর গোপীনাথ।

ব্লাড্‌হাউণ্ড চালর্স টেগার্টের শির চাই। রক্ত চাই।

অবশেষে এলো সেই চরম মুহূর্তটি : ১৯শে জানুয়ারী : কিন্তু উত্তেজনার মুখে গোপীনাথের হোল মুহূর্তের দৃষ্টিবিভ্রম।

ব্লাড্‌হাউণ্ড চালর্স টেগার্টের বদলে প্রাণ দিল গোপীনাথের গুলিবিদ্ধ হয়ে একজন নির্দোষ শ্বেতাঙ্গ।

১৯শে জানুয়ারীর শীতের সকাল।

কিলবার্ন অ্যাণ্ড কোম্পানীর কর্মচারী একজন শ্বেতাঙ্গ নাম আর্নেষ্ট ডে।

প্রত্যহ তার প্রাতঃভ্রমণের অভ্যাস। সেদিনও তিনি যথারীতি প্রাতঃকালে হাঁটতে হাঁটতে চৌরঙ্গীর হল অ্যাণ্ড অ্যণ্ডার্সনের দোকানের সুসজ্জিত শো'কেসের সামনে দাঁড়িয়ে জিনিষপত্র দেখছেন যেমন আরো দশজন পথিক পথ চলতে চলতে সহসা পথিপার্শ্বে কোন দোকানের সম্মান শো-কেসের দিকে চেয়ে দেখেন তেমনি সাধারণ কৌতূহলে : সহসা আচম্বিতে আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠ্‌লো : গুড়ুম। গুড়ুম।

রক্তাক্ত আহত মিঃ ডে আর্তচীৎকার করে লুটিয়ে পড়লেন রাস্তার 'পরে।

ভূপতিত গুলিবিদ্ধ প্রায় সঙ্গাহীন মিঃ ডের দেহের 'পরে আরো কয়েকটি গুলি উপর্যুপরি বর্ষিত হলো : দুম্ দুম্! দুড়ুম!...

গুলি চালিয়েই গোপীনাথ পিস্তল মুঠোর মধ্যে ধরে সোজা দৌড় দিল পার্ক ষ্ট্রীট ধরে।

ট্যাক্সী নিয়ে একজন ট্যাক্সী চালক রাস্তার ধারে দাঁড়িয়েছিল। গুলির শব্দে আকর্ষিত হয়ে ধাবমান গোপীনাথকে সে অনুসরণ করতে গিয়ে তলপেটে গুলিবিদ্ধ হয়ে রাস্তার 'পরেই লুটিয়ে পড়ল।

সামনেই একটা মোটর গাড়ি দেখে গোপীনাথ তাকে ওয়েলেস্‌লী ষ্ট্রীটের দিকে চালাতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু গাড়ীর চালক সম্মত না হওয়ায় সেও গুলি খায় গোপীনাথের হাতে। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে ওয়েলেস্‌লী ও রিপন ষ্ট্রীটের সংযোগস্থলে গোপীনাথ এক শ্বেতাঙ্গের হাতে ধৃত হলো।

তাড়াতাড়ি কয়েকজন কনেষ্টবলও ছুটে এলো ঘটনাস্থলে : গোপীনাথের দেহ অনুসন্ধান করে পাওয়া গেল : পাঁচ চেম্বারের একটি রিভলভার, একটি মশার পিস্তল, কতকগুলো কার্তুজ ও কার্তুজের কয়েকটা খোল।

মিঃ ডে পরদিন মেডিকেল কলেজে মারা গেলেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে জাগল প্রচণ্ড বিক্ষোভ—আন্দোলন।

সরকার পক্ষ হন্যে কুকুরের মত জিঘাংসাপরায়ণ হয়ে উঠলো।

কারাগারের লৌহ আবেষ্টনীর মধ্যে বসেই গোপীনাথ শুনতে পেল কত বড় সাংঘাতিক ভুল সে করেছে। টেগার্টের বদলে একজন নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে সে হত্যা করেছে : অনুশোচনায় চোখে বুঝি জল আসে।

'আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ
স্বর্গাদপি গরীয়সী ! আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী,
আমাদের মা নাই, ভাই নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই,
ঘর নাই, বাড়ী নাই। আমাদের আছে কেবল সেই
সুজলা সুফলা, মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্য শ্যামলা মা—'

একমাত্র অন্তর্যামী যিনি, যাঁর দু'টি চক্ষুর দৃষ্টিকে কোন কিছুই এড়িয়ে যায় না, একমাত্র তিনিই জানলেন কি যাতনায় উন্মাদ কিশোর আগুনের মধ্যে ছুটে গিয়ে ঝাঁপ দিয়েছিল।

কিন্তু হায় রে দুর্ভাগ্য, সমুদ্র মন্থনে উঠ্‌লো তীব্র কালকূট, কিশোর শূলী শম্ভু আঁজলা ভরে সেই হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে হলো নীলকণ্ঠ।

১৪ই ১৯২৪ সনে মহানগরীর চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে মাম্‌লা শুরু হলো : মিঃ ডে শ্বেতাঙ্গকে ইচ্ছাপূর্বক ( ? ) হত্যা ও অপর তিনজন ভারতীয়কে হত্যার চেষ্টার অপরাধে কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা অবস্থায় কিশোর গোপীনাথকে কাঠগড়ায় এনে দাঁড় করান হলো।

পাব্‌লিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর তারকনাথ সাধু কুখ্যাত তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ সরকারের পক্ষে মামলার উদ্বোধন করলেন।

নির্বিকার নির্ভিক কিশোর, প্রশান্ত স্থির ধীর বদনমণ্ডল কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে।

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের আইনের কূটজালকে ভেদ করে আসবার তারই অধীনস্থ—পরাধীন দেশের এক কিশোর বালকের পক্ষে সম্ভব নয়।

যে আইনের রজ্জুতে ইতিপূর্বে ক্ষুদিরাম, সত্যেন, কানাই প্রভৃতির দল প্রাণাঞ্জলি দিয়ে গিয়েছে তরুণ কিশোর গোপীনাথকেও সেই রজ্জুর বন্ধনেই আপনাকে সঁপে দিতে হবে এত জানা কথাই তার জন্য কেনইবা এত আয়োজন।

স্বাধীনতার পথ তৈরী হচ্ছে। কত প্রাণ দান, কত রক্ত তর্পণ হলো আর একটি প্রাণ, আর এক অঞ্জলি রক্ত দান, এই ত !

রক্ত সমুদ্রের আর একবিন্দু রক্ত !

অভিযোগ গুরুতর ( ? ) দেহ তল্লাসী করেও পাওয়া গিয়েছে একটা মশার পিস্তল, একটি পাঁচ চেম্বারের রিভলভার, কিছু কার্তুজ।

রডা কম্পানীর যে মশার পিস্তলগুলি সহসা একদিন অত্যাশ্চর্য উপায়ে পথিমধ্যেই অপহৃত হয়েছিল এখনো সেগুলো স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাতে হাতে ফিরছে সংগোপনে, সরকারের শ্যেন চক্ষুতেও ধূলি নিক্ষেপ করে।

দীপের আলো সে ত নিভবার নয়। রক্ত মশাল ফিরছে হাতে হাতে। স্বাধীনতার দুর্গম পথে পথে। গোপীনাথের জননী তখনও জীবিতা। মায়ের চোখে কিন্তু জল ছিল না। ছেলের কাছে তিনি আর তার জন্মভূমি ত পৃথক ছিল না।

বিদ্রোহী ভারতের বিদ্রোহী সন্তানের জননী তিনি।

গোপীনাথের বিবৃতি হলো যেমন চাঞ্চল্যকর তেমনি অগ্নিক্ষরা।

বিবৃতি প্রদানকালে মিঃ টেগার্ট অদূরে আদালতের মধ্যেই দাঁড়িয়েছিল। তাহার দিকে কটাক্ষ করে কিশোর বললে : আমি ঐ কুখ্যাত মিঃ টেগার্টকে ভাল করেই চিনতাম; তবে দুর্ভাগ্য, আমার মনের চাঞ্চল্যের জন্যই অবিকল মিঃ টেগার্টের মতই দূর থেকে মনে হওয়ায় একজন নিরপরাধ শ্বেতাঙ্গ আমার গুলিতে প্রাণ দিয়েছেন। সত্যই আমি দুঃখিত সেজন্য। এবং এই আমার অতিবড় দুঃখ থেকে গেল দেশের এতবড় একজন শত্রুকে আমি শেষ করে যেতে পারলাম না কিন্তু এই আশা নিয়েই আমি যাবো যে, এখনো এদেশে দেশ-প্রেমিকের অভাব ঘটে নি, নিশ্চয়ই কেউ না কেউ আমার অসম্পূর্ণ কার্যটুকু সমাধা করতে এগিয়ে আসবে।

মামলা হাইকোর্টে দায়রায় প্রেরিত হলো যথাসময়ে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী একদল চিরাচরিত শিখণ্ডী জুরীদের সম্মুখে রেখে বিচার প্রহসনের উপরে বিচারপতি পিয়ার্সন যবনিকা পাত করল : মৃত্যুদণ্ড। অর্থাৎ যা হবার তাই হলো! To be hanged till death!

১লা মার্চ ফিরিঙ্গী সরকারের ফাঁসীর রজ্জুতে হাসতে হাসতে নির্ভীক, স্বাধীনতায় পূজারী, তার শেষ রক্তাঞ্জলিটুকু দেশমাতৃকার চরণ তলে নিবেদন করে গেল এবং বলে গেলো : এই শেষ নয়। ডাক দিয়ে যাই।

ডাক দিয়ে গেল : আমার রক্তের প্রতি ফোঁটায় ভারতের ঘরে ঘরে স্বাধীনতার মৃত্যুবীজ রোপিত হোক! ডাক দিয়ে গেলাম। ডাক দিয়ে গেলাম। শোন [illegible]! শোন! কান পেতে শোন!

আকাশে বাতাসে শুভশঙ্খ নিনাদের মত সেই ডাক ছড়িয়ে গেল।

লৌহ ফাটকের বাইরে শ্রী সুভাষ প্রভৃতি কয়েকজন নেতা উপস্থিত ছিলেন কিন্তু প্রবেশাধিকার তাঁদের দেওয়া হলো না ভিতরে।

বেলা আটটারও পরে কয়েকজন আত্মীয়কে প্রবেশাধিকার দেওয়া হলো অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াটুকু মাত্র শেষ করবার জন্য।

লোকচক্ষুর অন্তরালে চক্ষের উদ্গত অশ্রুকে চক্ষেই চেপে অতিবড় আপনার জনের শেষকৃত্যটুকু তারা শেষ করে নিঃশব্দে কারাপ্রাচীরের অন্তরালেই শেষ স্মৃতিটুকু রেখে বের হয়ে এলো নিঃশব্দে। চিতাভস্মটুকু আনবারও তাদের অধিকার দিল না ফিরিঙ্গী কর্তৃপক্ষের দল।

তারা হয়ত ভেবেছিল এমনি করেই বিপ্লবের, বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিংগকে তারা নিভিয়ে দিতে পারবে। মূর্খের দল এইটুকু বুঝলে না যে আগুন বিদ্রোহী ভারতের অন্ত্য প্রত্যন্তে জ্বলে উঠেছে সর্বগ্রাসী লেলিহ শিখায় তাকে নিভিয়ে দেবার তখন আর তাদের সাধ্যও ছিল না। **My martyr may perish at the stake, but the truth for he dies may gather new buster from his sacrifice.**

* * গোপীনাথের ফাঁসীকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস মহলেও তীব্র প্রতিক্রিয়ার ঝড় বহে গেল।

মৌলানা আক্রাম খাঁর সভাপতিত্বে সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন গোপীনাথের কার্যের নিন্দা করলে বটে তবে তার উদ্দেশ্যের ভূয়সী প্রশংসাও করলে।

মহাত্মা কিন্তু করলেন তীব্র সমালোচনা।

এবং পরবর্তী ২৭—২৯শে জুন আহমদাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মহাত্মা গোপীনাথের দেশ-প্রেমের কথা স্বীকার করেও হত্যা কার্যের তীব্র নিন্দা করলেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন গান্ধীজীর প্রস্তাবের এক সংশোধনী প্রস্তাব এনে ঐ সব অকার্যের মূলেও যে, গভীর দেশপ্রেম নিহিত আছে সে কথাটা স্পষ্ট করেই বললেন। মহাত্মা ঐ অধিবেশনেই অসহযোগের আরো পাঁচটি ধাপ এগিয়ে গেলেন—বিদেশী বস্ত্র, আইন আদালত, স্কুল কলেজ, উপাধি ও ব্যবস্থাপরিষদ বর্জন করতে হবে জানালেন।

ঠিক ঐ সময় নানা স্থানেই হিন্দু মুসলমানে মারাত্মক দাঙ্গা উপস্থিত হয়।

দাঙ্গার প্রতিরোধ কল্পে মহাত্মা দিল্লীতে মৌলানা মহম্মদআলীর ভবনে ২২শে সেপ্টেম্বর দীর্ঘ একুশ দিন ব্যাপী উপবাস করলেন।

২৬শে সেপ্টেম্বর হ'তে ২রা অক্টোবর পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এক ঐক্য সম্মেলন হয়ে গেল যে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা যেন নির্বিবাদে যে যার ধর্মকর্ম সম্পন্ন করতে পারেন।

বলাই বাহুল্য মহাত্মাজীর উপবাস ও ঐ সম্মেলনের উদ্দেশ্য কার্যকরী হয়নি।

এ দিকে ফিরিঙ্গী সরকার বিপ্লবীদের পুনরুত্থানের আশঙ্কায় আবার তাদের দমননীতিতে উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌লো।

বহুলোককে বিপ্লবের অজুহাতে অক্টোবর মাসে অকস্মাৎ এক 'অর্ডিনান্স্' জারী করে কারাগারে নিক্ষেপ করলো—সন্ত্রস্ত আতঙ্কিত ফিরিঙ্গী সরকার ও তার চেলা চামুণ্ডারা।

১৯১৮ সনের 'তিন আইনের' বলে স্বরাজ্যদলের নেতাদের—দেশবন্ধুর সহযোগী শ্রীসুভাষ, শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ও শ্রীঅনিলচন্দ্র রায়কে বন্দী করে সুদূর মান্দালয় জেলে পাঠান হলো।

১৯২৪ সালের শেষভাগে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি জন সেবার জন্য এক অছি মণ্ডলীর হাতে তুলে দিলেন।

রাজর্ষি চিত্তরঞ্জন, বিখ্যাত তেলীরবাগের দাশবংশের রক্ত ধারার মধ্যে যে দানের নেশা ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল সেই রক্তের ঋণ যেন শোধ করলেন।

কণ্ঠখুলে দেশের জনসাধারণ সেদিন গেয়েছিল।

দেশকা বন্ধু চিত্তরঞ্জন, দেশকা সুহৃদ সওকাতালী।
খোদাকি পিয়ারা মহম্মদ আলি দেশকা পিতা গান্ধিজী।

ঐ বৎসরই মে মাসে ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন দেশবন্ধু। তিনি স্বরাজের মানে করলেন, ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতরে পূর্ণ স্বায়ত্ত-শাসন সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। এবং তদানীন্তন ভারত সচিব লর্ড বার্কেনহেডের আন্তরিকতা মেনে নিয়ে মাত্র দুটি স্বর্তসাপক্ষে ডায়ার্কি চালু করতে সম্মতি জানালেন—(১) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দান, (২) ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষের স্বরাজের দাবি সম্পূর্ণ স্বীকার এবং স্বরাজ প্রাপ্তির পূর্বে এর যথাযোগ্য ভিত্তি অবিলম্বে নিশ্চিত রূপে প্রতিষ্ঠা।

দুঃখের বিষয় তার পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হবার পূর্বেই চিত্তরঞ্জনের শরীর ভেঙ্গে পড়ল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক—বহুদিন হতেই নিরন্তর দুর্বিসহ সংগ্রামে লিপ্ত থাকায় শরীরের মধ্যে ভাঙ্গন ধরেছিল কিন্তু তিনি ইচ্ছা করেই যেন সেদিকে দৃষ্টি দেন নি।

কিন্তু আর এখন বিশ্রাম না নেওয়া ছাড়া দ্বিতীয় উপায় রইলো না।

দার্জিলিং শৈলে বিশ্রামের জন্য গেলেন ষ্টেপ্ এ্যাসাইডে কিন্তু দেশের দুর্ভাগ্য তাঁকে ফিরে পেল না আর তাদের মধ্যে।

১৬ই জুন রণক্লান্ত সৈনিকের দু'চোখের পাতায় চিরনিদ্রা নেমে এলো। দেশের শ্রেষ্ঠ কবি বললেন—

এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।

১৯২৪ সালের মে মাসে দক্ষিণ ভারতে শ্রীরামরাজুর নেতৃত্বে তহশীলদারদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়। শ্রীরামরাজুর দল কয়েকটি ফিরিঙ্গীদের থানা আক্রমণ ও লুঠ করে নিয়ে সংগ্রাম চালাচ্ছিল—মে মাসে দুর্দান্ত ফিরিঙ্গী শক্তির কাছে তারা পরাভূত হয়।

রামরাজু নিরুদ্দিষ্ট হলো।

দীর্ঘকাল আর তার কোন সংবাদই পাওয়া গেল না।

কুখ্যাত চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে ভ্রমক্রমে মিঃ ডে'র হত্যার মধ্য দিয়ে বহুকাল পরে যে, বিপ্লবের অগ্নি স্ফুলিংগ ভারতের আকাশে দেখা দিয়েছিল তারই আর এক বিরাট প্রস্তুতি অত্যন্ত গোপনে বাংলাদেশে চলছিল যাবজ্জীবন দণ্ডে দ্বীপান্তরিত ১৯১৫ সনের বেনারস ষড়যন্ত্র মামলার বিপ্লবী সন্তান শচীন্দ্রনাথ সান্যালয়ের নেতৃত্বে, তার ১৯২০ সনে মন্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন সংস্কার বলে কারাগার হ'তে মুক্তি প্রাপ্তির পর।

শুধু বাঙ্গলা দেশেই নয় কাশী ও লক্ষ্ণৌতেও শচীন সান্যাল, রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, যতীনদাস ও যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির আপ্রাণ প্রচেষ্টায় বিরাট একটি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠান ধীরে ধীরে গড়ে উঠ্‌তে লাগল।

এবং যার ফলে অকস্মাৎ একদিন—

১৯২৫ সনের ৯ই আগষ্টের রাত্রিতে অগ্নিস্ফুলিংগ দেখা দিল আকাশে।

প্রকৃতি সে রাত্রে উদ্দাম চঞ্চল, কালো কালির স্থায় মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে গিয়েছে।

উদ্দাম চঞ্চল হাওয়া সন্ সন্ করে বহে চলেছে। থেকে থেকে বিজলীর চমক্। গুরু গুরু মেঘের ডাক আর অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

ঐ দুর্যোগের মধ্যেও লক্ষ্ণৌ-শাহারানপুর লাইনের যাত্রীবাহী ট্রেনটা কাকোরী ষ্টেশন হ'তে ছেড়ে পূর্ণবেগে আলমনগরের দিকে ছুটে চলেছে।

বাইরে ঘন দুর্যোগ: গাড়ীর কামরায় কামরায় সব জানালাগুলো বন্ধ, যাত্রীরা নিশ্চিন্ত আরামে যে যার মত নিজেদের শয্যায় এলিয়ে পড়েছে।

লাইনের দুই পাশে ঘন জংগল ক্ষ্যাপা হাওয়ায় ওলোট পালোট করছে।

সহসা গাড়ীটা থেমে গেল একটা ঝাঁকুনী দিয়ে।

নিশ্চয়ই কেউ এলার্ম চেন টেনে চলন্ত গাড়ী থামিয়েছে নচেৎ হঠাৎ এমন করে গাড়ী থামবে কেন মধ্যপথে।

সত্যিই তাই, চলন্ত গাড়ীকে চেন টেনেই থামান হয়েছে এবং থামিয়েছে এক অসম সাহসী যুবক, শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

গাড়ীটা থামবার সঙ্গে সঙ্গেই একটা কামরা থেকে দরজা খুলে দশজন যুবক ও কিশোর একের পর এক লাফ দিয়ে ঐ বৃষ্টি ও ঝড়ের মধ্যেই নেমে পড়ল।

দু'একজন কৌতূহলী যাত্রী যারা জেগে ছিল ব্যাপারটা কি জানবার জন্ত গাড়ীর জানালার সার্সী তুলে উঁকি ঝুকি দেয়, কেউ কেউ বা কৌতূহলের বশে গাড়ী থেকে নেমেও পড়ে।

ওদিকে সেই দশজনের মধ্যে জনা পাঁচেক যুবক ততক্ষণে গার্ডসাহেবের গাড়ীর দিকে ছুটে যায় এবং বাকী যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের প্রত্যেকেরই হস্তে ধৃত গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে পাহারা দেয়।

তাদেরই মধ্যে একজন কৌতূহলী যাত্রীদের সম্বোধন করে বলে ওঠে, 'আপনারা যে যার কামরায় গিয়ে উঠে বসুন। যাত্রীদের কোন ক্ষতি করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমরা এই ট্রেনে যে সরকারী অর্থ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সেই অর্থ নিয়েই চলে যাবো।'

যুবকের কণ্ঠের সেই কঠোর নির্দেশ ও হাতে উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র দেখে কৌতূহলী যাত্রীর দল যে যার গিয়ে আপন আপন কামরায় ঢুকে পড়ে।

গার্ড সাহেবও একটু ব্যস্ত হয়েই গাড়ীটা হঠাৎ থেমে যেতে ব্যাপারটা কি জানবার জন্য গার্ড ভ্যান থেকে নেমে অনুসন্ধানের জন্য অগ্রসর হচ্ছিল সহসা তার পথরোধ করলে হস্তে ধৃত, উদ্যত আগ্নেয়াস্ত্র এক যুবক : আর এক পাও এগিয়েছো কি দেখতে পাচ্ছো আমার হাতে কি ! শোন ! তোমার আমরা কোন ক্ষতি করবো না। আমরা চাই মেলভ্যানে মেল ব্যাগের মধ্যে যে টাকাগুলো আছে সেইগুলো। আর যদি বাধা দেবার চেষ্টা করো you know—

আর বলতে হলো না।

গার্ড সাহেব ততক্ষণ কাঁপতে কাঁপতে হাটু ভেঙ্গে মাটিতেই বসে পড়েছে।

শুধু মাত্র ভয় দেখানর উদ্দেশ্যেই দলপতির নির্দেশে মধ্যে মধ্যে দু'জন যুবক রিভলভারের ফাঁকা আওয়াজ করছিল শূন্যের মধ্যে।

ফিরিঙ্গী ড্রাইভার ব্যাপার দেখে ইঞ্জিনের পাশেই লাইনের ধারে শুয়ে ভীত ত্রস্ত তখন গাইতে সুরু করেছে, God save the king ! Rule Britania.

ইতিমধ্যে অসমসাহসী যুবকের দল অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মেল ভ্যান থেকে লোহার সিন্দুক চাড় দিয়ে খুলে টাকার থলি গুলো হাতিয়ে দ্রুতপদে পাশের অন্ধকার জংগলের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

দুর্যোগের তখনও বিরাম ছিল না।

সমগ্র ব্যাপারটাই যেন একটা ভোজবাজীর মত ঘটে গেল মুহূর্তে।

ট্রেনের যাত্রী, চালক ও গার্ড সকলে যখন ধাতস্থ হ'য়েছে যুবকদল তখন পৌঁছে গিয়েছে নির্বিঘ্নে লক্ষ্ণৌ শহরে।

পরের দিন ইংরাজী, বাংলা, উর্দু, হিন্দি সমস্ত সংবাদপত্রে বড় বড় হেড্‌লাইন দিয়ে প্রকাশিত হলো দুঃসাহসিক সেই অভিযানের কাহিনী।

ষ্টেটসম্যান কাগজ ত' স্পষ্টই বললে এ ধরণের দুঃসাহসিক ডাকাতি নির্ভুল ভাবেই কোন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র সংক্রান্ত।

ডাকাতি ! ডাকাতিই বটে।

ফিরিঙ্গী সরকার সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো। গোয়েন্দা বিভাগের বড় বড় কর্মচারীদের উপরে ন্যস্ত হলো ঐ ঘটনার অনুসন্ধানের ভারটা।

ডালকুত্তার দল ঘ্রাণ শুকে শুকে ফিরতে লাগল, দীর্ঘ একমাস ধরে বাহাদুরের দল তদন্ত করে ধরপাকড় শুরু করে দিল বেপরোয়াভাবে। চুয়াল্লিশজনকে গ্রেপ্তার করা হলো।

অভিযুক্ত বন্দীদের লৌহকারাগারের অন্তরালে পৃথক পৃথক সেলে রেখে চিরাচরিত ফিরিঙ্গীর দমন, নির্যাতন ও প্রলোভনের দ্বারা প্রত্যেকের নিকট হ'তে গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহের অপচেষ্টা চলতে লাগল।

অধিকাংশ বন্দীই নির্যাতন এ প্রলোভনকে অতিক্রম করে গেল কিন্তু মীরজাফর উমিচাঁদের বংশধরদের অভাব এদেশে বড় একটা হয়নি—ক্লেদাক্ত দু'টি কীট এগিয়ে এলো, শাহজাহানপুরের বানারসীলাল কাকোশ এবং ইন্দুভূষণ মিত্র।

রাজকীয় সসম্মানে ঐ দু'জন হীন জঘন্য চরিত্র বিশ্বাসঘাতককে রাজসাক্ষীর সম্মানে জেল হ'তে স্থানান্তরিত করা হলো।

কিন্তু হায় এত পরিশ্রম করেও শ্রীরামদত্ত, শ্রীশীতলা সহায়, শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ, শ্রীকালিদাস বসু প্রভৃতি অভিযুক্ত পনের জনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই প্রমাণ করতে না পারায় তাদের সরকার মুক্তি দিতে একপ্রকার বাধ্যই হলো। বাদ বাকী ২৯জনের বিরুদ্ধে ১৯২৬ সনের ৪ঠা জানুয়ারী স্পেশাল ম্যাজিষ্ট্রেট আইনুদ্দীন সাহেবের এজলাসে, রাজার বিরুদ্ধে বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের জন্য, বে-আইনীভাবে অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করবার চেষ্টা এবং তদুদ্দেশেই চলন্ত রেলগাড়ী হ'তে সরকারী টাকা লুঠ করার অভিযোগে অভিযুক্ত করে নিয়ে বিচার প্রহসন শুরু হলো।

দীর্ঘ ৬৫দিন ধরে মামলার শুনানী চললো এবং ২৪৭জন সরকার পক্ষীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হলো।

লক্ষ্ণৌ আদালতে স্পেশাল জজ হ্যামিল্টনের এজলাসে ১৯২৬য়ের ৩রা মে আবার বিচার প্রহসন শুরু হলো। দীর্ঘদিন ধরে ঐ ২৯জনকে নিয়ে ফিরিঙ্গী সরকার মামলার জাল পেতে দেশবাসীকে বোঝাতে চাইল : দেখো কি সুবিচার আমরা করি।

সুবিচারই বটে।

নিজের জন্মভূমির 'মুক্তি সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে হয়েছি বিদ্রোহী, হয়েছি ষড়যন্ত্রকারী এ যে গুরুতর অপরাধ!'

এদিকে আদালতে জনান্তিকে সুবিচারের প্রহসন আর অন্য দিকে

কারাপ্রাচীরের অন্তরালে হতভাগ্য বন্দীদের প্রতি অকথ্য অত্যাচার ও দুঃসহ পীড়ন চলতে লাগল।

বহু বন্দীর স্বাস্থ্য সেই অত্যাচারে ভেঙ্গে পড়তে লাগল এবং অন্যতম বন্দী শেঠ দামোদর স্বরূপ অত্যন্ত অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন।

এত দুঃখ ও নির্যাতনেও কিন্তু বন্দীদের অন্তরের মধ্যে আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বহমান।

কোন ক্ষেদ নেই, কোন দুঃখ নেই।

জীবনের শেষ রক্তটুকু পণ করে যাঁরা শৃংখলিতা দেশমাতৃকার চরণে আপনাদের উৎসর্গিত করেছে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যে তারা জীবন নিঙড়ে রস আকণ্ঠ পান করে।

মৃত্যুঞ্জয়ী নীলকণ্ঠের দল।

দুঃখে যাদের জীবন গড়া

তাদের আবার দুঃখ কিরে!

সত্যিই ত! তাদের আবার দুঃখ কি!

আদালতে যখন সাক্ষীর পর সাক্ষী এসে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের বোঝাকে আরো ভারী করে তুলছে দিনের পর দিন ওরা তখন খোস মেজাজে ছবি আঁকছে, কেউবা হাত পায়ের শিকল ঝুন্ ঝুন্ করে বাজিয়ে গুণ গুণ করে গান গাইছে: ও আমার দেশের মাটি।

কালো ভ্যানে পুরে বন্দীদের প্রত্যহ যখন আদালতে নিয়ে আসা হ'ত রাজপথের উভয়পার্শ্বে লোকে লোকারণ্য হ'য়ে যেতো—একবার তারা দেখতে চায় এরা কে গো! বিলাস ভোগ ছেড়ে আগুণের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে।

কেমন করে এরা মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও গান গায়: চীৎকার করে প্রণতি জানায়: বন্দেমাতম্।

যাক! শেষে ১৯২৭ সনের ৬ই এপ্রিল মামলার রায় বের হলো।

বেলা সাড়ে এগারটায় সময় ঐ দিন সারবন্দী করে বন্দীদের আদালতে এনে দাঁড় করান হলো।

প্রশান্ত নির্মল হাস্যোস্ফুরিত বদনমণ্ডল সকলের।

রাজবন্দী! রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের বিচার!

হায় কেবা মালিক কে বা রাজা।

সত্যিই পায় হাসি, ভগবান পরবে ফাঁসী!

বজ্রনির্ঘোষে ঘোষিত হলো রায়।

শ্রীরামপ্রসাদ বিস্মিল—প্রাণদণ্ড। শ্রীরোশেন সিং—প্রাণদণ্ড। বাকী বনওয়ারীলাল, ভূপেন্দ্র সান্যাল ও মন্মথনাথ গুপ্ত প্রভৃতির কারো ১৪ বৎসর, কারো দশ, কারো সাত, কারো বা পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ডর আদেশ হলো।

হরগোবিন্দ ও শচীন্দ্র বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ না থাকায় মুক্তি দেওয়া হলো।

সুবিচারের সমাপ্তি হলো।

মাননীয় জজ সাহেবের দণ্ডাজ্ঞা পাঠ সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই বন্দীদের মিলিতকণ্ঠ আকাশ বাতাস মুখরিত করে দিল: বন্দেমাতরম্! ভারত মাতাকি জয়!

ইতিমধ্যে ঐ মামলার অভিযুক্ত অন্য দুইজন বিদ্রোহীও ধরা পড়ল আসফাকউল্লা খান ও শ্রীশচীন্দ্রনাথ বকসী। একজন দিল্লীতে অপরজন ভাগলপুরে।

সরকারের নথিপত্রে ঐ দুইজন বিদ্রোহীর বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ সবত' মজুদই ছিল সংক্ষেপে তারই সাহায্যে বিচার শেষ করে আসফাকউল্লার ফাঁসী ও শচীন্দ্রনাথের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

আপীলও হলো কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত—রামপ্রসাদ বিস্মিল, আসফাকউল্লা ও রোশেন সিংয়ের ফাঁসীর হুকুম নাকচত' হলোই না বরং যোগেশ চ্যাটার্জী, গোবিন্দ কর ও মুকুন্দলালের দণ্ড বৃদ্ধি করে তাদের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো। সুরেশ ভট্টাচার্য ও বিষ্ণুশরণের বৃদ্ধি হলো দণ্ডাদেশ, দশ বৎসর—রামনাথ পাণ্ডে ও প্রণবেশ চ্যাটার্জীর দণ্ডাদেশ কমে যথাক্রমে তিন ও চার বৎসর হলো।

দ্বিতীয় দফা ফিরিঙ্গী আদালতের সুবিচারপর্বও শেষ হলো।

পরে ঐ মামলার অজুহাতে আর একজন বিদ্রোহীরও প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়—নাম তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ লাহিড়ী। কিন্তু প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ঐ চারজন নির্ভিক তরুণ সেনানী কে ওরা। কি ওদের পরিচয়।

ভারতের বিপ্লব ইতিহাসের পাতায় আরো ঐ যে চার শহীদের নাম

রক্তাক্ষরে লেখা হ'য়ে গেল কোথা হতে কবে কার কাছ হ'তে ওরা পেয়েছিল অমনি করে মৃত্যু মন্ত্রের দীক্ষা !

কবে কোন শুভলগ্নে ললাটে ওদের দেশ জননীর অদৃশ্য হস্তে রক্ত চন্দনের টিপ পড়েছিল। উৎসর্গিত হয়েছিল অবিনাশী মৃত্যুহীন আরো চারটি প্রাণ স্ফুলিঙ্গ !

রামপ্রসাদ বিস্মিল।

কাকোড়ী ষড়যন্ত্র মালার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অন্যতম বিদ্রোহী সৈনিক !

মাসিক ১৪৲ তঙ্কা বেতনভুক মিউনিসিপালিটির এক গরীব কেরাণী শ্রীমুরলীধর বিস্মিলের ঘরেই ১৮৯৭ সালে রামপ্রসাদের জন্ম।

পুত্র যার অদূর ভবিষ্যতে দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য হাসতে হাসতে ফাঁসীর দড়ি গলায় তুলে নেবে তার পিতার পক্ষেও পরাধীনতার গ্লানি দীর্ঘ দিন ধরে সহ্য করা সম্ভবপর হ'য়ে উঠেনি তাই সরকারী চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে মুরলীধর স্বাধীনভাবে আদালত প্রাঙ্গণে ষ্ট্যাম বিক্রয় করে তারই আয়ে কায়ক্লেশে দুঃখের সংসার টেনে চলেছিলেন।

মা ও দিদিমায়ের স্নেহ ও যত্নে ক্রমে বেড়ে উঠে শিশু।

সাত বৎসর বয়েসের সময় রামপ্রসাদকে স্কুলে দেওয়া হলো কিন্তু লেখা পড়া ভাল লাগল না দুরন্ত প্রকৃতি বালকের। নানা দুষ্টুমি করেই ঘুরে বেড়ায় রামপ্রসাদ।

বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দুরন্তপ্রকৃতি কমাত' দূরে থাক আরো যেন বেড়েই চলে।

এই সময় রামপ্রসাদের মনের গতিকে ফিরিয়ে দেন স্থানীয় মন্দিরের এক পূজারী ব্রাহ্মণ !

কঠোর আত্মসংযম ও ন্যায় নিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে এক নতুন রামপ্রসাদের জন্ম শুরু হলো।

রামপ্রসাদের জননীও পুত্রের চরিত্র গঠনে যথেষ্ট সহায় হয়েছিলেন।

শৃঙ্খলিতা দেশ জননীর প্রতিও রামপ্রসাদের সমবেদনার দৃষ্টি গিয়ে পতিত হলো।

১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক রামপ্রসাদ একবার ভগ্নীর বিবাহে গোয়ালিয়র গিয়ে ৭৫৲ টাকা দিয়ে একটি রিভলভার ক্রয় করে তার সে কি আনন্দ।

ক্রমে আরো বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রামপ্রসাদ রাজনৈতিক দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

নিষ্ঠা ও আগ্রহের পুরস্কার সে পেল—লাক্ষ্ণৌ শহরের বিপ্লবীদের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল।

সবলদেহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, নির্ভিক কর্মঠ, রামপ্রসাদকে বিপ্লবীরা সানন্দেই নিজেদের একজন করে নিল। নিষ্ঠা ও বুদ্ধির বলে অত্যল্পকাল মধ্যেই রামপ্রসাদ ঐ গুপ্ত বিপ্লবীদলের কার্যকরী সমিতির সভ্যপদে উন্নীত হয়। এবং ক্রমে স্থানীয় দলের প্রধান নেতার আসন অধিকার করে।

বিপ্লবীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে আসবার পর হতেই রামপ্রসাদ দেখতে পেল দলে অর্থাভাবটা খুব প্রকট। বিপ্লব আন্দোলন লোকচক্ষুর অন্তরালে বাঁচিয়ে সক্রিয় রাখতে হলে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন অথচ অর্থ ই তাদের তেমন হাতে নেই!

অর্থ চাই! অর্থ না হ'লে অস্ত্রশস্ত্র সংগৃীত হবে কেমন করে।

দলের অনেকেই ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহের পরামর্শ দেয়। প্রথমটায় কিন্তু রামপ্রসাদ অন্যসকলের প্রস্তাবে সম্মত হ'তে পারেনি। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই রামপ্রসাদকে সমিতির প্রয়োজনে দু'একবার ডাকাতি করতে হয়েছিল। রামপ্রসাদ জননীর নিকট হ'তে কিছু টাকা চেয়ে নিয়ে পুস্তক ব্যবসার দ্বারাও কিছু অর্থ সংগ্রহ করে। এবারে সে শুরু করলে গোয়ালিয়র রাজ্য হ'তে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ।

ঐ সময় মৈনপুরা নগরের একজন রামপ্রসাদের দলের সদস্য, দলের নেতা হবার জন্য মরিয়া হ'য়ে ওঠে। এবং তারই অবিমৃশ্যকারীতার ফলে ও কাপুরুষোচিত কাজের জন্য দলের অনেকেই পুলিশের নজরে পড়লো। ধরপাকড় শুরু হলো। সরকার 'মৈনপুরী ষড়যন্ত্র' নাম দিয়ে বহু লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারী করে এক মামলা ফেঁদে বসল।

উপায়ান্তর না দেখে রামপ্রসাদ গা ঢাকা দিতে বাধ্য হলো তার কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে।

শিকারী ডাল-কুত্তাদের চোখে ধুলো দেবার অদ্ভুৎ কৃতিত্ব ছিল রামপ্রসাদের—ফেরারী অবস্থাতেই রামপ্রসাদ শাহজাহানপুর সেবা-সমিতির য়্যাম্বুলেন্স বিভাগের একজন সেবক হ'য়ে কংগ্রেসের অধিবেশনে দিল্লীতে গিয়ে হাজির। টিকটিকি ও পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে রামপ্রসাদ চলে গিয়েছে কেউ তাকে সন্দেহও করতে পারেনি।

ভাগ্যের এমনি বিড়ম্বনা বিশ্বস্ত দলের সহকর্মীদের মধ্যেই একজন ঐ সময় রামপ্রসাদের জীবন নিতে তিন তিনবার পিস্তলের গুলি ছোঁড়ে কিন্তু জন্ম মুহূর্তেই স্বদেশ জননী যার প্রশস্ত ললাটে রক্ত তিলক এঁকে দিয়েছেন, ফাঁসীর মঞ্চে যার কণ্ঠ হ'তে উচ্চারিত হবে জীবনের জয়গান; বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরের বংশধরের হাতে তার মৃত্যু হবে কেন! তাই ব্যর্থ হলো বিশ্বাসঘাতকের নিশানা বারবার তিনবার।

নিদারুণ আঘাত পেল বিপ্লবী তার অন্তরে, আক্রোশে জ্বলে উঠ্‌লো।

মায়ের কাছেত' রামপ্রসাদের কোন কিছুই গোপন ছিল না। অকপটে সব কিছুই সে বললে মায়ের কাছে-: এর প্রতিশোধ আমি নেবো মা!

মা বললেন: ছিঃ বাবা' তাই কি হয়। প্রতিহিংসার আগুন মনের মধ্যে জ্বেলে দেশের সেবাত' করা যায় না। বিশ্বাসঘাতকতা ও ব্যর্থতাইত' এ পথের পুরস্কার। নৈরাশ্যই যদি না সহ্য করতে পারবে এপথেত' চলতে পারবে না।

'কিন্তু মা! এত বড় বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি যদি না হয়—'

'না! আমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কর রামপ্রসাদ ওপথে তুমি যাবে না।—'

'আশীর্বাদ কর মা তাই যেন পারি!—'

বিপ্লবীর দু'চক্ষে জল উপচিয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিন ফেরারী জীবন যাপন করবার পর যুদ্ধশেষে রাজকীয় ঘোষণার বলে রামপ্রসাদ মুক্তি পেয়ে আবার শাহজাহানপুরে ফিরে এল।

কিন্তু কথায় আছে বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। ডাল-কুত্তার দল রামপ্রসাদের পিছু পিছু ছায়ার মতই সর্বদা ফিরতে লাগল: চিহ্নিত বিপ্লবী যে।

আরো কিছুকাল পরে রামপ্রসাদ আবার বিপ্লবী দল গড়ে তোলায় মনোযোগ দেয়।

এবং ক্রমে উত্তরভারতীয় বিপ্লবীদল সংগঠনের মধ্যে লিপ্ত হ'য়ে পড়ল।

বিরাট একটি দল ঐ সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্ঘ গঠন করে সর্বভারতীয় এক সশস্ত্র বিপ্লব সৃষ্টির দ্বারা ভারতে গনতন্ত্রমূলক এক যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে।

উক্ত দল প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় উপায়েই বিপ্লববাদ প্রচারে সচেষ্ট ছিল।

১৯২৪ অক্টোবর মাসে কানপুরে বিপ্লবীদের পুনর্সংগঠন সম্পর্কে আলোচনার জন্য এক গুপ্ত অধিবেশন হয়। এবং ঐ সভাতেই সমগ্র যুক্ত প্রদেশকে কাজের

সুবিধার জন্য সাতটি ভাগে ভাগ করা হয়: কাশী, ঝান্সী, কানপুর, আলিগড়, মীরাট, শাহজাহানপুর ও ফৈজাবাদ।

সংখ্যায় তখন বিপ্লবীরা ঐ সময় একশতের অধিক।

সকলেই তরুণ কিশোর ও যুবা: বক্ষে তাদের দুর্দান্ত সংকল্প। আগে কেবা প্রাণ করে যাবে দান তারই জন্য এগিয়ে চলেছে সকলে।

হয় স্বাধীনতা না হয় মৃত্যু! যে কোন নিষ্ঠুর নির্যাতনও মাথা পেতে নিতে তারা প্রস্তুত। শাহজাহানপুরের ভার পড়লো রামপ্রসাদের উপর। সহকর্মী হলো রামপ্রসাদের কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বিপ্লবী দুঃসাহসী আসফাকউল্লা।

ফিরিঙ্গী সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে 'প্রতাপদল' নামে এক সমিতি গড়ে রামপ্রসাদ তার বিপ্লবের কাজ করে যেতে লাগল নিঃশব্দে একাগ্রতায়।

বিশ্বাসঘাতক ইন্দুভূষণ মিত্র ঐ সময় দলে এসে যোগ দেয় এবং খুব শীঘ্রই রামপ্রসাদের বড় বিশ্বাসের পাত্র হ'য়ে ওঠে।

বড় বিশ্বাস করেছিল রামপ্রসাদ ইন্দুকে।

তার সেই বুকভরা বিশ্বাসের যোগ্য প্রতিদানই দিয়েছে ঐ পরউচ্ছিষ্টলোভী প্রাণভয়ে কাতর বিশ্বাসঘাতক ইন্দু: কাকোরী মামলায় শত্রুদলের পক্ষে সাক্ষী দাঁড়িয়ে।

বিপ্লবীদের বরাবরই অর্থের অভাব হয়েছে।

অতি সংগোপনে লুকিয়ে প্রতি মুহূর্তে মরণের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যারা দেশের স্বাধীনতা আনবার জন্য বিপ্লবী, বিদ্রোহী নাম নিয়ে সংগঠনের কাজ চালিয়ে গিয়েছে, করেছে দিনের পর দিন দুঃসহ সংগ্রাম। অর্থের জন্যই হয়ত তাদের এক আধ সময় লুঠতরাজ করতে হয়েছে কিন্তু তার জন্যও যে তাদের কতখানি গ্লানি ও দুঃখ সইতে হয়েছে কজনা তার সংবাদ রাখে বা রেখেছে।

কেনই বা তারা নিরন্তর দগ্ধ হয়েছে তারই বা কতটুকু সংবাদ কয়জনা রেখেছে। সরকারী খিতাবের জন্য উপরিওয়ালাদের ভেট দিয়ে, নানাভাবে চোরা কারবার করে, জুয়া খেলে, রেস খেলে, মদ্যপান করে দেশের তথাকথিত ধনিক সম্প্রদায় কতটাকাই না নষ্ট করেছে আর দেশের মুক্তির জন্য সংগ্রামে লিপ্ত হয়ে যারা মৃত্যুপন করে ঘর সংসার, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্র, আনন্দ বিলাস ও স্বচ্ছন্দ আরাম ত্যাগ করে বন্দুকের গুলিতে, ফাঁসীর দড়িতে, নির্বাসনে প্রাণ দিল

তাদের টাকা পয়সার অভাবে ডাকাতি করে জোর করে অর্থ সংগ্রহ করতে হয়েছে এর চাইতে দুঃখের কথা লজ্জার কথা আর কি থাকতে পারে।

অর্থের জন্যই শেষ পর্যন্ত রামপ্রসাদকে মাত্র দশজন সঙ্গী নিয়ে ট্রেনের সরকারী অর্থ জোর করে ছিনিয়ে নিতে হোল।

নিতে বাধ্য হ'তে হলো।

অর্থের প্রয়োজন।

রামপ্রসাদ ফেরার হলো না কিন্তু এবার আর।

২২শে নভেম্বর পুলিশ তাকে তার গৃহেই গ্রেপ্তার করলো।

১২১ ধারা অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে কাকোরী ষড়যন্ত্রের নেতা বলে ঘোষণা করে তার প্রতি চরম দণ্ডাজ্ঞা উচ্চারিত হলো।

১৯শে ডিসেম্বর : পূর্ব গগনে তখন ভোরের অরুণালোকের রক্ত রাঙা আভায় জেগেছে মাত্র।

জল্লাদকে সঙ্গে নিয়ে জেলার সাহেব এসে রামপ্রসাদের সেলের সামনে দাঁড়াল।

সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিড়িতে হবে।

ওরে যাত্রী।

আঁধার নিশা পোহায়েছে ঐ পূর্ব তোরণে দেখ জেগেছে রাঙা আভায়।

ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে ফাঁসীর দড়িটি গলায় নিয়ে নির্ভিক বিপ্লবী বলে গেল।

: I wish the downfall of the British Empire !

প্রণাম জানাই তোমায় হে বীর। প্রণাম লহ।

* * *

মাষ্টারদা—সৃষ্টিধর সান্যাল সতীর একটা জরুরী চিঠি পেলেন পুরী থেকে।

দাদা,

তোমাকে খুব দরকার একটিবার যদি তুমি এসো সত্যি বড় আনন্দ পাবো।

আসবে নাকি, ছোট বোনটির আব্দারটুকু রাখবে না কি !

তোমার ছোট বোন সতী।

যেতে হবে। হাঁ যেতে হবে বৈকি।

রাত্রের পুরী এক্স্প্রেসেই রওনা হয়ে পড়লো সৃষ্টিধর।

কয়েকদিন থেকেই যাবো যাবো করছিল কিন্তু কোথায়ও আজকাল আর যেতেই যেন ওর ইচ্ছা করে না। তবু যেতেই হবেই। সতী ডেকেছে।

ভোরের আলো সবে তখন ফুটে উঠ্ছে সাগর জলের কোল ঘেঁষে।

নীল সীমান্তে রক্ত সিন্দুরের ছোপ্।

নীললোহিত।

সারাটা রাত একটিবারের জন্যও বিনয় দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি। ছটফট্ করেছে, কেবলই শয্যার উপরে এপাশ ওপাশ করেছে।

'ঘুমবার চেষ্টা করত' একটু—'

'ঘুম যে কিছুতেই আসছে না সতী!—'

'আমি তোমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে দিই তুমি ঘুমাও!—'

'কর্তাদের তাড়া খেয়ে খেয়ে দু'টো বছর বনে জংগলে পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছি ধরা পড়ে দ্বীপান্তরে যাওয়ার আগে। ঘণ্টাখানেক নিশ্চিন্ত হ'য়ে কোনদিন ঘুমোবারও ফুরসুৎ পাইনি, সেই সময় ভাবতাম এর চাইতে যদি ধরা পড়তাম তা'হলে অন্তত কয়েক ঘণ্টা ঘুমিয়ে বাঁচতাম। কিন্তু আশ্চর্য কি জান! যখন ধরা পড়ে জেলে গেলাম সাতদিন একটিবারের জন্যও দু'চোখের পাতা এক করতে পারলাম না—'

শেষ পর্যন্ত শেষ রাত্রির দিকে বিনয় বোধ হয় একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

নিঃশব্দে সতী বিনয়ের গায়ের উপর চাদরটা টেনে দিয়ে বাইরে বের হ'য়ে এলো।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বারান্দায় সতী বস্‌লো। এবং বসে থাকতে থাকতেই বোধহয় দু'চোখের পাতায় ঘুমের ঢুলনী নেমে এসেছিল ক্লান্তিতে।

সহসা তন্দ্রাটা ভেঙ্গে গেল সৃষ্টিধরের ডাকে: সতী কোথায় দিদি!

সতী চোখ মেলে তাকাল: সামনেই দাঁড়িয়ে সৃষ্টিধর সান্যাল! পরিধানে মলিন খদ্দরের মোটা ধুতি ও পাঞ্জাবী, পায়ে একটা পুরু চামড়ার সোলের কাবুলী স্যাণ্ডেল। মাথার চুল এলোমেলো, কাঁধের উপর দিয়ে ঝুল্‌ছে একটা ব্যাগ।

'দাদা এসেছো!—সত্যি তুমি এসেছো দাদা!—'সতী তাড়াতাড়ি উঠে সৃষ্টিধরের পায়ের উপরে নত হতেই ব্যাগ্র হাত দু'টি দিয়ে গভীর স্নেহে তুলে

নিল সতীকে নিজের বুকের কাছে: একি চেহারা হ'য়েছে দিদি! তুইও যদি অসুস্থ হ'য়ে পড়িস তবে বিনুর সেবা করবে কে ভাই!

'বোস দাদা!—'.

হাত ধরে টেনে চেয়ারটার উপরে বসিয়ে দিল সৃষ্টিধরকে সতী।

'বিনু কেমন আছে দিদি!—'

'আবার রক্ত পড়া শুরু হয়েছে গত তিন চারদিন থেকে।—'

'হুঁ।' সৃষ্টিধর চিন্তিত হ'য়ে ওঠে।

সত্যি দুঃখ হয় তার সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে। মেয়েটা কি কঠোর তপস্যাই না করছে।

সাবিত্রীও বোধ হয় তার স্বামীর জীবনকে ফিরিয়ে আনবার জন্য এত কঠোর ও একনিষ্ঠ তপস্যা করে নি। কিন্তু সাবিত্রীর যুগ আর নেই!

দেবতারা আর আশীর্বাদ দেন না।

হঠাৎ সতীর ডাকে সৃষ্টিধর চম্‌কে মুখ তুলে তাকাল: কি রে?

'একটা বিশেষ কাজে তোমাকে ডেকেছি দাদা! বল তুমি তোমার ছোট বোনটির অনুরোধটুকু রাখবে।'

সৃষ্টিধর সতীর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

সমস্ত মুখাখানি ব্যেপে অদ্ভুত একটা বৈরাগ্যের বিভূতি যেন জ্বলজ্বল করছে।

দু'টি চক্ষুর দৃষ্টিতে জ্বলছে যেন দু'টি আগুনের শিখা।

সতীর সমস্ত অন্তর যেন ঐ শিখার মধ্যে নিজেকে মেলে ধরেছে।

'বল!—'

'আগামী কাল রাসপূর্ণিমা! আমাদের বিবাহটা তোমাকে দিয়ে দিতে হবে!—'

'বিবাহ!—'

'হাঁ! বুঝতে পারছি আর বেশি দেরী নেই! সময় থাকতে যদি কাজটুকু সেরে না রাখি—'

'কিন্তু—'

'শুধু'ত' মন্ত্রোচ্চারণটুকুই! যদিও জানি ওর কোন প্রয়োজন ছিল না কিন্তু সমাজে থাকতে গেলেও যে সামাজিক স্বীকৃতির একটা প্রয়োজন আছে। আমাকে লোকে যা খুসী তাই বলুক ক্ষতি নেই কিন্তু ওর মৃত্যুর পর ওর নামের সঙ্গে আমার নামটা জড়িয়ে লোকে ওর স্মৃতির গায়ে কালি ছিটাবে এ আমি সহ্য করতে পারবো না!—'

সৃষ্টিধর সতীর কথা ও যুক্তি শুনে সত্যিই স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

ধীরে ধীরে বললে: বীরেশ্বরকে একটা সংবাদ দিলে হতো না ভাই।

'কে দাদা! না দাদা তাকে আর এর মধ্যে টানবো না। দাদা হয়ত সইতে পারবে না।'

'কিন্তু আমিই যে পারবো এ সংবাদটাই বা কোথা থেকে কেমন করে পেলে সতী?—'

'পাথরে যে দাগ বসে না এ সংবাদ কি কাউকে দিতে হয়, না আর কষ্ট করে জানতে হয়। ছোট্ট একটি শিশুও যে বুঝতে পারে।—'

'তাই বুঝি পাথরকে সাক্ষী মেনে—'

সৃষ্টিধরের কথাটা শেষ হলো না।

সতী বললে: হাঁ! নুড়ী পাথরের শালগ্রামশিলা নয় তোমাকেই সামনে রেখে এবং তোমারই মুখোচ্চারিত মন্ত্রে হবে আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রত উদ্‌যাপন।

'ক্ষমা কর ভাই! আমিও মানুষ! বিশ্বাস কর আমি পাথর নই! পাথর নই।'

সৃষ্টিধরের গলাটাও বুঝি তার অজ্ঞাতেই ধরে আসে।

যার চোখে অতিবড় বেদনাতেও কেউ কোনদিন জল দেখেনি তার চোখের কোণ দু'টোও বুঝি ভিজে ওঠে।

সতী কিন্তু আর দাঁড়ায় না দ্রুতপদে স্থান ত্যাগ করতে করতে বলে: বোস দাদা। চা তৈরী করে নিয়ে আসি।

ভিজা চোখের ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে সতীর অপস্রিয়মান দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকে সৃষ্টিধর। ভগবান্ তোমার সৃষ্টির বুঝি তুলনা নেই।

কি দিয়ে যে ঐ সতীর মত মেয়েদের তুমি সৃষ্টি করেছো তা তুমিই জান।

প্রথম যৌবনের সৃষ্টিধর সান্যাল মরে গিয়েছে অনেক দিন আগে।

কিন্তু আশ্চর্য, স্মৃতির পাতাগুলো আজো অস্পষ্ট হয়ে যায় নি।

এমনি আর একজনের কথাই কি সৃষ্টিধরের মনে পড়ে! অশ্রুসিক্ত চোখের পাতার উপরে বেদনার রামধনু রচনা করে।

কোথায় হারিয়ে গেল তারা আজ! সে নিজেই বা কোথায় হারিয়ে গেল।

মৃত নক্ষত্র।

সত্যিই মৃত নক্ষত্র।

মৃত নক্ষত্রের বুকেও কি স্পন্দন জাগে আলোর !

না ! কি এসব সে ভাবছে। এর চাইতে কাল সারাটা রাত ট্রেনে সে ঘুমোতে পারে নি, একটু ঘুমিয়ে নিতে পারলে কাজ হ'তো।

সৃষ্টিধর চোখ বুজে ঘুমাবার চেষ্টা করতে লাগল।

ঘুমিয়েও পড়েছিল, সতীর ডাকে ঘুম ভেঙ্গে গেল। চেয়ে দেখে সামনেই দাঁড়িয়ে সতী হাতে তার এক কাপ ধূমায়িত চা।

'দাদা কি ঘুমালে নাকি ! তোমার চা এনেছি !—'

'না ঘুমাই নি—' হাত বাড়িয়ে সতীর হাত থেকে সৃষ্টিধর চায়ের কাপটা নিল। গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললে : বিনু উঠেছে দিদি ?

'হাঁ !—'

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সৃষ্টিধর : চল বিনুর সঙ্গে দেখা করে আসা যাক !

চোখ বুজে বিনয় শয্যার উপরেই পড়েছিল।

রোগ শীর্ণ স্থির নিস্পন্দ বিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সৃষ্টিধরেরও বুকখানা সহসা কেঁপে ওঠে, মৃত্যুর নোটিশ সুস্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।

এই সেই বিপ্লবী—দুধর্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক বিনয় বোস।

'বিনু !—'

'কে !—' চোখ মেলে তাকাল বিনয় বোস।

'একি মাষ্টারদা। সত্যিই তুমি মাষ্টারদা !—'

'হাঁ !—' সৃষ্টিধর বিনয়ের শয্যার আরো নিকটে এগিয়ে এলো।

'তুমি হঠাৎ দাদা !—কোন খবর নেই কিছু নেই !—'

'কেন আসতে নেই নাকি !—'

'না ! না—তা বলছি না তবে—' তারপরই একটা দীর্ঘশ্বাস রোধ করে বলে : যাক্। ভালই হলো। বড় ইচ্ছা ছিল যাবার আগে তোমার সঙ্গে একটিবার দেখা হয়। কেমন আছো ?—'

'দেখতেই ত পাচ্ছিস !—'

'যাক্ দাদা তুমি এসেছো। এবারে যাবার সময় সতীকে সঙ্গে নিয়ে যাও। আজ কয়দিন থেকে ওকে এত করে বলছি তুমি ফিরে যাও সতী কিন্তু কিছুতেই ও আমার কথা শুনবে না।—'

সতী নিঃশব্দে কক্ষ হ'তে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়।

বিনয়ের শিয়রের সামনে বসে তার রুক্ষ চুলগুলোর মধ্যে আঙ্গুল চালাতে চালাতে স্থষ্টিধর বললে : ও সব কথা এখন থাক বিনু।

কিন্তু বিনয় স্থষ্টিধরের কথায় কান দেয় না বলেই চলে : কেন যে ওর এই মৃত্যুপণ নিয়ে আমাকে সেবা করা নিজের কাছেও এক এক সময় একান্ত হেঁয়ালী ও ছুর্জ্ঞেয় ঠেকে মাষ্টারদা, এক এক সময় নিজের উপরেই নিজের আমার রাগ ধরে। আর কতদিন এমনি করে বেঁচে থাকতে হবে বলত ?

'ছিঃ ভাই ও কথা বলতে নেই !—'

'না। না—মাষ্টারদা তুমি জান না! সতীকে মুক্তি দেবার জন্যও যে এখন আমার যত তাড়াতাড়ি মৃত্যু হয় ততই মঙ্গল। ওর কষ্ট যে আর আমি দেখতে পারছি না।—'

'তুই কি মনে করিস বিনয় তুই গেলেই সতীর নিষ্কৃতি মিলবে!—আজও কি বুঝতে পারিস নি ওর সঙ্গে তুই জন্ম-জন্মান্তরে বাঁধা! এর থেকে মুক্তি ওর নেই তোরও নেই।'

সতীই কথাটা বিনয়ের কাছে ঐ দিন রাত্রে এক সময় বললে।

বিনয় কিন্তু প্রবল আপত্তি তুলল : না! না—এ সব কিছুতেই হ'তে পারে না! ছিঃ ছিঃ!

'নতুন করে ত' কিছু আর হচ্ছে না! আমাদের পরস্পরের সম্পর্কটা শুধু মাষ্টারদার সামনে ছু'জনের আমাদের তাঁরই শুভেচ্ছার মধ্য দিয়ে স্বীকার করে নেওয়া, তার চাইতে ত বেশী কিছুই নয়।'

'না! না—তুমি বুঝতে পারছো না সতী!—'

সহসা সতী বিনয়ের একখানা রোগশীর্ণ শিরাবহুল কঙ্কালসার হাত চেপে ধরে অশ্রুক্লিষ্ট কণ্ঠে বলে : না! না—আপত্তি করো না তুমি! আপত্তি করো না। তোমার কাছেত' মুখ ফুটে কোন দিন কিছু চাই নি। তোমার কাছে জীবনের আমার এই প্রথম ও শেষ প্রার্থনা। এটুকু হ'তে আমাকে আর সব জেনে শুনেও বঞ্চিত করো না!

ঝর ঝর করে অশ্রু ঝরে পড়তে থাকে সতীর ছুই চক্ষুর কোণ বেয়ে।

বিনয় সহসা নিজেকে যেন কেমন বিব্রত ও অসহায় বোধ করে।

সতী বিনয়ের বুকের উপরে মাথা গুঁজে কান্নার ছুরন্ত বেগটাকে রোধ করবার ব্যর্থ চেষ্টা করতে থাকে।

'সতী !—'

সতী জবাব দেয় না ।

বিনয় আবার ডাকে: সতী ! কেঁদো না ! উঠে বোস! তুমি ত' জান একদিক থেকে তোমাকে অদেয় কিছুই আমার নেই ।

সৃষ্টিধরই মন্ত্রোচ্চারণ করলে: গাঢ় লাল রক্তের মত বেনারসী সাড়ী পরিহিতা সতীকে সত্যই অপূর্ব দেখাচ্ছিল ।

সর্বাঙ্গে যেন ওর লক্ষ কোটি আগুনের লেলিহান শিখা উর্ধমুখী হ'য়ে জ্বলছে ।

ওং মমব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু ।

নিজ হাতে রক্ত চন্দন দিয়ে সতী সযতনে বিনয়কে সাজিয়েছে । নিজ হাতে মালা গেঁথে গলায় ওর পরিয়ে দিয়েছে ।

বাইরে কুলপ্লাবী জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আশীর্বাদ ।

সমস্ত ঘরটাই ফুলে ফুলে সাজিয়েছে সতী !

জীবনের মধুরাত্রি !

একবারই আসে দু'বারত আসে না ।

কেমন করে এই রাতটিকে সতী অমনিই যেতে দিতে পারে ।

নিজ হাতে শয্যা রচনা করেছে সতী !

সৃষ্টিধর কিন্তু থাকতে পারে নি: ছুটে বের হয়ে গিয়েছে ।

সোজা একবারে সৃষ্টিধর সাগরের ধারে চলে যায় ।

চাঁদের আলোয় সাগরেরও যেন আজ অভিসার ।

উদভ্রান্তের মতই সৃষ্টিধর সাগরের বালুবেলার উপর দিয়ে হেঁটে চলে ।

নিজ হাতে সতী জহরব্রতের অগ্নিকুণ্ড জ্বেলেছে আত্মদান করবে বলে ।

নিঃশেষে নিজেকে পুড়িয়ে দিয়ে কি ও বিনয়ের প্রতি তার প্রেমকেই স্বীকৃতি দিয়ে যেতে চায় ।

কিন্তু তাই যদি হয় কিইবা এর প্রয়োজন ছিল ।

রাজেন্দ্রাণী বেশে সতী খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরের দিকে তাকিয়ে ।

ঘরে আজ একটি মাত্র মোমবাতি জ্বেলে দিয়েছে সতী ।

মোমবাতির মৃদু নরম আলোর সঙ্গে খোলা জানালা পথে আগত চাঁদের আলো মিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে।

'মাষ্টারদা এখনো ফিরল না সতী?—'

বিনয়ের প্রশ্নে সতী চম্‌কে ফিরে দাঁড়ায়: জ্বল জ্বল করছে সিন্দুর সিঁথিতে, কপালের ঠিক মধ্যখানে গোলাকারা সিন্দুরের টিপটি!

'কই এখনোত' ফিরলো না!—'

'রাত কত হলো সতী?—'

এগিয়ে গিয়ে টেবিলের উপরে রক্ষিত টাইমপিসটা দেখলো সতী: রাত এগারটা

'এগারটা বাজে—'

সতী এগিয়ে এসে বিনয়ের শয্যার উপরে বসলো। ধীরে ডান হাত খানি বিনয়ের কপালের উপরে রাখতেই বিনয় হাত বাড়িয়ে সতীর হাতটা মুঠো করে চেপে ধরলো।

'সতী?—'

সতী স্নিগ্ধ মৃদু কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দেয়: বল?

'সত্যি এ তুমি কি করলে সতী? নিজের মৃত্যু পরোয়াণায় এমনি করে তুমি নিজের হাতে স্বাক্ষর দিলে কেন?'

'কে বললে তোমাকে আমি আমার মৃত্যু পরোয়াণায় স্বাক্ষর দিয়েছি!—'

'তাছাড়া আর কি বল? আমিত' মুঠো ভরেই পেলাম কিন্তু তুমি কি পেলে?—'

'কেন তুমি বার বার ঐ কথা বলছো বলত? বিশ্বাস করো তুমি আমি যা পেয়েছি যা পেলাম বহু সৌভাগ্যবতী নারীর ভাগ্যেও তা জোটে না!—'

সতীর হাতের আঙ্গুলগুলো নিয়ে খেলা করতে করতে বিনয় বলে: ভাগ্যই বটে! আজ আর অস্বীকার করবো না সতী! কত রাতের পর রাতই না এই আজকের রাত্রির এই মধুর স্বপ্নে কেটে গিয়েছে। কিন্তু সে স্বপ্ন যে সত্যি করেই এমনি একদিন চরম দুঃখের মধ্যদিয়ে আমার জীবনে প্রকাশ পাবে এ স্বপ্নেও ত ভাবি নি!—'

সহসা সতী উঠে দাঁড়াল।

এবং পাশের ঘরে গিয়ে বহুদিনের অব্যবহার্য খাপের মধ্যে রক্ষিত সেতারটা নিয়ে এলো।

'মনে পড়ে এক সময় তুমি আমার সেতার বাজনা শুনতে কি ভালবাসতে! সেতার বাজাই শোন!—'

সতীর অঙ্গুলীর পীড়নে সেতারের তারে সুর ঝঙ্কার জাগল।

বসন্ত বাহার সুর বাজায় সতী!

বিনয় শুনতে থাকে।

অনেক রাত্রে ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সৃষ্টিধর যখন গৃহে ফিরে এলো, শুব্ধ চন্দ্রালোকিত রাত্রে বারান্দায় পা দিতেই ওর কানে এসে বাজল সেতারের সুর ঝঙ্কার।

দাঁড়িয়ে গেল সৃষ্টিধর।

চন্দ্রালোকিত নিশীথিনীর শুব্ধ বুকখানাকে যেন সেতারের সুর ঝঙ্কার ভরিয়ে তুলেছে।

বিনয় ও সতীর বাসর রাত্রি।

মধু যামিনী আজকে ওদের!

কিন্তু মধু যামিনীতে এ কান্নার সুর কেন!

কেন এ বুকভাঙ্গা অশ্রু কাতর বেদনোচ্ছ্বাস!

সতী আর বিনয়!

বিনয় আর সতী!

মুক্তি হোমানলের দু'টি উর্দ্ধমুখী শিখা!

শশ্মানে আজ ওরা রচনা করেছে বাসর।

অদূরে দণ্ডায়মান নিষ্ঠুর মৃত্যু!

সাবিত্রী তোমার সত্যবানকে যে যম নিতে এসেছে!

হে নিষ্ঠুর! হে নির্মম আরো কত সাবিত্রীর সিথির সিঁন্দুর তুমি মুছে দেবে! কবে হবে এ যজ্ঞের পূর্ণাহুতি!

কবে এর শেষ!

শেষ! এখনো অনেক বাকী! আসফাকউল্লাও জানত বৈকি! জানত রাজেন্দ্র লাহিড়ীও। জানত ঠাকুর রোশেন সিং!

শাহজাহানপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারে আসফাকউল্লার জন্ম।

সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্ম হলেও আপন খেয়ালে যে ভাবে দিন কাটে আসফাকউল্লারও সেই ভাবে জীবনটা কেটে যেতে পারত কিন্তু তা ত কই হলো না।

পরবর্তীকালে ফাঁসীর দড়িতে যাকে জীবনের শেষ পরিচয়টুকু রেখে যেতে হবে বিলাস বৈভব তার জীবন পরিক্রমাকে আচ্ছন্ন করতে পারবে কেন!

পরাধীন দেশে জন্মাবার গ্লানিই তাকে মুক্তিপথে হাতছানি দিয়ে ডেকে নিল। রামপ্রসাদের দলে গিয়ে ভিড়ল আসফাকউল্লা।

রামপ্রসাদ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হলো কিন্তু আসফাকউল্লার কোন সংবাদই পেল না। কিছুদিন নানা ছদ্মবেশে গুপ্তভাবে আত্মগোপন করে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে শেষে আসফাকউল্লা স্থির করে আফগান রাজদূতের সাহায্যে ভারতের বাইরে কোন মতে পালিয়ে যাবে। দিল্লীতে এল আসফাকউল্লা। কিন্তু ঐ দিল্লীতে আগমনই তার কাল হ'লো, ১৯২৬—৮ই সেপ্টেম্বরে পুলিশ আসফাককে গ্রেপ্তার করল। ঐ সময় কাকোরী মামলার অন্যতম অভিযোক্তা শচীন্দ্রনাথ বকসীও ভাগলপুরে গ্রেপ্তার হলো।

১৯২৭য়ের—১৯শে ডিসেম্বর প্রত্যুষে আসফাক উল্লাকে ফাঁসীর মঞ্চে এনে দাঁড় করান হলো।

পবিত্র কোরাণ শরীফের কতকগুলি পংতি উচ্চারণ করতে করতে বীর সৈনিক গলায় টেনে নিল ফাঁসীর রজ্জু।

আসফাক ছিল কবি।

চির বিদায়ের কয়েকদিন পূর্বে ক্ষুদ্র অন্ধকার সেলের মধ্যে বসে কবির মনকে যে কবিতা সুধা মন্থন করেছিল:

> কণা হ্যায় সব্‌কে লিয়ে
> হাম প্যায় কুছনাহি মৌকুফ
> বকা হ্যায় এক বাকত
> জাত্তে কিব্রিয়াকে লিয়ে
> ভঙ্গ আকর হাম্‌ড়ি
> উন্‌কে জুলুমসে বে-দাদাস
> চল দিয়ে স্বয়ে আদম
> জিদানে ফয়জাবাদসে ॥

মরণ! সেত সকলের জন্যই অপেক্ষা করে আছে। আজকে আমার

মৃত্যুও তেমনি কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয় যে, তার ভয়ে আমি কাতর হয়ে পড়বো। এ দুনিয়ায় সব কিছুইত নশ্বর, কালক্রমে সব কিছুই একদিন অবিনশ্বর ভগবানের মধ্যে লয় পাবে। ভগবানের এই অলঙ্ঘ্যবিধান অনুসারে আমিও তেমনি ফৈজাবাদ পরিত্যাগ করে অমরধামে যাত্রা করবো।

আর ঠাকুর রোশেন সিং।

শাহজাহানপুরের নাওয়াদা গ্রামে ঠাকুর রোশেন সিংয়ের জন্ম। জাতিতে রাজপুত। ভারত ইতিহাসের পাতায় পাতায় আজিও যাদের শৌর্য ও বীর্যের কাহিনী অম্লান দীপ্তিতে স্বাক্ষর দিচ্ছে: দেশের জন্মভূমির জন্য যাদের প্রাণদান আজও চারণের কণ্ঠে কণ্ঠে ছড়িয়ে যায় সেই রাজপুতের রক্ত ছিল ঠাকুর রোশেন সিংয়ের শরীরে।

অসহযোগ আন্দোলনে সর্বপ্রথম ঠাকুর রোশেন সিং কারাবরণ করে।

কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করে রোশেন সিং দেখলো দেশের চারিদিকে একটা ক্লান্ত অবসাদের ঢেউ। অসহযোগ আন্দোলনে ভাটি পড়েছে ঠিক এমনি সময় সামনে এসে দাঁড়ালো বিপ্লবের পূর্ণ প্রতীক পাবক-শিখারূপী রামপ্রসাদ বিস্মিল।

সানন্দে ঠাকুর রোশেন সিং রামপ্রসাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

দলের মধ্যে সংগঠনের কাজের জন্যই নিযুক্ত ছিল ঠাকুর রোশেন সিং, কাকোরী ডাকাতির মধ্যে রোশেন সিং ছিল না।

কিন্তু তাতে কি।

ফিরিঙ্গী রচিত আইনে অপরাধী যদি নাও জানে কি দোষ তার বিচারের ত' কোন বাধাই হয় না।

এ ক্ষেত্রেও হলো না।

সব চাইতে বড় কথা নিরহঙ্কার বলিষ্ঠ ঠাকুর রোশেন সিংয়ের প্রাণ ছিল সূর্যের মত।

এবং গুপ্ত বিপ্লবী দলের সে ছিল অন্যতম সভ্য।

অতএব বিচারে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হলো।

ফাঁসীর নির্দিষ্ট দিনে চির সহচর গীতাটি বক্ষে আঁকড়ে ধরে হাস্যোৎফুল্ল মুখে এগিয়ে গিয়ে বললে: বন্দেমাতরম।

জল্লাদ এগিয়ে এলো রজ্জুর ফাঁসটি গলায় পরিয়ে দিতে।

সত্যিই কোন দুঃখই তার আর সেদিন ছিল না। ছিল না সামান্ত এতটুকু ক্ষেদ। ফাঁসীর সপ্তাহ পূর্বে তার স্বলিখিত জীবনের শেষ পত্রখানিই চিরদিনই তার সাক্ষ্য দেবে।

…আমার জন্য দুঃখ করো না বন্ধু! ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাই তোমার প্রাণঢালা প্রেমের প্রতিদান যেন তুমি তাঁর কাছ থেকেই পাও। সানন্দেই মৃত্যুকে আমি বরণ করতে চলেছি।…

প্রায় দুই বৎসর হলো আমি ছেলেমেয়েদের ছেড়ে দূরে বাস করছি তাই ত আসক্তির বন্ধন ও আমার কেটে গিয়েছে, বাসনার আগুন আর এ হৃদয়ে জ্বলতে পায় না।

বন্ধু! আজ এক অভূতপূর্ব তৃপ্তিতে সমস্ত হৃদয় আমার ভরে উঠেছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, ধর্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করলে পরকালে নাকি অক্ষয়-স্বর্গবাস হয়। ধর্মযোদ্ধা আর বনবাসী তাপসের মধ্যে ত' কোন পার্থক্যই নেই।…তবে আজ আসি, আমার ভালবাসা নিও।

আরো একজন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী।

১৯২৩ সনে কাকোরী মামলায় অভিযুক্ত অন্যতম বিদ্রোহী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জী যুক্তপ্রদেশে গুপ্ত বিপ্লবী সঙ্ঘকে পুনরায় ভাল করে সংগঠন করবার জন্য সতীশচন্দ্র সিংহকে সঙ্গে নিয়ে কাশীতে যায়। শচীন্দ্রনাথ বক্সী এসে সঙ্গে যোগ দিল।

তিনজনে যোগেশ, শচীন্দ্র ও সতীশচন্দ্র তদের কাজ শুরু করে।

১৯০১ খৃঃ জুন মাসে পাবনা জেলায় ভারেঙ্গা গ্রামে মাতুলালয়ে রাজেন্দ্রনাথের জন্ম।

পরে ১৯১৯ খৃঃ কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজে গিয়ে প্রবেশ করে, ইতিহাস ও অর্থশাস্ত্রের ছাত্র ছিল রাজেন্দ্রনাথ।

১৯২৪ খৃঃ কাণপুরে যোগেশবাবুর সঙ্গে এপ্রিল মাসে রাজেন্দ্রনাথের ও সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। এবং যোগেশবাবুর ইচ্ছাতেই রাজেন্দ্রনাথের উপরে প্রতাপগড়ের কর্মকেন্দ্রের ভার অর্পিত হয়। পরে রাজেন্দ্রনাথ শাহজাহানপুরে রামপ্রসাদের সঙ্গে পরিচিত হয়।

অক্টোবর মাসে কাণপুরে যে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে একটা খসড়া প্রস্তুত

করে যোগেশচন্দ্র, রাজেন্দ্রনাথকে ঐখানকার নিজস্ব প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কলিকাতায় ফিরে যায়।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের অব্যহিত পরেই Bengal ordinanceয়ের আইনে ইংরাজ সরকার যোগেশবাবুকে গ্রেপ্তার করায় যুক্তপ্রদেশের সমস্ত কার্যভার রাজেন্দ্রনাথের কাঁধেই এসে পড়ল।

নিজেকে সর্বদা আত্মগোপন করে বৈপ্লবিক কাজ চালিয়ে যাবার জন্ত তীক্ষবুদ্ধি কুট কৌশলী রাজেন্দ্রনাথকে বহু ছদ্মনাম ব্যবহার করতে হতো এবং সেই কারণেই দলের মধ্যে তাকে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নামে জানত।

রাজেন্দ্র, চারু, জহরল্যাল ও যুগলকিশোর—সবগুলিই ছিল রাজেন্দ্রনাথের নাম। রামপ্রসাদ বিস্মিলের নেতৃত্বে কাকোরীতে ট্রেনের মেল ভ্যান থেকে সরকারী অর্থ লুট হলেও উক্ত ব্যপারের উদ্যোগ আঁয়োজন সব কিছুই রাজেন্দ্রর তত্বাবধানেই সুসম্পন্ন হয়েছিল।

এবং স্বয়ং রাজেন্দ্রনাথই চলন্ত গাড়ীর চেন টেনে গাড়ীকে মধ্যপথে থামিয়ে দেয়।

৯ই আগষ্ট কাকোরীতে ট্রেন থেকে সরকারী অর্থ লুণ্ঠিত হয়।

২৬শে সেপ্টেম্বর যুক্তপ্রদেশের পুলিশ যখন রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ীর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা নিয়ে তার কাশীর বাড়ী তচ্ নচ্ করছে, রাজেন্দ্রনাথ তখন দক্ষিণেশ্বরের এক পড়ো বাড়ীর নিভৃত কক্ষে বসে একাগ্র চিত্তে এবং একান্ত নিঃসংকোচেই বোমা তৈরীর প্রণালী শিক্ষা করছে।

বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা করবার জন্ত যাওয়ার কথা ছিল রামপ্রসাদের কিন্তু ঘটনাচক্রে পূর্বেই বলা হয়েছে রামপ্রসাদের সমস্ত চিঠিপত্র ইন্দুভূষণের নামেই যেত এবং ঐ সময় পূজার ছুটি উপলক্ষে স্কুল বন্ধ থাকায় রামপ্রসাদের হাতে চিঠির মারফৎ সংবাদ না পৌছানয় রামপ্রসাদের যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। এবং ঐ একই কারণেই রামপ্রসাদ ও রাজেন্দ্রনাথের নামে একই দিনে গ্রেপ্তারী পরোয়াণা জারী হয় ও উভয়ের বাটি খানাতল্লাসী হয়। কিন্তু ধরা পড়ে রামপ্রসাদ।

কিন্তু কোথায় গেল রাজেন্দ্রনাথ। পুলিশের কর্তৃপক্ষ হন্তে হ'য়ে চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগল।

কলকাতায় শোভাবাজার ষ্ট্রীটে ও দক্ষিণেশ্বরের এক পুরাতন বাগান

বাড়ীতে ঐসময় বাঙলার অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রমুখ কয়েকটি অত্যুৎসাহী তরুণ বোমা তৈরীর গোপন আড্ডা করে বোমা তৈরী করে চলেছে।

১০ই নভেম্বর—১৯২৫ সহসা একদিন রাত্রে সরকারী পুলিশ বাহিনী দক্ষিনেশ্বরের বাগান বাড়ীটা অতর্কিতে ঘেরাও করে ফেললে।

রাজেন্দ্রনাথ ও অনন্তহরি মিত্র প্রভৃতি নয়জন তরুণ বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলো। শোভাবাজারের বাড়ীও পুলিশ ঘেরাও করে প্রমোদরঞ্জন চৌধুরীকে তার একজন সঙ্গীসহ গ্রেপ্তার করল।

বোমা তৈরীর সাজ সরঞ্জাম, য়্যাসিড প্রভৃতি বিস্ফোরক পদার্থ ও বোমা, রিভলভার ইত্যাদি অনেক কিছুই পেল পুলিশের কর্তৃপক্ষ।

দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলা নাম দিয়ে অভিযুক্ত ও ধৃত বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে সরকার চার্জসীট্ তৈরী করে মহাসমারোহে বিচার প্রহসন আবার সুরু করে দিল।

রাজেন্দ্রনাথের নামে পূর্বেই কাকোরী মামলায় আনীত অভিযোগ অনুসারে লক্ষ্ণৌতে তাকে প্রেরণ করা হল, দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় দশবৎসর সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হবার অব্যবহিত পরেই।

বিচারের ফলাফলটাত' কি হবে তা পূর্বহ্লেই জানা ছিল।

তথাপি প্রহসনটুকু নির্বিঘ্নে শেষ করা হলো এবং ফাঁসীর আদেশ জারী হলো রাজেন্দ্রনাথের প্রতি।

ফাঁসীর সপ্তাহ পূর্বে রাজেন্দ্র নাথ একখানি পত্র লেখে তার এক আত্মীয়ের নিকটে।

সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল ফাঁসীর প্রতীক্ষায় বরাবঙ্কি ও গোণ্ডা জেলে অতিবাহিত করবার পর ফাঁসীর নির্দিষ্ট দিনটি যখন সে জানতে পারলে।

প্রিয়বরেষু

……কাল খবর পাইয়াছি যে এক সপ্তাহের মধ্যেই ফাঁসি হইয়া যাইবে। আমাদের সকলের প্রাণরক্ষা করিবার জন্য আমাদের যে সমস্ত পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধু অর্থদান করে, অন্যান্য উপায়ে চেষ্টা করিয়াছেন তাহাদের প্রতি আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

আপনারা সকলে আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করিবেন।……ভারতে দেশপ্রেমিক যাহারা আছেন তাঁহাদিগকে আমি আমার আন্তরিক নমস্কার জ্ঞাপন করিতেছি। 'বন্দেমাতরম্'।

আপনার—রাজেন্দ্রনাথ

তারও পরে ১৭ই তারিখে আর একখানা পত্র পাওয়া যায় রাজেন্দ্রনাথের লেখা পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট ফাঁসীর দিনটি পরিবর্তিত হবার পর।

বন্ধু!

……মৃত্যু কি! জীবনের রূপান্তর মাত্র। জীবন কি! মৃত্যুর অপর রূপ ভিন্ন কিছু নহে। সুতরাং মানুষ মৃত্যুভয়ে ভীতই বা হইবে কেন, কেহ মরিলে দুঃখিতই বা হইবে কেন? প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হওয়া যেমন স্বাভাবিক, মৃত্যুও তেমনি এক স্বাভাবিক ঘটনা মাত্র। History repeats itself—একথা যদি সত্য হয় তাহা হইলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না। সকলকে আমার অন্তিম নমস্কার জানাইবেন।

আপনার—রাজেন্দ্র

আমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হইবে না!

ভয় নাই! সত্যই তোমাদের মৃত্যু ব্যর্থ হয় নি।

আপন আপন জীবন দিয়ে সর্বত্যাগী সৈনিকের দল তোমরা যে রক্তলিপি লিখে রেখে গিয়েছো আজিও তা আগুনের শিখার মত কালের বুক জুড়ে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

চিরদিনই জ্বলবে এমনি!

এর ত' নির্বাণ নেই!

অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠী তোমাদের হত্যা করতে পারে নি!

তোমরা চিরজীবী। তোমরা মৃত্যুঞ্জয়ী।

তাইত তোমাদের স্মরণ করবো আমরা চিরদিন। প্রণাম গ্রহণ করো!

দক্ষিণেশ্বরের বাগান বাড়ীতে ও শোভাবাজারের বাড়ী থেকে ধৃত বিপ্লবী এগারজনের মধ্যে রাজেন্দ্র বাদে বাকী দশজনকে আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে বোমা ইয়ার্ডে এনে বন্দী করে রাখা হয়েছিল।

আদালতে মামলা চলেছে।

পুলিশের কলকাতার গোয়েন্দা বিগাগে তখন ডেপুটি সুপার ছিল শ্বেতাঙ্গের অন্ততম খয়েরখাঁ রায়বাহাদুর খিতাবধারী কুখ্যাত ভূপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

রায়বাহাদুরের অসীম ধৈর্য !

আকাঙ্খারও শেষ নেই।

মধ্যে 'মধ্যে রায়বাহাদুর প্রায়ই বোমা ইয়ার্ডে গিয়ে ধৃত বন্দী ঐ দশজন দুঃসাহসী মরণপনে কৃতসঙ্কল্প বিপ্লবীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে আসতো।

আশা যদি নতুন কিছু গোপন সংবাদ জোগাড় করা যায়।

আকাঙ্খাই হলো রায়বাহাদুরের কাল।

বিপ্লবীরা গোপনে গোপনে পরামর্শ করলে সরকারের ঐ ডালকুত্তাটিকে উচিৎ শিক্ষা দিতে হবে।

১৯২৬য়ের ২৮শে মে সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে।

আবছা অন্ধকারে চারিদিক অস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

রায়বাহাদুর অন্যান্য দিনের মত ঐ দিনও বিপ্লবীদের কিছুক্ষণ বিরক্ত করে বোমা ইয়ার্ড থেকে যেমন ষ্টেট্ ইয়ার্ডের বাহিরে এসেছে অতর্কিতে কয়েকজন বিপ্লবী জেলের ওয়ার্ডারের হাত থেকে জোর করে চাবি ছিনিয়ে নিয়ে দরজা খুলে ফেললে।

এবং একটা লৌহদণ্ডের সাহায্যে রায়বাহাদুরের মস্তকটি চূর্ণ বিচূর্ণ করে তার পরলোকের রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিল।

জেলের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল।

বহুকাল পরে শহীদ কানাইলালের হাতে বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী নরেন গোঁসাইয়ের মৃত্যুর পর এই দ্বিতীয়বার জেলের মধ্যে আর একজনকে হত্যা করা হলো।

সরকার বাহাদুর তার প্রিয় রায়বাহাদুরের হত্যায় ক্ষাপ্পা হ'য়ে উঠলো।

৯ই জুন বসলো সাড়ম্বরে আলিপুরে ট্রাইবুন্যাল তিনজন বিচারককে নিয়ে।

পুনরায় শুরু হলো নতুন করে দশজন বিপ্লবীর পূর্ণবিচার।

যথা সময়ে রায় দেওয়া হলো।

অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদ চৌধুরী ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো : ফাঁসী।

অবশিষ্ট সাতজনের দ্বীপান্তর।

কলিকাতা হাইকোর্টে আপীল করা হয়েছিল।

পুনর্বিচারে হাইকোর্টে: বীরেন্দ্র প্রভৃতি পাঁচজন নিরপরাধ বিবেচিত হওয়ায় মুক্তি পেল কিন্তু অনন্তহরি মিত্র ও প্রমোদ চৌধুরীর রইলো ফাঁসীরই দণ্ডাদেশ এবং বাকী তিনজনের দ্বীপান্তর।

বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের বুঝি শেষ নেই।

রাজরক্ত দানের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠায় আখর পড়েছিল পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠাতেও তার সমাপ্তি হলো না।

বন্দুকের গুলিতে হত্যা করে, ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে, কালাপানীর পাড়ে দ্বীপান্তরিত করে, শত লাঞ্ছনা, শত নির্যাতনেও শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতের বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে কোনদিন রোধ করতে সক্ষম হয় নি।

হত্যা করেছে, নিষ্ঠুর নির্যাতনে নির্যাতিত করেছে তারা মানুষের দেহকে।

কিন্তু Idea বা 'ভাব'ত মানুষের দেহের মত নশ্বর নয়।

তাকে ত' হত্যা করা যায় না, গুলি মেরে বা ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে।

অগ্নিতেও তাকে দগ্ধ করা যায় না।

তাই তারা মরে নি, দগ্ধ হয় নি: নিঃশেষ হয়ে যায় নি।

রক্তবীজের বংশের মত একের মৃত্যুতে সহস্র আবার নতুন করে নিয়েছে জন্ম।

অত্যাচারের রথচক্র যত জোরে চলেছে: আগুনের শিখা ততই লেলিহ হ'য়ে উঠেছে সর্বগ্রাসী ক্ষুধায়।

হয়ে উঠেছে অপরাজেয় পশুশক্তিকে সদম্ভে অস্বীকার করে।

চতুর্দিকে ভয়াবহ বিদ্রোহের সূচনা শ্বেতাঙ্গ সরকারকে আরো ক্ষিপ্ত আরো পর্যুদস্ত করে তোলে। একদিকে বিপ্লবের বহ্নি অন্যদিকে দেশবন্ধু মতিলাল প্রভৃতির স্বরাজ্যদল গঠন। সুচতুর শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা মণ্টেগু চেমস্‌ফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন অনুযায়ী উক্ত শাসন ব্যবস্থা চালু হবার দশ বৎসর উত্তীর্ণ হবার আগেই ভারতে এসে হাজির হলো ১৯২৮—৩রা ফেব্রুয়ারী বোম্বাই নগরীতে—সুবিখ্যাত (?) সাইমন কমিশন।

ভারতের জনগন চীৎকার করে জানাল: যাও ফিরে যাও সাইমন! চাই না! চাই না! Go back Simon;

দিকে দিকে উড়তে লাগল কৃষ্ণ পতাকা।

করা হলো হরতাল।

অদম্য উৎসাহ কিন্তু সাইমনের বোম্বাই নগরীতে প্রত্যাখাত হলেও নবীন উত্তমে এসে হাজির হলো লাহোরে। ৩০শে অক্টোবর।

পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, লাজপৎ রায়, ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ আলমের নেতৃত্বে বিরাট শোভাযাত্রা বের হলো: Go back Simon. Go back. ওয়াপস যাও!

ফিরিঙ্গীর প্রতিনিধিরা ক্ষেপে গেল: এত অপমান।

চালাও লাঠি!

অকস্মাৎ কোথা হ'তে কি হ'য়ে গেল প্রচণ্ড লাঠির আঘাতে লাজপৎ বিশেষ-ভাবে আহত হলেন।

সাশ্রুনেত্রে মূক বেদনায় দেশবাসী তাদের প্রিয় নেতার অচেতন রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত দেহটি বড় আদরে কাঁধে করে গৃহে ফিরে এলো।

লালাজী সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠ্‌লেন না।

১৯২৮—১৭ই নভেম্বর এক দিনশেষে শেষ নিঃশ্বাসটুকু তাঁর বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল।

ভারতবাসী কমিশনকে বর্জন করে নিজেদের মুক্তির পথ নিজেরাই বেছে নিন।

রাজধানী দিল্লী নগরীতে সর্বদল সম্মেলনে নেতা পণ্ডিত মতিলাল ঘোষণা করলেন: ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস্!

স্বায়ত্ব শাসন।

হয় সরকার তাদের (কংগ্রেসের) দাবী মেনে নেবে ১৯২৯য়ের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে অন্যথায় আবার সুরু করা হবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন—করদান বন্ধ। কংগ্রেসী নেতাদের ঐ আপোষ নীতিতে চরম পন্থীর দল কিন্তু সন্তুষ্ট হলো না।

মিথ্যে কেন এ প্রহসন?

আর ভয় দেখিয়ে নয়, ছিনিয়ে নাও!

শত্রুর সাথে করি গলাগলি, ধরি মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা!

সুভাষ ও জহরলাল ত' স্পষ্টই ঘোষণা করলেন: স্বায়ত্বশাসন নয় পূর্ণ স্বাধীনতা! পূর্ণ স্বাধীনতা!

কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ঐ অধিবেশনে দিগ্‌দেশহ'তে বহু বিপ্লবী এসে জড়ো হয়েছিল।

তারা কেউ কংগ্রেসের ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের দাবীতে সন্তুষ্ট হতে পারলনা। একেত' গোপীনাথ, রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র প্রভৃতির ফাঁসীর পর হতেই বিপ্লবীদের অন্তরের মধ্যে তীব্র অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল ক্রমে সেটাই লেলিহ হয়ে উঠবার উপক্রম হলো।

পরবর্তী কালের কয়েকজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী নেতা কংগ্রেসের ঐ সম্মেলনে একত্রিত হবার এবং পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করবার সুযোগ পায়।

সূর্য সেন, ভগৎ সিং ও যতীন দাস প্রভৃতির পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের যোগাযোগ ঘটে!

অত্যল্পকাল পরেই চট্টগ্রামে যে বিদ্রোহের ব্যাপক আগুন লেলিহান হ'য়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল—তার বীজ হয়ত ঐখানেই সূর্য সেনের মনের মধ্যে প্রথম ব্যপ্ত হ'য়েছিল কিনা তাই বা কে জানে!

চট্টগ্রাম ন্যাশন্যালস্কুলের একান্ত নিরীহ গণিতের শিক্ষকটি—তাকে দেখে বুঝবারও উপায় ছিল না যে কি প্রচণ্ড একটা আগ্নেয়গিরির সম্ভাবনা ঐ শান্ত নিরীহ ভালমানুষটির বক্ষের মধ্যে লুক্কায়িত ছিল।

সহসা একদিন যেমন বিসুভিয়াসের অগ্নিজাগরণে সমগ্র ইতালি সহরটা একেবারে তপ্তলাভার স্রোতে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল ঠিক তেমনই একদিন সূর্য সেনের পরিচিতি নিয়ে চট্টগ্রামের নিশীথ শান্ত কালো আকাশটা রক্তরাঙা হয়ে উঠ্‌লো।

ভগবান সাদরে তাঁর বক্ষে ভৃগুপদচিহ্ন ধারণ করেছিলেন, ধরিত্রী দেবীও বুঝি ততোধিক সাদরে ও স্নেহে তাঁর ঐ স্নেহের দুলালটিকে আপন বক্ষপরি স্থাপন করেছিলেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলের বহু বৈপ্লবিক আগ্নেয় অনুষ্ঠানের প্রধান হোতা, মহানায়ক ছিল সূর্য সেন।

সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে প্রখর জ্যোতিতে অকস্মাৎ জেগে উঠে মিলিয়ে গেল।

বিপ্লব ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সে এক মহা বিচিত্র বিস্ময়।

পূর্বে কেউ কোন দিন স্বপ্নেও ভাবে নি চট্টগ্রামবাসীরা যে, তাদেরই পাশে রয়েছে সৃষ্টির চরম এক অভূতপূর্ব বিস্ময়।

ভাবতেও পারেনি যে কত বড় রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে নিরীহ গোবেচারী শান্তশিষ্ট ঐ মানুষটির বুকের পাঁজরাগুলোর তলায় নিঃশব্দে ফল্গু ধারার মত।

—দুই—

কিন্তু আরও আগে ঐ পথেই এগিয়ে গিয়েছিল যে কয়টি শহীদ তাদের কাহিনীকে স্মরণ না করলে, তাদের স্মৃতিকে পুষ্পাঞ্জলি না দিলে বিদ্রোহের ঐ ইতিহাস যে থেকে যাবে অসম্পূর্ণ।

ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত ও বাংলা তথা ভারতের দধিচী যতীন দাস।

কুক্ষণে লাহোরের পুলিশ সুপার মিঃ স্কট ও তাহার কুখ্যাত সহকারী সাণ্ডার্স তাদের দলবল সহ বেপরোয়াভাবে লালাজি, ডাঃ সত্যপাল প্রভৃতির পরিচালিত শোভাযাত্রার উপরে লাঠি চালনা করে।

কাকোরীতে ট্রেণ ডাকাতি কে (?) কেন্দ্র করে রামপ্রসাদ, রোশেন সিং, আসফাকউল্লা ও রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী প্রভৃতির জীবনান্ত ঘটালেও নিষ্ঠুর দানবীয় ভাবে ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে—বিরাট সে বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানটিকে সরকার সমূলে বিনষ্ট করতে পারে নি। তাদের গঠিত বড় সাধের বড় কল্পনার হিন্দুস্থান সোস্যালিষ্ট রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন তখনও গোপনে তাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

নেতৃত্ব ঘাড়ে পড়েছে তখন ঐ এসোসিয়েশনের চন্দ্রশেখর আজাদের উপরে।

আরো একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল সরকারের শ্যেনদৃষ্টি ও সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে পাঞ্জাবে : নওজোয়ান সভা।

শেষোক্ত দলের নেতা ছিল বিখ্যাত বিপ্লবী অজিত সিংয়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ও কিষেণ সিংয়ের পুত্র : ভগৎ সিং।

ভগৎ সিংয়ের বিচারে অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ সুপার মিঃ স্কট ও তার সহকারী সাণ্ডার্সের মৃত্যুদণ্ড স্বাক্ষরিত হ'য়ে গেল।

গোপনে তার প্রস্তুতি চলতে লাগল।

১৯২৮ সনে ১৭ই নভেম্বর লালাজীর প্রয়াণের ঠিক এক মাস পরে ১৭ই ডিসেম্বরের অপরাহ্ণে লাহোরে জনতাবহুল কোর্ট ষ্ট্রীটের মোড়ে অজ্ঞাত (?) বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র মৃত্যু গর্জন করে উঠলো : দুড়ুম!...দুড়ুম!...

সচকিত হতভম্ব জনতার চোখের সামনে সাণ্ডার্স ও তার সঙ্গী চম্পালাল রক্তাক্ত কলেবরে পথের ধুলায় লুটিয়ে পড়ে কৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করল।

অত্যাচারীর বক্ষরক্ত শোনিতে এতদিনে বুঝি লালাজীর অমর আত্মার স্মৃতি তর্পণ হলো, পুলিশের দল সতর্ক হবার পূর্বেই বিপ্লবী হাওয়ায় মিলিয়ে গেল।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক! Long live revolution. ইনক্লাব্ জিন্দাবাদ্!

১৯২৮ সনের শেষে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন দিগ্‌দেশাগত বিপ্লবীদের যে মিলন ঘটে এবং কংগ্রেসের তোষণ নীতিতে যে তারা সন্তুষ্ট হ'তে পারেনি এবং একান্ত বাধ্য হয়েই যে, তাদের নিজেদের মনোমত পথকে বেছে নিয়ে তারা দেশকে স্বাধীন করবার দুর্জয় সঙ্কল্প নিয়ে মৃত্যুপণে অগ্রসর হয়েছিল তারই প্রথম আত্মপ্রকাশ দেখা গেল ১৯২৯ সনের ৮ই এপ্রিল দিল্লীর আইন-পরিষদ (এ্যাসেম্ব্লি) ভবনে প্রচণ্ড বোমার বিস্ফোরণে। পরিষদ ভবনে পরিষদেরা তখন Public safety Bill আলোচনায় ব্যস্ত, সহসা যেন তারই প্রতিবাদকল্পে প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হলো।

কারো প্রাণহানি হলো না বটে তবে কয়েকজন আহত হলেন সামান্য।

হত্যার প্রচেষ্টা ও বিস্ফোরক আইনের বলে ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত শ্বেতাঙ্গ সরকারদের হাতে ধৃত হ'য়ে তাদের সুবিচারে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলো।

কেমন করে না জানি ডালকুত্তার দল ঘ্রাণ শুঁকে শুঁকে পরের দিনই অর্থাৎ ৯ই এপ্রিল লাহোরের কাশ্মিরী বিল্ডিং অকস্মাৎ ঘেরাও ও খানা-তল্লাসী করে বহু পরিমাণে বিস্ফোরক দ্রব্য হস্তগত ত' করলই এবং শুকদেব ও কিশোরীলাল প্রভৃতি কয়েকজন যুবককে গ্রেপ্তারও করল।

আবার ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে এক মীরজাফর এগিয়ে এলো তার পূর্ব পুরুষের ঋণশোধ করতে—যার ফলে, তার স্বীকারোক্তিতে শ্বেতাঙ্গ সরকার আবার বিরাটভাবে খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় করে অসীম উদ্যমে আর এক নতুন মামলার পত্তন করলে : লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত বটুকেশ্বর দত্ত ও ভগৎ সিংকে নতুন করে টেনে এনে আবার অদ্ভুত করিৎকর্মা, চক্রী শ্বেতাঙ্গ সরকার উক্ত মামলার অন্যতম দোষী সাব্যস্তে আদালতে দাঁড় করাল।

নতুন করে সকলের সঙ্গে আবার ঐ দুই জনেরও বিচার প্রহসন শুরু হলো ইংরাজের আইনে, ইংরাজের আদালতে, ইংরাজের পদাশ্রিত বিচারকদের নিয়ে। বাংলার দধীচি যতীন দাসও এসে দাঁড়াল ধৃত হয়ে ঐ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত।

হয়ত বা গল্প কথা বা নিছকই কল্পনা কাহিনী, কবে কোন অতীত যুগে অসুর তাড়িত, স্বর্গভ্রষ্ট হৃতসর্বস্ব, লাঞ্ছিত দেবতার দলকে মুক্তি-অস্ত্র বজ্র নির্মাণের জন্য দধীচি মুনি স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করে তাঁর অস্থিদান করেছিলেন এবং দেবরাজ-ইন্দ্র সেই মৃত্যু বজ্র হেনে অসুরকুলকে ধ্বংস করে স্বীয় জন্মভূমিকে পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বাংলার এক তরুণ যুবকও ভারতের এক যুগসন্ধিক্ষণে তিল তিল করে সুদীর্ঘ ৬৩তম দিন ধরে দেশের মুক্তিযজ্ঞে প্রাণ নির্যাসটুকু নিংড়ে দিয়ে নিঃশেষ হ'য়ে গেল। ভারতের ম্যাক্সুইনী, ভারতের দধীচি প্রণাম তোমায়।

১৯০৪ সালে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাস বঙ্কিমবিহারি দাসের ঘরে জন্মগ্রহণ করে।

স্কুলের ছাত্র জীবন উত্তীর্ণ হয়ে যখন যতীন দাস বৃহত্তর কলেজী জীবনের দ্বারদেশে উপনীত সারা ভারতব্যাপী তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে মথিত হচ্ছে। যুবক যতীনের সমস্ত অন্তর ঐ সময় হতেই চঞ্চল ব্যাকুল হয়ে ওঠে : শৃঙ্খলিতা স্বদেশ জননীর মুক্তির জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে, দ্বিধা বা কোনরূপ সঙ্কোচ না করেই যুবক এগিয়ে গেল, স্বদেশ আমার, জননী আমার।

কাজ শুরু হলো প্রথমে কংগ্রেসের আওতায়।

পরবর্তীকালে ১৯২৪ সালে যতীনদাস যখন দক্ষিণ কলকাতা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, যোগাযোগ ঘটলো তার বিপ্লবী শচীন সান্যালের সঙ্গে।

অভ্যুত্থান হলো দক্ষিণ কলিকাতা তরুণ সমিতি'র।

বিপ্লবির মনে বিপ্লবের বীজ ব্যাপ্ত হলো।

দেশেও তখন গণ-আন্দোলনের ঢেউ অনেকটা চাপা পড়ে বিপ্লববাদ তলে তলে গোপনে আবার নতুন করে প্রসার লাভ করছে।

যতীন্দ্রনাথ পুরোপুরিই অগ্নিক্ষরা পথটাই বেছে নিল।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

গোপনে ঘরে ঘরে চললো আবার নবোদ্যমে প্রস্তুতি; বোমা গোলাগুলি রিভলভার জোগাড় হ'তে লাগলো। সংগৃহীত হ'তে লাগলো।

১৯২৪য়ের ৫ই নভেম্বর গ্রেপ্তার হ'য়ে কিছুকাল যতীন্দ্রনাথকে কারাগারেও কাটাতে হলো।

সেই সময়েই একবার যতীনদাস শ্বেতাঙ্গ সরকারের নীতি ও আচরণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে কুড়ি দিন অনশন করে, পরে সরকার প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় অনশন ভঙ্গ করে।

১৯২৯য়ের বঙ্গীয় রাষ্ট্রীয় সমিতির রংপুর অধিবেশনে বিপ্লবী নেতারা আবার অনেকেই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পায়।

পরবর্তী কালে খণ্ডখণ্ড সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের প্রথম পরিকল্পনা বিপ্লবীদের মধ্যে আলোচিত হ'য় ঐ সাক্ষাতের সময়ই।

যতীনদাসের উপরেই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং উত্তর ভারতে বিপ্লবীদলগুলির সহিত গোপন যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়।

শুধু তাই নয় হাত বোমা তৈয়ারী করবার দক্ষতাও ছিল যতীনদাসের।

এদিকে দিবালোকে জনবহুল লাহোরের রাস্তায় কুখ্যাত সাণ্ডার্সকে হত্যা করবার পর গোপনে পলায়ন করে ভগৎ সিং কলকাতায় চলে যায় এবং সেইখানেই অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে সে গিয়ে দেখা সাক্ষাৎ ও নানা আলোচনা চালায় কয়েকদিন ধরে।

ঐ সময়েই ভগৎ সিং দিল্লীর পরিষদভবনে বোমা নিক্ষেপ করবে বলে

জানায়। এবং যথা সময়েই যে বোমার অগ্নুদ্গার শোনা গিয়েছিল দিল্লী পরিষদ ভবনে এবং যার ফলে ধৃত হয়ে ভগৎ সিংয়ের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয় সেত আগেই বলা হয়েছে।

দিল্লী আইন পরিষদে বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পরদিনই লাহোরে 'কাশ্মিরী হাউস' খানাতল্লাসী হলো ও ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে গেল।

ভীত ত্রস্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষ্যাপা কুত্তার মত দেশের যুবকদের ধরতে শুরু করলো : সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আখ্যা দিয়ে।

অনেকের সঙ্গে যতীন দাসও ধৃত হলো।

ফলোয়া করে সরকার বাহাদুরের 'লাহোর ষড়যন্ত্র মাম্‌লা'র হলো পত্তন।

নিরুপায় বন্দীদের প্রতি সরকারী পদলেহী, উচ্ছিষ্টভোগী—বেতনভুকদের শুরু হলো দুর্ব্যবহার, নির্যাতন ও পীড়ন আবার।

বন্দীদের মধ্যে অনেকেই বললে : আমরা অনশন করবো।

যতীনদাস কিন্তু প্রতিবাদ জানাল : বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ও কার্যের সেটা হবে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত। অহিংস সংগ্রাম আমাদের নয়। আমরা চিরদিন সশস্ত্র বিপ্লবের পথে চলেছি। সেই আমাদের উদ্দেশ্য।

কেউ কেউ সমর্থন জানাল—আবার কেউ কেউ সমর্থন করলে যতীনদাসের প্রস্তাব। অবশেষে প্রতিবাদকল্পে অনশনই সুরু করা হবে স্থিরিকৃত হলো!

দেশের লোক স্তম্ভিত বিস্ময়ে শুনলো লাহোর জেলে একদল বন্দী বিপ্লবী অনশন সুরু করেছে, এবং তাদেরই মধ্যে একজন যতীন দাস।

একটি দুটি করে দিন যায় অগণিত দেশের নরনারী বিস্ময়ে ও শ্রদ্ধায় শোনে যতীনদাসের শরীর ক্রমশঃ ভেঙ্গে পড়ছে কিন্তু তথাপি প্রতিজ্ঞা তার ভঙ্গ হয় নি, সরকার পক্ষের অনশন ভঙ্গ করবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়।

জোর করে নলের সাহায্যে পাকস্থলীতে আহার্য ভরে দিতে গিয়ে হিতে বিপরীত হলো : খাদ্যবস্তু পাকস্থলীর বদলে ফুস্‌ফুসে প্রবিষ্ট হ'য়ে দারুণ যন্ত্রণা দেখা দিল।

জ্ঞান লুপ্ত হলো যতীনের।

দিন অতিবাহিত হ'য়ে চলেছে একটির পর এক।

দেহ ক্ষীণ হতে ক্ষীণ হয়ে যায়।

মাংস্ পেশী শুকিয়ে লীন হয়ে যায়। নাড়ীর গতি ক্ষীণ, শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণ।

ভাইয়ের শয্যার পাশে কিরণ দাস এসে বসল, তাও একটি সর্তে : জ্ঞান বা অজ্ঞান কোন অবস্থাতেই তাকে যেন খাদ্য ও পানীয় না দেওয়া হয়।

পাছে তৃষ্ণায় কাতর হ'য়ে কখন জল পান করবার কোন দুর্বল মুহূর্তে মনের মধ্যে ইচ্ছা জাগে : নিজহাতে তাই জলের কলসীটি পর্যন্ত ভেঙ্গে ফেলেছিল যতীন।

একটি দুটি করে ৫২ দিন গত হলো : বাঁচবার আর কোন আশাই নেই।

মৃত্যুর কালোছায়া নেমে এলো।

তথাপি প্রতিজ্ঞায় ধীর স্থির !

মৃত্যুও বুঝি অসঙ্কোচে শ্রদ্ধায় মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকে দুয়ারের কাছে। আরো দশটা দিন কেমন করে যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল।

৬২তম দিবস।

দেশের অগণিত নরনারী বালক যুবা কিশোর উৎকণ্ঠায় উদ্বেগে প্রতিমুহূর্তে কণ্টকিত হচ্ছে।

নাড়ীর গতি আরো ক্ষীণ ! আরো দুর্বল। প্রাণ বুঝি আর বক্ষ পিঞ্জরে থাকে না।

৬৩তম দিবস, ১৯২৯—১৩ই সেপ্টম্বর, শুক্রবার।

সকাল হতেই দেখা দেয় হিক্কা।

অবয়ব ক্রমশঃ শিথিল হ'য়ে আসছে।

হৃদপিণ্ডর গতি এই বুঝি থেমে যায় এত ক্ষীণ।

দেখতে দেখতে শেষ সময় : মহাপ্রয়াণের লগ্ন কাছে ঘনিয়ে এলো।

মধ্যাহ্ন সূর্য আকাশে এসে ঠিক মধ্যস্থলে দাঁড়াল : স্বর্গের দেবদূতেরা এলো।

রথ প্রস্তুত।

ক্ষীণ কণ্ঠ একটিবার শুধু কম্পিত হলো : বন্দেমাতরম্।

শেষ ! সব শেষ।

মৃত্যুহীন প্রাণটুকু নিঃশেষে দান হ'য়ে গেল।

সাশ্রুনেত্রে জেলের কর্তৃপক্ষ ক্ষীণ অস্থিচর্মসার মৃতদেহটি কিরণদাসের হাতে তুলে দিল।

বিদ্যুৎ গতিতে সংবাদ দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল।

শোকে দেশবাসী মুহ্যমান হ'য়ে সশ্রদ্ধ নমস্কার জানাল নবযুগের নব দধিচীকে।

লাহোরের কারাপ্রাচীরের বাইরে বিরাট জনতা তাদের প্রিয় যতীনকে দেখবার জন্য উদগ্রীব ব্যাকুল অশ্রুসজল চক্ষে অপেক্ষা করছে।

পাঞ্জাবের জন নেতারাও এলেন।

শবদেহ বহন করে সকলে যখন জেলের ফটকের বাইরে চলেছে: দরজার উপরে দাড়িয়ে পুলিশ সুপার শ্বেতাঙ্গ হ্যামিল্টন হার্ডিং।

তারও চোখের পাতা দুটো সজল হয়ে ওঠে।

নিঃশব্দে মাথার টুপি খুলে মাথা নোয়ায় শ্বেতাঙ্গ!

স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল বসেছে: লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার (?) করতে লাহোর সেণ্ট্রাল জেলেই! বিচারই বটে!

চেয়ারম্যান কোল্ডষ্ট্রিম শ্বেতাঙ্গ বিচারক।

শেষ পর্যন্ত চিরাচরিত ভাবেই একদিন—১৯৩০-১১ই সেপটেম্বর চরম নিষ্পত্তি কথা সগৌরবে উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত হলো।

ভগৎ সিং, শুকদেও, রাজগুরু ও শিবরামের মৃত্যুদণ্ড।

সাতজনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বাকী দু'জনের একজনের সাতবৎসর ও একজনের পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড।

কেউ কেউ আপীলের কথা তোলায় তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল ভগৎ সিং: আপীল আবার কি! আর কার কাছেই বা দয়া ভিক্ষা! আমরা কোন অন্যায়ই করি নি। তবু ওরা আমাদের দণ্ড দিয়েছে নেবো মাথা পেতে সেই দণ্ড! অন্যায়ের বিরুদ্ধে সেই আমাদের প্রতিবাদ! অত্যাচারের বিরুদ্ধে সেই আমাদের জেহাদ।

শুধু তাই নয়, ভগৎ সিং বললে: ফাঁসী কেন! গুলি করে মারো আমাদের।

মৃত্যুই দেবে যখন, অন্তত ইচ্ছামৃত্যু দাও! বুক পেতে দাঁড়াচ্ছি, কর গুলি!

কিন্তু সরকার রাজী হলো না!

বললে: না ফাঁসী!

তবে ফাঁসীই হোক! হেসে হেসে পরবো ফাঁসী! দেখবে চেয়ে দেখো!

মৃত্যুকে মোরা জয় করেছি—তবে মৃত্যুর কি দেখাও ভয়।

তথাপি দেশের জনগণ চেষ্টার কসুর করলে না।

মহাত্মা গান্ধীর চেষ্টাও নিষ্ফল হলো।

১৯৩১—২৩শে মার্চ।

সন্ধ্যার ধুসর ছায়া চারিদিকে ঘন হ'য়ে এলো!

আসছে শান্ত কালো রাত্রি!

কালো আকাশ পটে একটি দু'টি করে নক্ষত্র সবে তাকাতে শুরু করেছে মিটি মিটি।

মৃত্যু সেলের লৌহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হলো।

'কে!—ও তোমরা!—প্রস্তুত, চলো!—'

সবার অজ্ঞাতে অত্যাসন্ন রাত্রির ঘনায়মান অন্ধকারে নিঃশব্দে শ্বেতাঙ্গের দল লাহোর সেণ্ট্রাল জেলের ফাঁসীর নিভৃত গোপন কক্ষে, নিষ্ঠুর পৈশাচিক জিঘাংসার ঘৃণ্যতম অনুষ্ঠান সম্পন্ন করলো।

ভগৎ সিং, শুকদেও ও রাজগুরুর শেষ নিঃশ্বাস কালো অন্ধকার কারা কক্ষ ভেদ করে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল, কালো আকাশে রক্তের ছোপ ধরিয়ে! লাল রক্ত!

ওরে পাষাণী! আরো কত বলিদান দিতে হবে! কত প্রাণ দান আরো বাকী! ছিন্নমস্তার রক্ত তৃষা কি মিটবে না কোন দিন!

* * *

মুগ্ধ বিস্ময়ে আত্মহারা সৃষ্টিধর তন্ময় হয়ে গিয়েছিল সেতারের সুর ঝঙ্কারে।

সহসা ঝন্ ঝন্ করে একটা শব্দ তুলে সুর কেটে গেল।

সেতারের তার ছিঁড়ে গিয়েছে।

সতীর সেতারের তার ছিঁড়ে গেল।

শোনা গেল ঐ মুহূর্তে একটা প্রাণান্তকর উচ্ছ্বসিত কাসির দুরন্ত বেগ।

খঙ্ খঙ্ শব্দে বিনয় কাসছে।

বুকের পাঁজরাগুলো বুঝি দুরন্ত কাসির বেগে ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে।

'সতী!—'

হঠাৎ সেতারের তারটা ছিঁড়ে যাওয়ায় সতী কেমন বিহ্বল হ'য়ে গিয়েছিল।

একটু আগের সুরের ঝঙ্কারটা যেন তখনও ঘরের বায়ুস্তরে একটা ভাষাহীন বেদনার অনুরনণ তুলে চলেছে।

তাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিল বিনয়ের কাসির শব্দটা!

চম্‌কে উঠলো সতী : কি হলো!

কাসতে কাসতে এক ঝলক তাজা লাল রক্ত বিনয় সতর্ক হবার পূর্বেই শুভ্র উপাধানের ওয়াড়টা রাঙা করে ভিজিয়ে দিল।

সতী এগিয়ে এসে বিনয়ের পাশটিতে একেবারে বসে পড়ে।

বিনয় ক্লান্ত মাথাটা এলিয়ে দেয় সতীর কাঁধের উপরে।

হাঁপাচ্ছে তখনও সে। বুকটা হাপরের মত ওঠা নামা করছে।

সৃষ্টিধরও সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করে।

সতী দু'হাতে বিনয়কে বুকের মধ্যে তখন নিবিড় করে টেনে নিয়েছে। চক্ষু দুটি তার ক্লান্তিতে নিমীলিত।

রক্তে সিক্ত লাল উপাধানটার প্রতি নজর পড়ে সৃষ্টিধরের।

'আবার রক্ত পড়ছে বুঝি!—'

সতী সৃষ্টিধরের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন জবাবই দেয় না। স্থির নির্বাক পাষাণের মত বিনয়ের মাথাটা বুকের উপরে নিবিড় করে আঁকড়ে যেমন বসেছিল তেমনিই বসে রইলো।

জ্বল জ্বল করে জ্বলছে সতীর সীমন্তের সিন্দুর।

শয্যার উপরে উপাধানটা রক্তে লাল হ'য়ে গিয়েছে ভিজে।

সৃষ্টিধর কিছুক্ষণ নির্বাক স্থাণুর মত ওদের দিকে তাকিয়ে থেকে এক পা এক পা করে আরো কাছে এগিয়ে এলো!

'বিনয়কে শুইয়ে দাও সতী!—' বিষণ্ণ গম্ভীর কণ্ঠে সৃষ্টিধর বলে।

তথাপি সতী নিরুত্তর।

স্থির অকম্পিত দৃষ্টিতে সতী সামনের দিকে তাকিয়ে।

মোমবাতিটা পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে।

কাঁপছে ভীরু আশঙ্কায় শিখাটি থেকে থেকে।

'সতী!—'

সতী নিরুত্তর।

'সতী বিনয়কে শুইয়ে দাও!—'

'তুমিই শুইয়ে দাও দাদা! তুমিই শুইয়ে দাও—'

ঝর ঝর করে অশ্রু নেমে এলো সতীর চিবুক ও গণ্ডকে প্লাবিত করে।

চমকে উঠে সৃষ্টিধর ঝুঁকে পড়ে বিনয়ের দেহটা স্পর্শ করতেই সমস্ত ওর কাছে পরিষ্কার হ'য়ে যায়।

সতীর বুকের উপর থেকে বিনয়ের দেহটা টেনে নেবার চেষ্টা করতেই শিথিল দেহটা সৃষ্টিধরের হাতের উপরে এলিয়ে পড়ল।

ধীরে ধীর অতি যত্নে, পরম স্নেহে সৃষ্টিধর সেই লাল রক্তে ভিজা উপাধানটার উপরেই বিনয়কে শুইয়ে দিল।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থেকে সস্নেহে ডান হাতখানি সতীর পিঠের উপরে রাখতেই সতী মুখ তুলে তাকাল সৃষ্টিধরের দিকে।

'সতী!—'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ তুমি দাদা। কতবার খোঁজ করেছে!—'

খোলা বাতায়ন পথে এক ঝলক নৈশ বায়ু এসে ঘরের ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো ফস্ ফস্ করে ওলোট পালোট করে দেয়।

সেই দিকে তাকাতেই সৃষ্টিধরের চোখে পড়ল ১৫ই আগষ্ট তারিখটায় লাল পেনসিল দিয়ে দাগা বুলান। আজ ২রা আগষ্ট।

ফিরে তাকাল সৃষ্টিধর আবার সতীর মুখের দিকে।

নিঃশব্দ অশ্রু নির্ঝর সতীর গণ্ড ও চিবুক প্লাবিত করে দিচ্ছে।

'কাঁদিস না ভাই! কাঁদিস না—'

'না দাদা কাঁদিনি ত। কিন্তু ১৫ই আগষ্টের যে এখনো তের দিন বাকী দাদা!—'

'তের দিন নয় সতী! হয়ত এখনো একটা যুগ! রক্ত তপস্যার এও শেষ নয় বোন।

এত অল্পেই ত' এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। এ অজ্ঞতা, এ ভীরুতার ক্ষমা মিলবে না।—'

সতী যেন চীৎকার করে ওঠে: এখনো অল্পই তুমি বলবে দাদা!

'হাঁ! তাই! তাই বলবো! আমরা যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখছি সেত মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্যে দিয়ে মুষ্টিমেয়র সুবিধা-যোগ নয়! সে যে সমস্ত ভারতবাসীর মুক্তির স্বপ্ন। সত্যিকারের মানুষের মত বাঁচবার অধিকার। এত অল্পের জন্য সামান্য ঐ প্রাপ্তিটুকুর জন্যই কি বিনয়ের দল এমনি করে বুকের রক্ত দিয়ে সংগ্রাম করে গেল!

এখনো! এখনো যে অনেক বাকী!—এই শেষ নয়। ১৫ই আগষ্টই শেষ নয়!—'

এই যদি শেষ নয় তবে শেষ কোথায়।

কোথায় কোন অন্ধকার তিমির গর্ভে সেই জ্যোতির্ময় ভানু!

চল! চল এগিয়ে চল!

বিপ্লবীর বিশ্রাম নেই!

থামলে তাকে ত' চলবে না—যতীনদাস, ভগৎ সিং, শুকদেও ও রাজগুরুর জীবন দানই বিদ্রোহী ভারতের শেষ পর্ব নয়।

ওদের রক্তদানই বিপ্লবের শেষ পৃষ্ঠা নয়।

তাদের যে শবভস্ম গঙ্গা ও শতদ্রু নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল মাটি তা শোষণ করে নিল। মাটিই আবার তা ফিরিয়ে দিল।

মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের কলাবাগান বস্তীর মধ্যে একটা নিভৃত বাড়ীর কক্ষে নিঃশব্দে যে বিপ্লব প্রস্তুতি চলছিল, শ্বেতাঙ্গ সরকারের কাছে বেশি দিন আর সেটা গোপন থাকল না। দুঃসাহসী কয়েকজন বিপ্লবী নিভৃতে বস্তীর ঐ বাড়ীটার মধ্যে সংগোপনে বিপ্লবের প্রস্তুতির অত্যাবশ্যকীয় অস্ত্রশস্ত্র হিসাবে বোমা তৈয়ারী করছিল।

১৯২৯ সনের ১৮ই ডিসেম্বর শীতের একরাত্রি শেষে তখনও ভোরের আলো ভাল করে প্রকাশ পায় নি।

কুয়াশাচ্ছন্ন আকাশের প্রান্তে ভোরের শুকতারা জ্বলছে।

সশস্ত্র পুলিশের গাড়ী এসে দাঁড়াল।

গুপ্তচর মুখে পুলিশের কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নেই সমস্ত গোপন সংবাদ অবগত হয়েছিল।

সশস্ত্র পুলিশ বাড়ীটা চারপাশ হ'তে ঘেরাও করে ফেললে।

মচমচ শব্দে জুতো পায়ে ঘরের মধ্যে গিয়ে পুলিশ প্রবেশ করল।

নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী ও রমেন বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করল, তারা তিনজন তখন ঐ ঘরের মধ্যেই ছিল।

সমস্ত বাড়ীটা খানাতল্লাসী করে কতকগুলো লাল ইস্তাহার ও বোমা তৈয়ারীর ফরমূলা সরকার বাহাদুরের প্রমাণ হিসাবে হস্তগত হলো।

পুলিশের দল ওদের তিনজনকে নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যাবে ঠিক এমনি সময় সুধাংশু দাশগুপ্ত ঐ বাড়ীতে এসে হাজির। বেচারী কিছুই জানত না এবং পূর্বাহ্নে কোন কিছুই সন্দেহ করতে পারে নি।

সুধাংশু দাশগুপ্তর দেহ অনুসন্ধান করে একটা বোমা ও একটা গুলি ভর্তি রিভলভার পাওয়া গেল।

আশপাশের আরো কয়েকটি বাড়ী অনুসন্ধান করে পুলিশ বোমা তৈরীর কিছু সরঞ্জামও আবিষ্কার করলে।

সতীশ পাকড়াশী, নিরঞ্জন সেন, রমেন বিশ্বাস ও সুধাংশু দাশগুপ্ত ছাড়াও আরো শচীন কর, মুকুল সেন, জগদীশ চ্যাটার্জী ও নির্মল দাশ প্রভৃতি আরো বত্রিশজন যুবককে ধৃত করে শ্বেতাঙ্গ সরকার নতুন করে নবোদ্যমে আবার একটি বিরাট মামলা খাড়া করলো। নাম দেওয়া হলো তার: মেছুয়া বাজার বোমার মামলা।

আলিপুরে স্পেশাল ট্রাইবুনালের হাতে ঐ সব অভিযুক্তদের বিচারের প্রহসনটা তুলে দিল সরকার বাহাদুর।

দীর্ঘদিন ধরে বিচার প্রহসন শেষ করা হলো।

নিরঞ্জন সেন ও সতীশ পাকড়াশীর সাত বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড: সুধাংশু দাশগুপ্ত ও রমেন বিশ্বাসের পাঁচ বৎসর করে কারাদণ্ড হলো।

মেছুয়া বাজার বোমার মামলার উপরে যবনিকাপাত হলো।

ঐ সময়েই—১৯২৯ য়ের ২৩শে ডিসেম্বর ভারতের তদানীন্তন বড় লাট বাহাদুর লর্ড আরউনের বিপ্লবীদের দ্বারা একবার প্রাণ নাশের চেষ্টা হয়।

কিন্তু দুর্ভাগ্য বিপ্লবীদের এবং সৌভাগ্য লর্ড বাহাদুর আরউইনের তিনি রক্ষা পান, কেবল মাত্র দুই জন আর্দালী বোমা বিস্ফরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

নয়া দিল্লীর মাইল খানেক দূরবর্তী ট্রেনের লাইনের নিচে বোমা স্থাপন করে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বিস্ফোরণের ব্যবস্থা করে বিপ্লবীরা কিন্তু বিস্ফোরণের ব্যাপারে ও হিসাবে সামান্য একটু গোলযোগ ঘটে গেল।

যার ফলে লাট বাহাদুর অক্ষতই রইলেন।

ভারতের আকাশে ইতিমধ্যে যে আবার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল অনেকেই সে সংবাদ পায় নি।

বস্তুত সাইমন কমিশনের ব্যর্থতা ও তার প্রতি ভারতবাসীর তীব্র অনাস্থা ও অসন্তোষ, লাহোরে জনতার প্রতি বেপরোয়া লাঠি চালনা ও যার ফলে লালাজীর আহত হ'য়ে রোগ শয্যা গ্রহণ ও মৃত্যু ইত্যাদি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে যে দুর্নিবার ঝড়ের কালোমেঘ আবার ভারতের আকাশে বাতাসে, অত্যাসন্ন হ'য়ে আসছে লর্ড আরউনের বুঝতে সেটা দেরী হয়নি। লর্ড আরউইন বুঝতেই পারছিলেন নানা কারণেই তলে তলে আবার বিপ্লবীদের হাতের খড়্গ কৃপাণ ঝলকি উঠ্ছে।

যাহোক আপাততঃ একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে চারিদিকে সত্বর বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে উঠবে।

বিলাতে ঐ সময় শ্রমিক দলের সংখ্যাধিক্যে মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল এবং মিঃ রামসেম্যাকডোনাল্ড প্রধান মন্ত্রী ও মিঃ ওয়েজউড বেন ভারত সচিব অর্থাৎ বন্ধু।

পুর্বে ম্যাকডোনাল্ড সাহেব ভারতবাসীর প্রতি দরদে অভিভূত হ'য়ে 'এওয়েকৃনিং অফ ইণ্ডিয়া' অর্থাৎ 'ভারত জাগরণ' সম্পর্কে একখানা কিতাবও রচনা করেছিলেন—সেই কারণেই ম্যাকডোনাল্ড সাহেব যখন মন্ত্রীত্বের আসনে এসে উপবিষ্ট হলেন ভারতবাসীর তার প্রেমে বা তার সুবিচারের প্রতি আস্থা স্থাপন করা ও কিছুটা আশা পোষণ করা খুবই স্বাভাবিক। এবং শুধু তাই নয় বড় লাট বাহাদুর লর্ড আরউইন সাহেবও জুন মাসের শেষেই চার মাসের দীর্ঘ ছুটি নিয়ে বিলাত যাত্রা করলেন।

ইতিপূর্বে ১৯১৭ খৃঃ মহাত্মা গান্ধী আহমদাবাদে একটি শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন করেছিলেন কিন্তু প্রথমটায় বিশেষ কোন গঠনমূলক কার্য্য হয়ে ওঠেনি, অসহযোগ আন্দোলন কালে রাষ্ট্রীয় তদানীন্তন নেতারা নিজ নিজ অঞ্চলে তাদের—শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে চেষ্টা করেন। ১৯২১ সনে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বোম্বাই নগরীতে হয় ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। দ্বিতীয় অধিবেশন হয় ঝরিয়ায় এবং তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে ১৯২০ সনে—সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ঐ সময়েই বোম্বাই, জামসেদপুর ও কলকাতার উপকণ্ঠের কারখানাগুলিতে কয়েকটি শ্রমিক ধর্মঘট হয়। এবং শ্রমিক নেতাদের মধ্যেও নরম ও চরমপন্থী দু'দল দেখা দেয়। একদল বললেন, শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। অন্য দল বললেন, এক কথায় রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট তন্ত্র বা কম্যুনিজমই তাদের মন্ত্র—অর্থাৎ দল, সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন অন্যথায় শ্রমিক সমাজের উন্নতির কোন আশাই নেই। ফলে যা হবার তাই হলো দ্বিতীয় পন্থিদের মধ্যে বিপ্লবের স্ফুলিংগ ( ? ) দেখে সরকার বললেঃ বেআইনী। ঐ নীতি চলবে না। বন্ধ কর!

শুরু হয়ে গেল আবার ধরপাকড়।

১৯২৯য়ের ২০শে মার্চ সরকার বাহাদুর পাঞ্জাব, বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশের শত শত গৃহে ব্যাপক খানাতল্লাসী করে তদানীন্তন নিখিল ভারত কংগ্রেস

কমিটির আটজন সদস্যের সঙ্গে বিভিন্ন স্থান হতে ৩১ জনকে গ্রেপ্তার করে। এবং ১৯২৯ সনের ১৫ই মার্চ ইটনের প্রদত্ত রিপোর্টের উপরে ভিত্তি করে ভারত সরকার সমগ্র ভারতব্যাপী এক বিরাট বলশেভিক তন্ত্র প্রতিষ্ঠার দুঃস্বপ্নে মনোগত এক প্রকাণ্ড ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়।

ধৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে—ভারতে কম্যুনিজম প্রচার ও সোভিয়েৎ রুশিয়ার আদর্শে রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অবৈধ প্রচেষ্টার অভিযোগে অভিযুক্ত করে ১৯২৯ সালের ১১ই জুন মীরাটের এ্যাডিসনাল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ হোয়াইটের এজলাসে বিরাট এক ষড়যন্ত্র মামলার পত্তন করল।

মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা।

মীরাটেই নাকি ষড়যন্ত্রের প্রধান ঘাঁটি ছিল এই কারণেই ঐ মামলার মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা নামাকরণ করা হলো।

আরউইন সাহেব বিলাতে গিয়ে ভারতের সর্বত্র অসন্তোষের বহ্নি ও বিপ্লবান্দোলনের প্রসারের কথা কর্তৃপক্ষদের কর্ণগোচর করলেন এবং ভারতের ছদ্মবেশী হিতৈষীর দল স্থির করলেন একটা গোলাকার টেবিলের চারপাশে সকলে মিলে বসে অচিরাৎ ভারতের দুঃখ কষ্ট ও অভাব অভিযোগ নিরশনকল্পে একটি বৈঠকে উপবিষ্ট হবেন। সাধু! সাধু!

গোলটেবিল বৈঠক!

২৬শে অক্টোবর আরউইন সাহেব বিলাত হতে ফিরে এলেন এবং ৩১শে অক্টোবর দরদ ভরা গলায় এক ঘোষণা করলেন: ভারতবাসী মা ভৈষী! আর ভয় নাই! শৃণু!...

ভারত শাসনের আদর্শ ডোমিনিয়ান ষ্টেটাস, ভাবী শাসনতন্ত্রে বৃটিশ ভারত ও রাজন্য ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধনের আবশ্যকীয়তা এবং সেই সাধু উদ্দেশ্যেই ভারতীয় নেতৃবর্গকে নিয়ে লণ্ডনে একটি মহা সম্মেলনের ব্যবস্থা আমরা করছি শীঘ্রই।

বিবৃতি প্রকাশের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই দিল্লীতে উপস্থিত কংগ্রেসী ও অকংগ্রেসী নেতারা একত্রে মিলিত হ'য়ে আলোচনা করে লাট বাহাদুরকে তাঁর সদ্‌ইচ্ছার প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সঙ্গে সঙ্গেই জানালেন, সবই বুঝলাম তবে ব্যাপারটা অনুগ্রহ করে আরো একটু স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিন আমাদের। স্পষ্ট করে জানান আপনাদের ঐ মহতী সভার উদ্দেশ্য সত্য সত্যই ডোমিনিয়ান ষ্টেটাসের অনুরূপ শাসনতন্ত্র রচনা করাই কিনা!

দাবিপত্রে স্বাক্ষর দিলেন, মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহারু, মদনমোহন মালবীয়, তেজবাহাদুর সাপ্রু ও মহম্মদ আলি জিন্না প্রভৃতি দেশের তদানিন্তন নেতৃবৃন্দ।

ভারত সচিব ওয়েজ উড্‌বেনের বিবৃতিতেই সব স্পষ্ট হয়ে গেল: ভারত শাসন নীতির কোন পরিবর্তনই হয়নি এবং বর্তমানে হবেও না, বরং ১৯১৭ সনে যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তাই রয়েছে এখনো বলবৎ।

ধীরে রজনী ধীরে।

এত দ্রুত নয়। ধাপে ধাপে—শনৈঃ। শনৈঃ।...

ঘাবড়াবার অবশ্য কোন কারণ নেই শনৈঃ শনৈঃ ভারতবর্ষকে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে এবং সেই ধাপ অবশ্যই নির্ণীত হবে বিদ্বান, বিচক্ষণ ভারতের প্রকৃত সুহৃদ পার্লামেণ্টের সদস্যদের দ্বারাই।

অতএব—

সব গোলমাল হ'য়ে গেল। ভোজবাজীর আসল ফাঁকিটুকু আর কারো কাছেই অস্পষ্ট রইলো না।

শ্বেতাঙ্গীয় বুজরুকীতে ভুললে না দেশবাসী!

তোমার কুটিল নয়ন ছলের বাঁধন আর নয়। আর নয়।

২৩শে ডিসেম্বর লর্ড আরউইনের যে প্রাণনাশের ব্যর্থ প্রচেষ্টা হয় ঐ দিনই তিনি ভারতের ভাবী শাসন ব্যাপার সম্পর্কে দেশের তদানিন্তন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য সফর থেকে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন।

১৯৩০ সনের প্রারম্ভেই দেশের মুক্তি যজ্ঞের প্রতিনিধিবৃন্দ নববর্ষের শুভলগ্নে স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলেন।

২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' সর্বত্র প্রতিপালন করা হবে সাব্যস্ত হলো।

১৯৩০ সনের ছাব্বিশে জানুয়ারী থেকেই প্রতি বৎসর জাতি স্বাধীনতা দিবস পালন করে আসতে লাগল।

১৯২৫ সনে দেশী বস্ত্রের উপর থেকে সরকার ট্যাক্স তুলে দেয় ও বিদেশী বস্ত্রের উপরে ট্যাক্স—শুল্ক কিছু বৃদ্ধি পায়।

১৯২৭য়ে বাট্টার হার যে ভাবে নিয়মিত হলো তাতে করে বিদেশী বস্ত্রের মূল্য শতকরা সাড়ে বার টাকা কমে গেল।

ভারতবাসীর হলো ঐ ব্যাপারে সমূহ ক্ষতি কারণ বিলাত থেকেই বেশী বস্ত্র তখন ভারতে আমদানী হচ্ছিল।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে মিশর ও মার্কিনী তুলার উপরও শুল্ক ধার্য করা হলো।

অথচ ঐ তুলার দ্বারাই সুতা প্রস্তুত করে বিলাতের ল্যাঙ্কাশায়ারের অনুরূপ বস্ত্র এখানে ভারতেই তৈরী করা যেতে পারত।

মালব্যজী এর প্রতিবাদে সদস্যপদ ত্যাগ করলেন।

২রা মার্চ লাট আরউইনকে মহাত্মা তাঁর সঙ্কল্পের কথা জানিয়ে এক পত্র লিখলেন।

পরবর্তী ১২ই মার্চ উনাশী জন আশ্রমবাসীদের নিয়ে তাঁর আশ্রম সবরমতী থেকে দীর্ঘ দুই শত মাইল দূরবর্তী, সমুদ্র তীরস্থ গ্রাম ডাণ্ডিতে পদব্রজে গিয়ে সরকারের তদানিন্তন বলবৎ লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি আইন অমান্য ব্রত উদযাপন করতে মনস্থ করেছেন।

স্থির প্রতিজ্ঞ হয়েছেন।

দেশে লবণ তৈয়ারী তখন আইন বিরুদ্ধ ছিল।

নিত্যকার দেহধারণের জন্য প্রয়োজনীয় নুন। সেই নুন বা লবণটুকু পর্যন্ত তৈরী করবার দেশবাসীর স্বাধীনতা ছিল না।

সরকার নিজ হাতে তৈরী করে নিমকটুকুও খেতে দেবে না পাছে নিমক-হারামীর পাপে লিপ্ত হই আমরা।

মহাত্মা বড়লাট বাহাদুরকে লিখিত তাঁর পত্রের কোন জবাবই পেলেন না।

দ্বিতীয়বার পত্র দিলেন—জবাব এলো হতাশাব্যঞ্জক!

তিনি জানালেন মহাত্মা যদি অন্যায় করবেন বলে মনস্থির করেই থাকেন তিনি দুঃখিত ছাড়া আর কি হতে পারেন।

আহা সত্যিই ত!

মহানুভব ব্যক্তি! দুঃখিত হবেন বৈকি।

কিন্তু সঙ্কল্পে অচল অটল মুক্তিসাধক এবারে আর পত্র দিলেন না। কেবল প্রত্যুত্তরে ইয়ং ইণ্ডিয়া পত্রিকায় প্রকাশ করলেন তার জবাবটুকু।

**On bended knees I asked for bread and I received stone instead.**

ক্ষুধার জালায় কাতর হ'য়ে মুষ্টিভিক্ষা চেয়েছিলাম কিন্তু প্রতিদানে তুমি দিলে তণ্ডুল নয় একমুষ্টি পাথর।

কিন্তু তিনি এতে আশ্চর্য হননি। স্পষ্টই সে কথা তিনি জানালেন।

The viceregal reply does not surprise me. But I know that the Salt-tax has to go and many other things wtth it if my letter means what it says.

আরো লিখলেন—

I contemplate a course of action which is clearly bound to involve violation of law and danger to public peace. Inspite of the books containing rules and regulations the only law that the nation knows is the will of the British administrators. The only public peace the nation knows is the peace of the public prison. India is one vast prison house. I repudiate this law and regard it as my sacred duty to break the mournful monotony of compulsory peace that is chocking the heart of the nation for want of free vent.

দেশের মুক্তি-সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে মহাত্মার লবণ আইন ভঙ্গ পরিকল্পনার প্রস্তুতি ও বিজয় ঘোষণার স্বাক্ষর হ'য়ে রইলো বুকভাঙ্গা ঐ কথাগুলো।

কথাই নয় কেবল। কেবল কথার মাল্য রচনাই নয়।

পরাধীন দেশবাসীর মর্মভাঙ্গা বেদনামথিত জমাট দীর্ঘশ্বাস।

তারপর এলো সেই পরম শুভক্ষণটি!

১৯৩০য়ের ১২ই মার্চ।

অন্ধকারের অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে প্রথম ভোরের রাঙা আলো প্রকাশ পেল।

দুয়ার ভেঙ্গে আবির্ভূত হলেন রক্ত জ্যোতির্ময়।

মহাত্মা সবরমতী আশ্রমের দুয়ার খুলে পথের উপরে এসে দাঁড়ালেন: কম্বুকণ্ঠে সত্যাশ্রয়ী সন্ন্যাসী দেশবাসীকে ডাক দিয়ে বললেন: চল। চল। সময় আগত ঐ। সরকার আমাদের প্রতি এতকাল ধরে বহুবিধ অন্যায় অত্যাচার ও জলুম করেছে। লবণ তৈরী করবার অধিকারটুকু হতে পর্যন্ত বঞ্চিত করে আমাদের বঞ্চনাই শুধু করেনি, করেছে অন্যায় জুলুম! প্রকৃতি সমুদ্রের

জলে দিয়ে রেখেছেন প্রচুর লবণ কেন তা থেকেও, প্রকৃতির অবারিত দান থেকেও বঞ্চিত হবো আমরা দেশবাসী কোন অধিকারে, কোন শাসনে!

২১শে মার্চ আহমদাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটীর অধিবেশনে সর্ববাদী সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হলো মহাত্মা কর্তৃক লবন আইন ভঙ্গের পরই সর্বত্র দেশের লবণ প্রস্তুত করবার আয়োজনের যেন কোন ত্রুটি না থাকে।

দীর্ঘ দুইশত মাইল পথ।

অগ্রে অগ্রে চলেছেন এক অর্ধনগ্ন ফকির সন্ন্যাসী, হাতে একটি মোটা লাঠি।

পশ্চাতে চলেছে তার অগণিত জনতা।

চল! চলরে চল!

কিসের ভয়। কিসের শঙ্কা! হবে। হবে জয় নাহি ভয়।

দেশে দেশে নগরে নগরে সাড়া পড়ে গেল।

চারিদিকে লবণ প্রস্তুত করা যাতে সম্ভব হয় তারই আয়োজন চলতে লাগল।

সরকার দেখলো যতই অহিংস অভিযান হোক তথাপি এই আয়োজনের মধ্যেই লুক্কায়িত আছে প্রচণ্ড বহ্নুৎসবের এক অবশ্যম্ভাবী স্ফুলিংগ।

একবার যদি প্রকাশ পায় দিকে দিকে লেলিহশিখায় আগুণ ছড়িয়ে পড়বে।

সরকারের দমননীতির খাকতি ইতিপূর্বেও ছিল না, আরো প্রচণ্ডরূপে আত্মপ্রকাশ করল ঐ সঙ্গে।

মীরাট মামলার অভিযুক্তেরা মাত্র একজন বাদে, দায়রায় সোপর্দ হয়েছে। ২৩শে জানুয়ারী সুভাষচন্দ্র বসু এগার জন সহকর্মী সহ নয় মাস সশ্রম কারদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়েছেন।

নবোদ্যমে সরকারের গ্রেপ্তার পর্ব সুরু হলো ব্যাপক ভাবে সর্বত্র।

কলকাতায় দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন ও এলাহাবাদে পণ্ডিত জহরলাল ধৃত ও দণ্ডিত হলেন।

মহাত্মা সঙ্কল্প করলেন ডাণ্ডিতে লবণ আইন ভঙ্গ করে ধরশনার লবণ গোলা অধিকার করবেন।

ধূর্ত-চক্রী সরকার দেখলে এর পরও গান্ধীজীকে না গ্রেপ্তার করা মানেই বিদ্রোহের আগুনকে আরো ব্যাপক ভাবে ব্যাপ্ত হতে দেবার সুযোগ দেওয়া।

অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করাই স্থির হলো।

এদিকে ৫ই এপ্রিল মহাত্মা তাঁর দলবল সহ সাগরতীরে গিয়ে পৌছালেন।

৬ই এপ্রিল রক্তসূর্য জলশয্যা ছেড়ে তখন উদয়ের পথে।

সেই রক্তমুহূর্তে নবারুণকে সাক্ষী রেখে মহাত্মা সমুদ্রস্নান সমাপ্ত করে সত্যাগ্রহী তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে বেলা ৮-৩০ মিঃ য়ের সময় একটি ক্ষুদ্র স্তূপ হতে একতাল লবণ তুলে দিয়ে লবণ আইন ভঙ্গ অনুষ্ঠান উদযাপন করলেন।

চারিদিকে দেশের সর্বত্র সুরু হয়ে গেল লবণ তৈরী।

সুরু হলো সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ উৎসব দেশে দেশে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে। ক্ষেপা কুকুরের মত সরকারও তার দলবল নিয়ে, ধারালো দাঁত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জন সাধারণের উপরে।

বেপরোয়া ভাবে চলতে লাগল বন্দুকের গুলি ও লাঠির আঘাত অহিংস সংগ্রামীদের উপরে।

সরকারের লৌহ কারাগার ভরে উঠ্‌তে লাগল।

দলে দলে দিতে লাগল প্রাণ বিসর্জন ও নির্বাসন দণ্ড মাথা পেতে নিয়ে করতে লাগল কারাবরণ।

নিষ্ঠুর দানবীয়।পীড়ন চলতে লাগল জনসাধারণের পরে।

আবার মহাত্মা জনসাধারণ, নিরীহ জনসাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর অত্যাচারের প্রতিবাদে আরউনের নিকট পত্র প্রেরণ করলেন।

এখনও বন্ধ কর এ অত্যাচার। মানুষেরও সহের একটা সীমা আছে।

মৃত্যুই শেষ নয়, কারাগারের বীভৎস নির্যাতনই শেষ নয়।

মহাত্মা প্রস্তুত হতে লাগলেন ধরশনার লবণের গোলা দখল করে নেবার জন্য তাঁর দলবল সহ।

সরকার বাহাদুর এবারে আর কালক্ষেপ না করে শৃঙ্খল নিয়ে এগিয়ে গেল মহাত্মাকে গ্রেপ্তার করতে।

৫ই মের মধ্য রাত্রি।

মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করা হলো।

মহাত্মার গ্রেপ্তারের সংবাদ বিদ্যুৎগতিতে আগুনের শিখার মত দেশের সর্বত্র একপ্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল।

সরকারের ঐ গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হলো।

নেতার আসন কি শূন্য থাকে!

মহাত্মার অবর্তমানে বৃদ্ধ দেশনেতা আব্বাস তায়েবজী দৃঢ়পদবিক্ষেপে এগিয়ে এলেন ধরশনার লবণগোলা অধিকার অভিযানের পুরোভাগে।

কিন্তু সরকার তাঁকেও নিষ্কৃতি দিল না—১২ মে তাকেও কারারুদ্ধ করল।

এবার এলেন ভারতের এক মহিলা—সরোজিনী নাইডু!

তাঁরও গতিকে রোধ করা হলো, তিনিও গ্রেপ্তার হলেন।

এলাহাবাদে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশন হলো।

আরো ব্যাপক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনকে গ্রহণ করবার প্রতিজ্ঞা নিলেন সেই অধিবেশনে দেশ নেতারা। বললেন তাঁরা, নির্দেশ দিলেন: বন্ধ কর ভূমি কর দান, চৌকিদারী ট্যাক্স্ প্রদানও কর বন্ধ!

ভঙ্গ কর বন আইন। সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন কর বিদেশী বস্ত্র।

প্রতিবাদ ঐ সঙ্গে জানান হলো সরকারের প্রেস অর্ডিনান্সকে, জরুরী মুদ্রাযন্ত্র আইনকে!

চারিদিকে শুরু হয়ে গেল পিকেটিং।

সরকার চীৎকার করে উঠলো: সাবধান, বন্ধ কর এসব। বেআইনী। এ সব বেআইনী।

ব্যাপক ধরপাকড় চলতে লাগল প্রত্যহ।

এপ্রিল, মে ও জুন মাসে ভারতের বহুস্থানে উত্তেজিত জনতা নিয়ন্ত্রণের হাস্যকর অজুহাতে নিরীহ, নিরস্ত্র, সত্যাগ্রহী সংগ্রামীদের উপরে পুলিশ যথেচ্ছভাবে গোলাগুলি বর্ষণ করলে। পরে ব্যবস্থা পরিষদে সরকারী বিবৃতি থেকে জানা যায়—সরকার বাহাদুর নাকি এক আধবার নয় একান্ত দুঃখের সঙ্গেই বাধ্য হয়ে মূর্খ উত্তেজিত জনতাকে শান্ত করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ২৩ বার গোলাগুলি বর্ষণ করে!

১০৩ জন নিহত ও ৪০০ জন আহত হয়।

মহাত্মার মন্ত্রে—অহিংস মন্ত্রে উজ্জীবতি হ'য়ে পেশোয়ারে দুর্দ্ধর্ষ পাঠানরা পর্যন্ত নিশ্চুপ অহিংস হয়ে দাঁড়িয়েছিল ২৩শে এপ্রিল যেদিন শান্তি স্থাপনের হাস্যকর অজুহাতে সরকার বাহাদুর সেখানে মুহূর্মুহূ রাইফেলের অগ্নুদগার করেছিল।

ত্রিশজন পাঠান নির্ভীক চিত্তে বুক পেতে গুলি নিল।

বুকের রক্তে মহাত্মার অহিংস সংগ্রামকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে গেল।

বোম্বাই প্রদেশে ও শোলপুরে ছয় বার গোলাগুলি বর্ষিত হলো।

ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রদেশের নিরীহ শান্ত নিরপরাধ জনগনের উপরে শান্তির অজুহাতে নিজেদের তাঁবেদার একদল গাড়োয়ালী সৈন্যকে গুলি বর্ষনের হুকুম দেওয়া সত্বেও তারা দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল: নেহি। হাম্‌লোগ্‌ গোলি নেহি চালায় গা।

কোর্ট মার্শাল করে সেই বিদ্রোহী সেনাদের কারাগারে নিক্ষেপ করা হলো অবিলম্বে।

দেশের নাড়ীতে নাড়ীতে তখন মুক্তির নেশা জাগতে সুরু করেছে।

যাক প্রাণ থাক মান!

হান তীর? যত তব তুণে আছে।

ভয় করি না মোরা। ডরাই না তোমার অস্ত্রকে, তোমার কারাগারকে, ভীত নই মোরা মৃত্যু ভয়ে।

গুজরাটের হাজার হাজার অধিবাসী 'করবন্ধ' প্রতিজ্ঞা পালনে আপন আপন বাসভূমি ত্যাগ করে নিকটবর্ত্তী বরোদারাজ্যে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে অশেষ যাতনা ও হাসি মুখে দুঃখ ভোগ করতে লাগল।

মেদিনীপুর কাঁথির লোকেরা চৌকীদারী ট্যাকস্‌ বন্ধ করে অশেষ লাঞ্ছনা হাসিমুখে মাথা পেতে গ্রহণ করলো।

শাসন-সংস্কার কার্য ও দমননীতির অনুসরণ লর্ড মিণ্টোর সময় থেকেই প্রথম সুরু হয়, এবারেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

সর্বত্র মর্মান্তিক উৎপীড়নের দৃশ্যে ইংরাজ সাংবাদিকও বিচলিত হলো।

২১শে মে ২৫,০০০ সত্যাগ্রহী বিভিন্ন দিক থেকে অগ্রসর হলো গান্ধীজীর অসমাপ্ত কার্য ধরশনা লবণ গোলা অধিকার করবার জন্য।

নিরস্ত্র, অহিংস সত্যাগ্রহীর উপরে সরকার দানবীয় উল্লাসে লাঠি চালিয়ে ভারতের মাটিকে লালে লাল করে দিল।

**New Freeman** পত্রিকায় মিঃ ওয়েব মিলার লিখলেন:

**I have never witnessed such harrowing scenes as at Dharsana. Sometimes the scenes were so painful that I had to turn away momentorily. One surprising feature was the**

discipline of the Volenteers. It seemed they were imbubed with Gandhi's non-violence creed.

সারাভারতব্যাপী ঐ বিরাট আন্দোলনে ক্ষিপ্ত সরকার ৫৪,০৪৯ জনকে দণ্ডদান করে।

অহিংস সংগ্রামীদের মুক্তিযজ্ঞ শেষ হতে না হতেই বিপ্লবীদের হাতের মারণঅস্ত্র অগ্নুদগার করে উঠলো।

এত অত্যাচার একি বৃথাই যাবে!

এত রক্তপাত এর কি কোন মূল্যই ধার্য হবে না।

সবাইত' অহিংস নয়। মহাত্মার মত মহাত্মা নয়!

দাঁতের বদলী দাঁত ও চোখের বদলী চোখ নিতে এদেশের ছেলেরা কোনদিন পশ্চাৎপদ হয়নি!

এবারে তাদের পালা!

ঘুমন্ত বিসুভিয়াসের জাগরণের লগ্ন প্রায় উপস্থিত।

আবার সে জাগবে।

চট্টলার পাহাড় জংগল বেষ্টিত তীর্থভূমি : মহামানবের তীর্থভূমি!

কেউ জানতে পারেনি সেদিন পূর্ববাঙলার শান্ত একটি গৃহ মধ্যে অনাগত এক অগ্নিসূর্যের তামস-তপস্যার সমাপ্তির দিন ঘনিয়ে আসছে।

ঘনিয়ে আসছে রুদ্রের আবির্ভাবের অগ্নিক্ষণটি!

সূর্য সেন!

হে সূর্য! বিদ্রোহআকাশের হে রক্ত জ্যোতির্ময়, অগ্নিবরণ প্রকাশ তোমায় নমস্কার।

ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, বাঘাযতীন, গোপীনাথ, ভগৎসিং, রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা, রাজেন্দ্রনাথ এবং আরো ভারতের মৃত্যুঞ্জয়ী বিপ্লবীর দল মৃত্যুর মধ্য দিয়েও যারা নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। যাদের চিতাভস্ম ভারতের আকাশে দিক হতে দিগন্তে উড়ে গিয়েছে বার্তা বহন করে অবিনাশী প্রতিজ্ঞার।

সেই প্রতিজ্ঞার অগ্নুৎসবই ভারতের আকাশকে রক্তরঙিন করে তুললো।

আগুনের ফুলকী লেলিহান শিখায় দেখা দিল চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর, কলিকাতা ও ঢাকায়।

সরকার। সুচতুর সরকার গুম্ভিত হ'য়ে গেল।

বুঝলে তারা সবাই অহিংস নয়।

সবাই নিঃশব্দে মাথা পেতে লাঠির আঘাত নেয় না। বুক পেতে গুলি নেয় না।

ভিন্ন ধাতুতে এরা গড়া! রক্তের বদলে এরা রক্তই চায়! বাঙলার দামাল ছেলে এরা।

বিদ্রোহী ভারতের সে এক নব পর্ব।

নব অধ্যায়।

সে পরম পরিপূর্ণ
প্রভাতের লাগি
হে ভারত! সর্বদুঃখে
রহ তুমি জাগি।

সেদিন কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল:

পৌরুষেরে করেনি শতধা, নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ,
ভারতের সেই স্বর্গে করো জাগরিত॥

মুক্তি যজ্ঞের শত শত অস্ত্রমুখে আগুনের শিখা ঝলকি উঠ্‌লো।

## —তিন—

সেদিন চট্টোলার কয়েকটি বীর সৈনিকের কল্পনার স্বর্গে অদূর ভবিষ্যতের ১৫ই আগষ্টের স্বপ্নই মূর্ত হয়ে উঠেছিল কি না জানি না।

গৃহের নিশ্চিন্ত আরাম বিলাস ও স্বচ্ছন্দ ছেড়ে যে দুরাশায় তারা আগুনের মাঝে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল হয়ত পরবর্তী ১৫ই আগষ্টের মধ্যেই তার সমাপ্তি ছিল না : তারা হয়ত তাদের অগ্রগামীদের মতই সর্বজনের, সর্বঅধিকারে আপন করে তাদের জন্মভূমিকে চেয়েছিল।

চেয়েছিল তাদের কল্পনার সোনার ভারতকে।

১৮৫৭র সশস্ত্র সেপাইদের সমস্ত ভারত ব্যাপী প্রায় অভ্যুত্থানের পরে এবং ১৯২২-২৩ সনের আরো একবার সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টার পর ঠিক ঐ শ্রেণীর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা তেমন আর হয় নি যেমনটি হয়েছিল ১৯৩০ সনে চট্টগ্রামের মাটিতে।

১৯২২ হতে আবার নবোদ্যমে সরকারের নিষ্ঠুর দমননীতি দেশের রক্ষার্থে ও সশস্ত্র সংগ্রামীদের সহ্যের শেষ সীমায় উপস্থিত হতে লাগল।

জর্জরিত নিষ্পেষিত মানবাত্মা মুক্তির বেদনায় মাথা খুঁড়ে মরতে লাগল।

এবং তারাই একদিন আবার ধূলিশয্যা ছেড়ে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে উঠে দাঁড়াল।

১৯২৪—২৮ সনে লর্ড লিটনের কুখ্যাত বেঙ্গল অর্ডিনান্সের বলে বাঙ্গালার বিদ্রোহী সন্তানদের কারাগারের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আটক রাখা হয়েছিল।

সেইখানেই—ইংরাজের সেই কারাগারের মধ্যে বসে বসেই সময় ও সামর্থ্যানুযায়ী একটি বৈপ্লবিক পরিকল্পনার বাস্তবরূপ চিন্তা কয়েকটি দুর্ধর্ষ মরণ-বিপ্লবীর মস্তিষ্কে জেগে ওঠে।

এতকাল ধরে বিপ্লবীদের বহুবার রাজনৈতিক কারণে ব্যক্তিবিশেষের হত্যা ব্যাপারে লিপ্ত হতে হওয়ায় অনেক দুঃসাহসী বিপ্লবীকে প্রাণ দিতে হয়েছে।

এবং ঐ ব্যক্তি বিশেষ প্রায়ই তাদের মধ্যে ভারতীয় অফিসার!

অনন্ত সিংহের উক্তি হয়ত একেবারে মিথ্যা নয়: ভারতবাসী হয়ে উক্ত মনোভাব আমরা বুঝতেই চাইতাম না যে মুষ্টিমেয় একদল ইংরাজ উপরে বসে তাদের স্বার্থে ভারতবাসীকে দিয়ে ভারতবাসীকে শোষণ ও শাসন করে।

হয়ত অনন্ত সিংহের কথাটা একেবারে মিথ্যা না হলেও কিছুটা আংশিকভাবে সত্যি। আংশিকভাবে হয়ত একটা দুরন্ত অভিমানও বিপ্লবীরা মনে মনে পোষণ করেছে ঐ সব ভারতীয় ক্ষমতাপন্ন অফিসারদের প্রতি, যে অভিমান পরে রূপান্তরিত হয়েছে বহুক্ষেত্রে দুরন্ত আক্রোশে এবং গর্জে উঠেছে মারণাস্ত্র যার প্রতিবাদে তাদের দৃঢ় মুষ্টি মধ্যে।

সরকারের সকল প্রকার সতর্কতা সত্বেও আইরিশ প্রজাতন্ত্র বাহিনীর ইষ্টার বিদ্রোহের রক্ত-রাঙা ইতিকথা তরুণ বিপ্লবীদের অন্তরে অন্তরে জাগিয়ে তুলেছে নব উদ্দীপনা।

মুক্তির লাগি দুরন্ত আকাঙ্খা!

১৯২৮ সনে কলিকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনে শ্রীসুভাষের নেতৃত্বে ইউনিফর্ম পরিহিত বিরাট ভলানটিয়ার বাহিনী ও তাদের সুসংবদ্ধ কুচকাওয়াজই হয়ত অদূর ভবিষ্যতে চট্টগ্রামের দুরন্ত বিপ্লবীদের প্রাণে সৈনিক বাহিনী সৃষ্টি করে শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের স্বপ্ন সৃষ্টি করেছিল। স্বপ্ন এনেছিল সশস্ত্র ব্যাপক যুব জাগরণের।

কিন্তু সশস্ত্র জাগরণ কেমন করে সম্ভব হবে যদি না হাতে থাকে প্রচুর অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র।

অর্থ চাই বটে তবে পূর্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে এবারে চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা সতর্ক হয়ে গেল : চুরি বা ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ নয়।

স্থির হলো দলের প্রত্যেকেই আপন আপন আত্মীয়স্বজনদের নিকট হ'তে যথাসাধ্য অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে।

এবং সেই সঙ্গে সুরু হবে বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী ও বোমা পিস্তল, রিভলভার গুলি প্রভৃতি সংগ্রহ।

সুরু হতেই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতার দায়িত্ব অবিসংবাদী ভাবে এসে পড়েছিল মাষ্টারদা, ইতিহাস বিশ্রুত বিপ্লবী নেতা সূর্য সেনের স্কন্ধে।

সূর্যের মত প্রখর তেজ নিয়ে জন্মেছিলেন সূর্য সেন, মাথায় নিয়ে যিশুর মতই কণ্টক মুকুট চট্টগ্রামের নোয়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী শ্রীযুক্ত রাজমণি সেনের গৃহে।

বহরমপুরে কলেজে বি. এ পড়বার সময়ই তার মন বিপ্লবের পথে অগ্রসর হয় তদানিন্তন বিপ্লবী সঙ্ঘ যুগান্তর দলের সংস্পর্শে এসে।

কেউ জানল না কি প্রচণ্ড অগ্নির সম্ভাবনা বক্ষের মধ্যে সংগোপনে ধারণ করে সূর্য সেন চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে, ন্যাশন্যাল হাইস্কুলে গণিতের শিক্ষকতার ভার নিয়ে সাধারণ—অতি সাধারণ একজন স্কুল মাষ্টারের পরিচয়ে অদূর ভবিষ্যতে এক রক্ত সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসলেন।

অতি সাধারণ স্বল্প ও খর্বাকৃতি ছোটখাটো চেহারা—মাথার সম্মুখে অনেকটা জুড়ে বিস্তীর্ণ একটি টাক।

সাধারণের আকৃতিতে কতই না অসাধারণ ছিলে হে তুমি সূর্য সেন।

অসহযোগ আন্দোলনে সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, নির্মল সেন ও লোকনাথ বল প্রভৃতি চট্টগ্রামের দেশ কর্মীরা, যুব নেতারা, দীর্ঘদিন ধরে রাজবন্দী থাকবার পর মুক্তি পাবার অব্যহিবত পরেই ১৯২৩ সনে আসাম বেঙ্গল কম্পানীর ১৭০০০৲ টাকা ছিনিয়ে নেয়।

কিন্তু তারা টাকাটা নিয়ে পালাতে পারল না।

অচিরেই পুলিশ তাদের অনুসরণ করে এবং চট্টগ্রামের নাগারখানা পাহাড়ে দুই দলে গোলাগুলির বিনিময়ে একটা প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়ে গেল।

প্রবল প্রতাপান্বিত শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামে বিদ্রোহী যুবকদের সেই প্রথম সংগ্রাম।

একে একে সকলেই সরকারের হাতে বন্দী হলো, বিচারে সকলেই দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনের কূট সওয়ালে মুক্তি পেয়েও সরকারের অর্ডিনান্সের জোরে রাজবন্দী হয়ে কারাগারে প্রেরিত হলো।

১৯২৮ সনে সকলে মুক্তি পেয়ে আবার চট্টগ্রামে ফিরে এলো।

নতুন করে তখন থেকে আবার সূর্য সেনের নেতৃত্বে নব পরিকল্পনায় সশস্ত্র জাগরণের প্রস্তুতি চলতে লাগল গোপনে গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে।

কিছুদিন পরে নিরঞ্জন সেন, প্রতুল ভট্টাচার্য ও বিনয় রায় চট্টগ্রামে এসে সেখানকার বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে সর্বসম্মত ভাবে একটা ব্যাপক কার্যপন্থা নির্দ্ধারণ করে।

ব্যাপক, সংঘবদ্ধ সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

বলাই বাহুল্য ১৯২৯ সালে পূর্ব বর্ণিত মেছুয়াবাজারের বাড়ীকে কেন্দ্র করে নিরঞ্জন সেন, সতীশ পাকড়াশী প্রভৃতি চরম পন্থী নেতাদের গ্রেপ্তারে বিপ্লবীদের পূর্ব পরিকল্পনা সফল হতে পারে নি।

ঐ সঙ্গে চট্টগ্রামে বোমা তৈয়ারী করবার সময় কয়েকটি দুর্ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল।

অগত্যা চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা আর বৃথা কালক্ষয় না করে তাদের যতটুকু শক্তি সংগঠিত হয়েছে তারই সাহায্যে শ্বেতাঙ্গ সরকারকে আঘাত হেনে অন্ততপক্ষে চট্টগ্রামে স্থানীয় ভিত্তিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপনের প্রয়াসী হলো।

সূর্য সেনের নেতৃত্বে দলের অনান্য শক্তিশালী কর্মীদের নিয়ে গোপনে বৈঠক বসল: এবং স্থিরীকৃত হলো সর্বসম্মতিক্রমে, বিদ্যুৎগতিতে আক্রমণ চালিয়ে চট্টগ্রাম সহরের ইংরাজের অস্ত্রগার ও অন্যান্য সরকারী কেন্দ্রগুলোকে দখল করে নিতে হবে। অন্তত চট্টগ্রামের বুকে প্রথম স্বাধীন অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপন করতে হবে।

তারা জানত প্রবল প্রতাপান্বিত অস্ত্রবলে শ্বেতাঙ্গ শক্তির সাথে সশস্ত্র ঐ সম্মুখ অভিযানের ফলাফলটা কি হবে: মৃত্যু! ফাঁসী না হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

কিন্তু সেও ত' ব্যর্থ হবে না! মিথ্যা হবে না।

চরম অভিযানের মাত্র দিন পনের আগে অনন্ত সিংহের সঙ্গে মাষ্টারদার অভিযান সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল।

অনন্ত সিংহ প্রশ্ন করে : সবইত ঠিক হয়ে গেল মাষ্টার দা! আপনার কি রকম মনে হচ্ছে?

মাষ্টার দা জবাব দিলেন : এত শীগগিরী সব শেষ হয়ে যাবে ভাবতে সত্যি যেন কেমন লাগছে···তারপর একটু থেমে আবার বললেন : আমি ঠিক আমার অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করে বলতে পারছি না। চিরকালের জন্য আমরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো, আমাদের পরে ভবিষ্যতে দেশের কি হবে তা দেখবার বা জানবার কোন উপায় আমাদের থাকবে না।···হ্যাঁ জীবন মধুর সন্দেহ নেই কিন্তু দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া আরো মধুর।

তুমি থাকবে না এমন কথা কেন তোমার মনে হয়েছিল মাষ্টার দা!

তোমাকেত' আমরা হারাই নি।

সরকারের ফাঁসীর রজ্জুইত' তোমার শেষ নয়।

বাসাংসি জীর্ণানী!

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে তুমি যে নব রূপে আমাদের কোটি কোটি জনগণের প্রাণের আসনে এসে বসেছো!

তোমার শেষ ত' নেই!

ভারতের রক্ত ইতিহাসের পাতায় পাতায় হে শহীদ! হে বরেণ্য তুমি যে স্বর্ণাক্ষরে দেদীপ্যমান। স্মৃতির মণিকোঠোয় তুমি যে অক্ষয় অব্যয় চির-অনির্বান! চির ভাস্বর।

ভারতীয় রিপাবলিক্যান ফৌজের চরম অভিযানের দিন স্থিরীকৃত হলো ১৯৩০য়ের ১৮ই এপ্রিল রাত্রি দশটায়।

ঐ দিনটি ছিল শ্বেতাঙ্গদের গুড্‌ ফ্রাইডে।

তাছাড়া একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যও ছিল ঐ শুভ দিনটির সঙ্গে জড়িয়ে, আইরিশ প্রজাতন্ত্রবাহিনীর ইষ্টার বিদ্রোহের রক্ত রাঙা স্মৃতি বিপ্লবীদের তরুণ প্রাণে জাগিয়ে তুলেছিল অভূতপূর্ব একটা উন্মাদনা।

বিলি হলো ভারতীয় রিপাবলিক্যান ফৌজের ইস্তাহার চট্টগ্রামের যুবা কিশোরদের হাতে হাতে।

**The Indian Republican Army, Chittagong Branch, hereby solemly declares its intention to stand against the age-long**

repression by the British people and their Government which they have followed as a cruel policy to keep the three hundred million Indian people subjugated for unlimited time and to eradicate the slightest trace of nationalism and national originality amongst them. The right of ownership of India and the Control of her destinies belongs to the people of India only and the long usurpation of the right by a foreign people and their Government has not extinguished that right nor it ever can. The Indian Republican Army proclaims to-day its intention of asserting this right in arms in the face of world and thus put into actual practice the idea of Indian Independence declared by the Indian National Congress ; and heredy pledges the life of everyone of its members to the course of Freedom, to the welfare and exaltation of the Motherland amongst all other nations !

এই সঙ্গে আরো স্মরণ কর বন্ধু! কত বড় অমানুষিক নির্যাতন ও অপমান ভারতের মাটিতে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ রাজত্বে ও তাদের গর্ভমেণ্টের হাতে ভারতবাসী আমাদের সইতে হয়েছে। নির্বিচারে এরা আমাদের মা ভগ্নীকে জালিয়ানওয়ালাবাগে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করেছে, ফাঁসীর রজ্জুতে কতশত দেশপ্রেমিককে আমাদের ওরা নির্বিকার চিত্তে হত্যা করেছে, বুটজুতোর নীচে কত শিশুকে মাড়িয়ে পিষে হত্যা করেছে। মনে কর। ভুল না। স্মরণ কর একবার কি ভাবে ওরা আমাদের শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস করেছে ছল ও চাতুরী দিয়ে। আজ আমাদের সেই যুগব্যপী অত্যাচারের রক্ত প্রতিশোধ নেবার দিন আগত! মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত।

In this supreme hour the Chittagong people must by their valour and patriotism and by the readiness of her Children to sacrifice themselves for the Common good, prove themselves worthy of the august destiny to which they are called—

By order
President in Council

**Indian Republican Army**
**Chittagong Branch.**

চলতে লাগলো সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি।

বিপ্লবী বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈনিকের জন্য খাকি সামরিক পোষাক তৈরী করা হলো।

বিভিন্ন স্কোয়ার্ডে বিভক্ত করে দেওয়া হলো নেতার আদেশে সমগ্র সৈন্য-বাহিনীকে। মোট ছয়টি স্কোয়াড গঠন করা হলো মোট ৬৫ জন সৈনিককে নিয়ে। শতকরা ৭৫ ভাগ তাদের মধ্যে ১৫ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে।

সর্বাধিনায়ক সূর্যসেন।

প্রথম স্কোয়াডটি গঠিত হলো ৩২ জন সৈনিককে নিয়ে—পুলিশ লাইন আক্রমণের সকল দায়িত্ব তাদের পরে দেওয়া হলো—নেতৃত্বের ভার পড়ল অনন্তলাল সিংহ ও গণেশ ঘোষের উপরে।

দ্বিতীয় স্কোয়াড গঠিত হলো ছয়জনকে নিয়ে, এদের কর্মসূচী হলো চট্টগ্রামের অকসিলিয়ারী অস্ত্রাগারটি আক্রমণ ও দখল করা!

তৃতীয় স্কোয়াডে—৬ জন সৈনিক—তাদের স্কন্ধে ন্যস্ত হলো টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসটি ধ্বংস করা।

চতুর্থ স্কোয়াডে ছয় জন সৈনিকের উপরে অর্পিত হলো ইউরোপীয়ান ক্লাবটির আক্রমণের সকল দায়িত্ব। বাকী সৈনিকদের নিয়ে পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্কোয়াড গঠিত হলো। এদের দায়িত্ব ছিল রেল ও টেলিগ্রাফ যোগাযোগ ধ্বংস করে বহির্জগত হতে চট্টগ্রামকে ছিন্ন করা।

পূর্বোক্ত পরিকল্পনা মত ১৮ই এপ্রিল রাত্রি দশটায় চট্টগ্রামের দুঃসাহসী মরণপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ৬৫ জন যুবা ও কিশোর ঐতিহাসিক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিযানে অবতীর্ণ হলো!

তাদের সম্বল—

বন্দুকের বারুদে ঠাসা কতকগুলো বোমা।

কয়েকটি লোহার যন্ত্রপাতি।

আর! আর বুক ভরা তাদের দুর্জয় দুর্মদ সাহস!

আর সমস্ত চেতনাকে প্রবুদ্ধ করে জাগ্রত ছিল সেদিন ঐ দুঃসাহসিকদের নিজস্ব সত্য নীতি !

শ্বেতাঙ্গের নির্মম নিষ্ঠুর আক্রমণে তাদের মধ্যে কতজনা প্রাণ দিয়েছে তারপর, গুলির মুখে ও ফাঁসীর রজ্জুতে।

কিন্তু সেটাইত' তাদের শেষ কথা ছিল না !

একটা নীতির—একটা আদর্শের যূপকাষ্ঠেই তাদের জীবনকে তারা বলি দিয়ে গিয়েছে-এর চাইতে বড় সান্ত্বনা আর তাদের কি থাকতে পারে।

তাদের অমর অবিনাশী আত্মা সহস্রের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে তাদের আরব্ধ ব্রতকে একদিন না একদিন হয়ত সম্পূর্ণ করে তুলবে এর চাইতে বড় সান্ত্বনা মানুষ হিসাবে আর তাদের কি থাকতে পারে সেদিন।

আমার বাণী পর্বতে প্রান্তরে, স্বদেশের চতুঃসীমা পেরিয়ে দূর দেশ দেশান্তরে ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হবে এর চাইতে বড় পুরস্কার মানবের আর কি থাকতে পারে।

আদর্শের বেদীমূলে অকুতোভয়ে আত্মাঞ্জলি অপেক্ষা জীবনের বৃহত্তর সার্থকতা আর কিই বা থাকতে পারে।

জীবন দিয়ে জীবনের প্রাপ্তি, মূল্য নির্দ্ধারণ !

১৮ই এপ্রিল !

পূর্বাহ্নেই লোকনাথ বল ট্যাক্সী ষ্ট্যাণ্ডে গিয়ে একটি ট্যাক্সী চালককে ট্যাক্সীর জন্য বলে এসেছিল।

সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া ধরিত্রীর উপরে ঘন হয়ে এসেছে।

শহরে সর্বত্র জীবন প্রবাহের মধ্যে কোন উদ্বেগ কোন চাঞ্চল্য নেই, মাত্র আর ঘণ্টা কয়েক বাদে যে ভয়াবহ অগ্নি স্ফুলিংগ চট্টলার শান্ত আকাশকে রক্তাক্ত করে তুলবে একথা স্বপ্নেও তখনও কেউ ভাবতে পারে নি !

নিঃশব্দে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এগিয়ে আসছে।

এগিয়ে আসছে সশস্ত্র অভিযানের বহু আকাঙ্ক্ষিত সেই ব্রাহ্ম মুহূর্তটি !

নির্মল সেন, রজত সেন, মনোরঞ্জন সেন, জীবন ঘোষাল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী ও লোকনাথ বল মিলিটারী ইউনিফর্ম পরে অস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে ট্যাক্সীর অপেক্ষায় দাড়িয়ে ঘন ঘন পথের দিকে তাকাচ্ছে অধীর ব্যাকুল আগ্রহে।

রাত্রি আটটার সময় ট্যাক্সী এলো, মুহূর্তে সকলে ট্যাক্সীতে উঠে বসে বললে ! চালাও পাহাড়তলী !

চট্টগ্রাম শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত পাহাড়তলী ষ্টেশনটি।

ষ্টেশনের কাছাকাছি আসতেই লোকনাথ বলের নির্দেশে ট্যাক্সী থামল; তারপরের ব্যাপারটুক সংক্ষিপ্ত!

অস্ত্রমুখে ড্রাইভারকে ট্যাক্সী থেকে নামিয়ে—এবং ক্লোরফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে পথের মধ্যে ফেলে রেখে বিপ্লবীর দল ট্যাক্সী নিয়ে সোজা একেবারে রেলওয়ে অস্ত্রাগারের Side gateয়ে গিয়ে উপস্থিত হলো।

গাড়ীর মধ্যে ছিল ছয় জন। বাকী ছয় জন সঙ্গী অস্ত্রাগারের গেটের আশেপাশেই অপেক্ষা করছিল।

তাদেরই একজন গেট ঠেলে খুলে দিল—গাড়ী ভিতরে প্রবেশ করল।

Halt! who comes there?

প্রহরীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

প্রত্যুত্তর এলো: Friends!

গাড়ী এসে সোজা অস্ত্রাগারের সিঁড়ির সামনে দাঁড়াল। লোকনাথ বল গাড়ী থেকে নেমে সোজা অস্ত্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠ্‌লো।

'সেণ্ট্রী ইধার আও!—'

সেণ্ট্রী এগিয়ে এসে মিলিটারী কায়দায় স্যালুট জানাতেই মুহূর্তে লোকনাথ বাঁ হাতে সেণ্ট্রির হাত চেপে ধরে দক্ষিণ হাতে উঁচিয়ে ধরল লোডেড্ পিস্তল: শোন! আমরা স্বদেশী! আমরা অস্ত্রাগার দখল করতে এসেছি। তুমি পালিয়ে যাও।

মূর্খ প্রহরী লোকনাথের হাত থেকে তার রাইফেলটা ছিনিয়ে নিয়ে প্রতিরোধের চেষ্টা করতেই আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলে।

প্রহরী ধরাশায়ী হলো।

আরো তিনজন রক্ষী এগিয়ে আসবার চেষ্টা করে—তাদেরও লক্ষ্য করে আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলে।

অস্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরাজ কর্মচারী সার্জেণ্ট ফ্যারেল গুলির শব্দ শুনে বাইরে এসে ব্যাপার দেখেই তক্ষুণি ভিতরে ছুটে গিয়ে লোডেড্ রিভলভার হাতে বের হয়ে এল কিন্তু বিপ্লবীদের গুলিতে তাঁকে ঐখানেই মাটি নিতে হলো চেঁচাতে চেঁচাতে: That's cruel; that's cruel!

একজন জবাব দিল: Not even one hundredth part of cruelty with which you Britisher have made us suffer.

শেষ পর্যন্ত দু' একটা ছোট খাটো বাধা বিপত্তি কাটিয়ে বিপ্লবী স্কোয়াড্‌টি লোহার হাতুড়ীর ঘা মেরে ও সঙ্গের গাড়ীটার সাহায্যে অস্ত্রাগারের দরজা খুলে ম্যাগাজিন, রাইফেল, লুইসগান ও রিভলভার যা কিছু নাগালের মধ্যে পাওয়া গেল গুছিয়ে নিয়ে ; পেট্রোলের সাহায্যে অস্ত্রাগার ভবনে আগুন লাগিয়ে দিয়ে সকলে চললো পুলিশ লাইনের দিকে।

এ দিকে যথা নির্দিষ্ট সময়ে রাত ১০—১৫ মিঃ অনন্তলাল সিংহ, গণেশ প্রভৃতি একটি স্কোয়াড্‌ পুলিশ লাইন অস্ত্রাগার প্রাঙ্গণে এসে গাড়ী নিয়ে প্রবেশ করল।

এবং এখানেও যথারীতি প্রশ্ন এলো : Halt, who comes there !

'Friends !—' এবারেও সেই জবাব।

গাড়ী থামবার সঙ্গে সঙ্গে সকলের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র প্রহরীদের দিকে লক্ষ্য করে অগ্ন্যুদগার শুরু করে দিল।

সম্মুখের সেপাইয়ের নিষ্প্রাণ দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

বাকী সব যে যেদিক পারল চম্পট দিল। চাচা আপন বাঁচা।

ভাঙ্‌! ভাঙ্‌—ভাঙরে কপাট !

ব্রিটিশের অস্ত্রাগারের সুরক্ষিত লৌহকবাট হাতুড়ীর ঘায় ভেঙ্গে পড়ল।

অস্ত্র-শস্ত্র, অনেকগুলো মাস্কেট পাওয়া গেল অস্ত্রাগারের মধ্যে।

মাস্কেট, রিভলভার ও কার্তুজ সকলকে ভাগ করে দেওয়া হলো।

গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ সকলকে মাস্কেট কেমন করে ব্যবহার করতে হয় চটপট্‌ শিখিয়ে দিল।

ব্রিটিশ প্রহরী বিতাড়িত, 'ভারতীয় রিপাব্‌লিক্যান ফৌজে'র প্রহরী চারপাশে মোতায়েন করা হলো।

হিন্দুস্থান হামারা ! স্বদেশ আমার জননী আমার।

যতই স্বল্প সময়ের জন্য হোক। যতই ক্ষণস্থায়ী হোক—১৮৫৭র সেই ইতিহাস বিশ্রুত ভারতের কয়েকটি বিখ্যাত স্থানে স্বাধীনতা ঘোষণা করার মত, সেদিন রাত্রেও চট্টলার মাটিতে আবার সুদীর্ঘ তিয়াত্তর বৎসর পরে ১৯৩০—১৮ই এপ্রিল বিপ্লবীদের মরণ পণে দ্বিতীয়বার স্বাধীন, অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের ঐতিহাসিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হলো।

ভোলেনি ভারত ভোলেনি সে কথা আজও !

সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক সকলের প্রিয় মাষ্টারদাকে সেরাত্রের সেই অস্থায়ী গভর্ণমেণ্টের সর্বাধিনায়ক—প্রেসিডেণ্ট্ বলে সম্মান জানান হলো।
সাক্ষী ছিল সেদিন নিশীথ রাতের অগণিত তারার দল মাথার উপরে কালো আকাশ পটে, আর প্রবাহমান কাল।

এবং পায়ের নীচে শৃংখলিতা জননী জন্মভূমি!

মিলিত কণ্ঠে প্রণতি জানাল সবাই : বন্দেমাতরম্।

Long live Revolution!

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক!

স্বাধীন ভারত কি জয়।

মধ্যে মধ্যে নিশীথের কালো আকাশের বুকখানাকে আলোকিত করে ওদের হাতের রাইফেলের গুলি আনন্দ সঙ্কেত জানাচ্ছে : আমরা স্বাধীন, আমরা মুক্ত!

সেদিন চট্টগ্রামের অধিবাসীরা কি ঘুমাতে পেরেছিল।

নিশ্চিন্ত শয্যায় ঘুম কি তাদের ভেঙে যায়নি! পৌছায় নি কি তাদের কানে সেই বিপ্লবীদের ক্ষণ স্বাধীনতার বিজয় উল্লাস!

উদ্বেলিত হয় নি কি হৃদয় তাদের! রোমাঞ্চ কি জাগে নি প্রাণে প্রাণে!

যথা নির্দিষ্ট সময়ে যে স্কোয়াডের উপরে টেলিফোন টেলিগ্রাম অফিসটি নষ্ট করার গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল তারাও—অফিস আক্রমণ করে যন্ত্রপাতি সব নষ্ট করে পুলিশ লাইনের দিকে চলে গেল।

সেখানে এসে ওরা যখন পৌছাল আকাশ বাতাস তখন মথিত হচ্ছে মিলিত কণ্ঠে :

Long live Revolution!

বন্দেমাতরম্!

ভারত মাতা কি জয়!

রাত্রি প্রায় দু'টা।

ঐতিহাসিক রাত্রির মধ্যপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়।

এমন সময় সোঁ সাট্ সাট্ শব্দে উপর্যুপরি কয়েকটা বুলেট এসে পুলিশ লাইনের দেওয়ালে লাগতে শুরু করল।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠ্লো বিপ্লবীর দল। কোথা হ'তে গুলি আসছে।

গুলি তখনও আসছে : সোঁ ! সাট্‌। সাট্‌ !—

সর্বনাশ। এযে মেসিন গানের গুলি।

কমাণ্ডার অনন্ত লালের নির্দেশ শোনা গেল : Lie down !…Quick ! Lie down !

বুঝতে পেরেছে ওরা তখন অদূরবর্তী জলকলের ছাদের উপর থেকে মেসিন-গানের গুলি আসছে অবিশ্রাম।

পুলিশ লাইনের কাছেই ঐ জল-কল—চট্টগ্রাম সহরে প্রবেশের প্রধান পথটির পাশেই অবস্থিত। ডবল মুরিং নামক স্থানে ছোট একটি যে অস্ত্রাগার ছিল বিপ্লবীর দল অপ্রয়োজন মনে করায় সেটা দখল করে নি। এবং তাদের সেই ছোট্ট প্রমাদের সুযোগ নিয়েই শত্রুপক্ষ সেখানকার মেসিনগানটি নিয়ে প্রতি আক্রমণ সুরু করেছে।

কমাণ্ডারের নির্দেশ শোনা গেল : Fire !

এপক্ষও চালাল গুলি।

দুম্‌ ! দুম্‌ !

সোঁ। সাট্‌ সাট্‌ !

নেতার দল দেখলে এভাবে ওদের সঙ্গে সম্মুখ সংগ্রাম চালান নির্বুদ্ধিতার কাজ অতএব স্থিরীকৃত হলো গেরিলা যুদ্ধের নীতি অবলম্বন করাই শ্রেয় আর শক্তি ক্ষয় বৃথা না করে।

স্থানত্যাগ করবার পূর্বে পুলিশ লাইনে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দিতে গিয়ে হিমাংশু সেন গুরুতর ভাবে পুড়ে গেল।

অনন্ত সিং, গণেশ ঘোষ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্ত আহত, অগ্নিদগ্ধ, যন্ত্রণাকাতর হিমাংশু সেনকে নিয়ে আনন্দদের বাসায় রেখে আসতে গেল।

বাকি সকলে অপেক্ষা করতে লাগল ঐ জায়গায়।

আনন্দ গুপ্তর ওখানে হিমাংশুকে রেখে ফিরে এসে পূর্বের দলটিকে কিন্তু ওরা ঐ জায়গায় দেখতে পেল না।

দু'টি দল বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গেল।

২০শে এপ্রিল মৃত অবস্থায় হাসপাতালে চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের বীর সৈনিক অগ্নিদগ্ধ হিমাংশু সেন কালের কপোল তলে প্রথম এঁকে দিলেন যেন

রক্ত সিন্দুরের টিপ দিয়ে, রক্ত লেখায় দলের মধ্যে আপন প্রাণত্যাগের মধ্য দিয়ে প্রথম শহীদ লিপিখানি

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

চুপ্! ধীরে। আস্তে চল।

এসো এগিয়ে কে যেতে চাও নিঃশব্দ পায়ে।

চেয়ে দেখো সম্মুখে তোমার ক্ষুদ্র জংগলাকীর্ণ ঐ যে শ্যামল পাহাড়টি, চট্টগ্রাম হ'তে মাত্র পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

হাঁ! ঐ! ঐ—পুণ্যতীর্থে এইবারে আমরা চলেছি।

চক্ষু অশ্রু সম্বরণ কর!

হৃদয় প্রণাম জানাও! আপনাকে লুণ্ঠিত করে দাও শ্যামল ঐ তীর্থের ধূলিতে, আপন বক্ষে মেখে নাও ঐ তীর্থরেণু।

কিন্তু দেখো যেন কারো ওদের ঘুম না ভাঙ্গে!

ওদের ঘুম ভাঙ্গিয়ো না!

কারা ঘুমিয়ে আছে ওখানে?

হরিগোপাল (টেগ্রা), নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা সেন, প্রভাস বল, শশাঙ্ক দত্ত, জিতেন্দ্র দাস, মধুসূদন দত্ত, পুলিন ঘোষ, নির্মল লালা ও মতিলাল কানুনগো!

বাংলা তথা ভারতের একাদশ বীর সন্তান। বিপ্লবী বাংলার উদ্দীপ্ত যৌবনের চিরস্মরণীয় চিরঞ্জীবী একাদশটি মৃত্যুহীন প্রাণ!

ভাঙ্গিয়ো না ওদের ঘুম।

পরবর্তীকালে শ্বেতাঙ্গ আদালতে যখন বীর সৈনিকদের বিচার প্রহসন চলেছে একদিন শ্বেতাঙ্গ সরকারের উকিল রায়বাহাদুর নগেন বাঁড়ুয্যে মশাই ওদের দিকে তাকিয়ে সশ্রদ্ধ প্রশংসায় বলেছিলেন: আমি চট্টগ্রামের তীর্থস্থান দেখতে গিয়েছিলাম।

ওদের মধ্যে কে একজন বলে উঠ্লো: আপনি সীতাকুণ্ড তীর্থে গিয়েছিলেন বুঝি?

নগেন বাঁড়ুয্যে প্রত্যুত্তর দিলেন: চট্টগ্রামের তীর্থস্থান আজ আর সীতাকুণ্ড ত' নয়।

চট্টগ্রামের তীর্থস্থান জালালাবাদ!!

জালালাবাদ!

হাঁ আমরা এবারে সেই জালালাবাদের সামনেই এসে দাঁড়িয়েছি।

স্মৃতির যবনিকাখানি উত্তোলিত হচ্ছে ধীরে, অতি ধীরে!—

১৯শে এপ্রিলের চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অস্পষ্ট আলো-আঁধারীতে বিদ্রোহী যুবক ও কিশোরের দল পুলিশ লাইন ত্যাগ করে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

২০শে এপ্রিলের দিন ও রাত্রি পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্যেই ওদের কেটে গেল।

পরিশ্রান্ত ক্ষুধার্ত—তৃষ্ণার্ত।

চারিদিকে পাহাড়ের বন জঙ্গল, মাথার উপরে নিরালম্ব খোলা আকাশ।

অনেক অনুসন্ধান করে অল্পদূরবর্তী একটা ক্ষেত থেকে কয়েকটি তরমুজ সংগ্রহ করে এনে তাই সকলের মধ্যে ভাগ করে নিয়ে কিঞ্চিৎ ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রশমনের চেষ্টা হলো। দলের মধ্যে একজন ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝর্ণার সন্ধান পেয়ে সকলকে জানাল, মধ্যে মধ্যে সেখানে গিয়েও সকলে তৃষ্ণা নিবারণ করতে লাগল।

৫০শ জন বিদ্রোহীর চক্ষের সামনে ক্ষুধা তৃষ্ণা ও ক্লান্তি ভয়াবহ হ'য়ে প্রকাশ পেতে লাগল।

অবশেষে গভীর রাত্রে দলের সকলের কাছে সামান্য যার যা অর্থ ছিল সংগ্রহ করে মোট হলো ১৭৲টি টাকা।

সেই টাকা নিয়ে পাঁচ জনে গিয়ে পাহাড়ের অনতিদূরে একটি দোকান ছিল সেই দোকান হ'তে একঝুড়ি রুটি ও বিস্কুট কিনে নিয়ে এলো।

পুলিশের লোকেরা সর্বত্র তখন চট্টগ্রামের অন্ত্য প্রত্যন্তে ছড়িয়ে পড়েছে ওদের সন্ধানে। ঘুরছে হন্যে কুকুরের মত।

এদিকে উড়ো উড়ো কয়েকটি সংবাদ পেয়ে পুলিশের কর্তৃপক্ষ প্রস্তুত হতে থাকে আক্রমণ চালাবার জন্য ঐ পাহাড়ের দিকে।

২২শে এপ্রিল বিদ্রোহীরা সারাটা দ্বিপ্রহর মার্চ করে এসে পৌঁছায় জালালাবাদ পাহাড়ে।

ক্লান্ত বিদ্রোহীর দল সবে মাত্র জালালাবাদ পাহাড়ের একটি শ্যামল নিরালা স্থান বেছে নিয়ে শ্যামল শয্যার উপরে গা এলিয়ে দিয়েছে বিশ্রামের আশায়—দলের দূর প্রহরারত সতর্ক রক্ষীর সতর্কবাণী শোনা গেল : দূরে মিলিটারী ফোর্স দেখা যাচ্ছে।

আরো একজন জানাল : ওরা এদিকেই এগিয়ে আসছে—এই পাহাড়ের দিকেই।

যে যেখানে ছিল মুহূর্তে সবাই গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

**Attention !**

যে যার আর্মস্ নিয়ে দাঁড়াল প্রস্তুত হয়ে। **Shoulder to Shoulder**

তারপর !

ইঙ্গিতে পলকে মাত্র সৈনিক সকল<br>
বন্দুক সদর্পভরে,<br>
তুলে নিল অংসোপরে<br>
সঙ্গিনে কণ্টকাকীর্ণ হ'ল রণস্থল।—

শত্রুর বিরাট বাহিনী যখনই নিম্নভূমিতে ওদের রাইফেলের গুলির পাল্লার মধ্যে এসে পড়ল লোকনাথ বলের আদেশ ধ্বনিত হলো : **Fire !**

একসঙ্গে বিপ্লবীদের পঞ্চাশটি আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলে।

সঙ্গে সঙ্গে মিলিত কণ্ঠে শোনা গেল : বন্দেমাতরম্ ! বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক ! **Long live Revolution !**

শত্রুপক্ষের হাজার আগ্নেয়াস্ত্র এক সঙ্গে ভীম গর্জন করে উঠ্‌লো : দুম্-দুম্ ! গুড়ুম !—গুড়ুম !...

একদিকে মুষ্টিমেয় স্বাধীনতাকামী পঞ্চাশটি মাত্র যুবা ও কিশোর অন্যদিকে সরকারের অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত বিরাট সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী !

সেদিনকার হারজিতের মীমাংসায় পৌঁছান ত' এমন কোন কষ্ট সাধ্য ব্যাপার ছিল না। একদিকে কয়েকটি মৃত্যুপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, অস্ত্রশিক্ষায় অপটু অসম্পূর্ণ কিশোর ও যুবা অন্যদিকে সরকারের বিরাট সুশিক্ষিত প্রচুর অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্য বাহিনী।

তথাপি !

তথাপি ১৯৩০ য়ের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রামের জালালাবাদের শ্যামল শিখরে তরুণ মুষ্টিমেয় বিপ্লবীদের অগ্নিনালিকায় তাদের শোণিত তরঙ্গে স্বাধীনতার যে অমর দুর্বার স্পৃহা মুখরিত, উদ্বেলিত হ'য়ে উঠেছিল শৃঙ্খলিতা স্বদেশ জননীর মুক্তির লাগি সেই পুঞ্জীভূত অন্তরবেদনা, সেই আত্মদান জালালাবাদের প্রতি ধূলি কণায় কণায় চিরদিন রক্তের অক্ষরেই লেখা থাকবে।

ভারতবাসী ভুলবে না কোন দিন সেই চট্টগ্রামের হলদিঘাটকে।

চিরদিন অবিমিশ্র গৌরবে ও শ্রদ্ধার বার বার প্রণতি জানাবে।

উভয়পক্ষ থেকেই অবিশ্রাম গোলাগুলি বর্ষিত হচ্ছে।

দেখতে দেখতে বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজন শত্রুপক্ষের গুলিতে আহত হলো এবং সহসা একটি গুলি এসে টেগ্‌রার পেটে প্রবেশ করল।

চতুর্দশবর্ষীয় নবীন কিশোর। নির্ভীক সৈনিক রক্তাক্ত আহত হ'য়ে ভূশয্যা নিল: সোনা ভাই আমি চললাম—তোমরা চালিয়ে যাও! বন্দেমাতরম্!

ঋষি বঙ্কিম!

তোমার ঐ মন্ত্র এমনি করে কয়জনা তার শেষ মুহূর্তেও কণ্ঠে নিয়ে গিয়েছে।

ধন্য তুমি! ধন্য তোমার মন্ত্র!

ধন্য টেগরা! ধন্য তোমার উচ্চারিত বন্দেমাতরম্!

এরপর একে একে বাংলার সেই একাদশ শহীদ দিয়ে গেল প্রাণ! নরেশ, বিধু, ত্রিপুরা, প্রভাস, শশাঙ্ক, জিতেন, মধু, পুলিন, নির্মল—মতিলাল।

দিনমনি অস্তগমনোন্মুখ!

কোথা যাও, ফিরে যাও সহস্র কিরণ!
বারেক ফিরিয়া চাও, ওহে দিনমণি!
তুমি অস্তাচলে দেব! করিলে গমন,
আসিবে···ভাগ্যে বিষাদ রজনী!
এবিষাদ-অন্ধকারে নির্মম অন্তরে,
ডুবায়ে···রাজ্য যেও না তপন

রক্তাক্ত জালালাবাদের শিখরকে রক্তরাঙা নতি জানিয়ে সত্যসত্যই দিনমণি অস্তাচলে মুখ লুকাল।

নিতান্ত কি দিনমণি ডুবিলে এবার,
ডুবাইয়া বঙ্গ আজি শোক-সিন্ধু-জলে ?
যাও তবে, যাও দেব ! কি বলিব আর ?

আজি গেলে, কালি পুনঃ হইবে উদয়,
গেল দিন, এই দিন ফিরিবে আবার ;

নেমে এলো সন্ধ্যার ধূসর অন্ধকার পক্ষ বিস্তার করে।

ক্রমে দু'পক্ষেরই গুলির আওয়াজ সেদিনকার মত থেমে এলো।

যুদ্ধ বিরতি।

ধূসর অন্ধকারেই মিলিটারী ফৌজ পরাজিত পর্যুদস্ত হয়ে ফিরে গেল রাত্রের মত।

এই অবসর !

বিপ্লবীরাও জালালাবাদ পরিত্যাগ করে কাছেই একটি গ্রামের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করল।

পশ্চাতে দ্বাদশ সঙ্গী তাদের পরম নিশ্চিন্তে শষ্প শয্যার উপরে নিদ্রিত হ'য়ে রইলো।

ভ্রমক্রমে মৃতবোধে অজ্ঞান রক্তাক্ত ক্ষত-বিক্ষত অর্ধেন্দু দস্তিদার, অম্বিকা চক্রবর্তীকে ওরা জালালাবাদ পাহাড়ের উপরেই অন্যান্য মৃতদের মধ্যে ফেলে চলে এসেছিল।

গভীর রাত্রে অম্বিকা চক্রবর্তীর জ্ঞান ফিরে এলো।

দেখলে চারিপাশে সঙ্গীদের মৃত দেহগুলো পড়ে আছে। নিকটবর্তী গ্রামে ধীরে ধীরে কোনক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে পাহাড় থেকে নেমে এসে এক সহৃদয় মুসলমান চাষীর গৃহে আশ্রয় পায় সে।

অম্বিকা চক্রবর্তী তাকে স্পষ্টই বললে : আমি একজন পলাতক বিপ্লবী। দেশের জন্য, তোমাদের সবার জন্য ইংরাজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছি—আহত অবস্থায় তোমার কাছে আশ্রয় চাইছি। ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে ধরিয়েও দিতে পার।

নিশ্চয় আশ্রয় দেবো। আমার যতটুকু সাধ্য আছে তাই দিয়ে তোমাকে সাহায্য করবো। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। তোমরা দেশের জন্ম এত বিপদ মাথা পেতে নিয়েছো আর আমি তোমার জন্ম সামান্ম এইটুকু পারবো না!—'

পরের দিন আবার নতুন উদ্যমে শ্বেতাঙ্গের মিলিটারী বাহিনী জালালাবাদ পাহাড়ে আক্রমন চালাতে এসে অন্ম পক্ষের কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে পাহাড়ের উপরে গিয়ে শহীদদের মৃতদেহগুলি মাত্র দেখতে পেল।

অর্ধেন্দুর ও মতিলালের তখনও প্রাণবায়ু নির্গত হয় নি—হাসপাতালে বহে নিয়ে যাওয়া হলো অর্ধেন্দুকে কিন্তু মতিলাল সেইখানেই নিঃশ্বাস নিল।

বেলা ১-৫০ মিঃ অর্ধেন্দু শেষ নিঃশ্বাস নেয়।

নরেশ রায়—চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল মেডিকেল স্কুলের ছাত্র ছিল—বয়স তার ছিল মাত্র ২০ বৎসর মৃত্যুর সময়। ময়মনসিংয়ের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তার জন্ম।

বিধুভূষণ ভট্টাচার্য—কুমিল্লার এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। নরেশের সমবয়সী ও সহপাঠী।

ত্রিপুরা সেন—বয়স মাত্র ছিল ষোল বৎসর। পিতৃভূমি ঢাকায়—চট্টগ্রামে মামার বাসায় থেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে অধ্যয়ন রত ছিল।

অর্ধেন্দু দস্তিদার—উনবিংশ বৎসর বয়স্ক যুবক। চট্টগ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম। ঘর ছাড়া বিপ্লবী। অভিযানের কয়েক মাস আগে পিকরিক্‌য়্যাসিড্‌ দিয়ে বোমা তৈয়ারী করবার সময় বিস্ফোরণের ফলে সাংঘাতিক ভাবে তার দেহ পুড়ে গিয়ে সমস্ত দেহে ঘা হয়ে গিয়েছিল। অভিযানের দিনও সে সুস্থ ছিল না কিন্তু তথাপি তাকে নিবৃত্ত করা যায় নি। স্বেচ্ছায় অসুস্থ দেহেই সে মুক্তি যজ্ঞে আপনাকে নিবেদন করেছিল।

মধুসূদন দত্ত—২৬ বৎসর বয়স্ক যুবক। চট্টগ্রামের পল্লীর এক মধ্যবিত্ত ঘরে তার জন্ম হয়েছিল।

হরিগোপাল বল (টেগ্‌রা)—১৪ বৎসর বয়স্ক কিশোর। কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র ছিল।

প্রভাস বল—মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল—প্রয়াণের সময় বয়স ছিল তার মাত্র ষোল বৎসর।

নির্মল লালা—কক্সবাজার হাইস্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—অভিযানের সময় তার বয়স ১৪ বৎসর মাত্র। বিচিত্র ছিল ঐ চৌদ্দবৎসর বয়স্ক কিশোর। মাষ্টারদার কথা সে কক্সবাজারে বসেই শুনেছিল।

তাঁকে দেখবার লোভ সে সম্বরণ করতে না পেরে চট্টগ্রামে হাজির হয় অভিযানের অল্প কিছু দিন আগে।

অত্যাসন্ন অগ্নিযজ্ঞের বার্তা তার কাছে চাপা থাকে নি—সে অনুমান করেছিল এবং সোজা একদিন মাষ্টারদার কাছে গিয়ে হাজির।

'মাষ্টারদা—আমি বুঝতে পারছি শীঘ্রই আপনারা একটা কিছু করবেন, আমাকেও কিন্তু আপনাদের সঙ্গে নিতে হবে।—'

কৌতুক বোধ করেন সূর্য সেন। মৃদু হাস্যে প্রশ্ন করেন: কয়দিন হয় পার্টিতে এসেছো ?

'প্রায় দু'মাস হবে।—'

'হুঁ! কোন ক্লাসে পড় ?—'

'ক্লাশ এইট—।'

'বয়স ?—'

'চৌদ্দ !—'

'এইটুকু বয়েসে কেমন করে তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে নির্মল ?—'

মাষ্টারদাকে রাজী করাতে না পেরে বেচারী ক্ষুণ্ণ চিত্তে ফিরে গেল কক্স্‌বাজারে।

সেখানে গিয়েই বিধু সেনকে বললে: বিধুদা মাষ্টারদাকে রাজী করবার কি কোন উপায়ই নেই ?

'তুমিই আবার গিয়ে তাঁকে ধর। এছাড়াত আর কোন উপায়ই দেখি না ভাই!—'

ফিরে এলো নির্মল আবার চট্টগ্রামে।

যেমন করে যে উপায়ে হোক মাষ্টারদাকে রাজী সে করাবেই।

ছিন্নমস্তা দেশজননী যার বক্ষরক্ত পান করবার জন্য স্বয়ং লালায়িতা হ'য়ে উঠেছেন তার গতিরোধ করে কে!

আপন বক্ষ চিরে তাই সে রক্ত দিয়ে গেল তৃষিতা জননীকে!

পুলিন ঘোষ—১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক, চট্টগ্রাম জে, এম, সেন স্কুলের প্রখর ধীমান মেধাবী ছাত্র ছিল দশম শ্রেণীর। দুঃস্থ পরিবারের সন্তান কায়ক্লেশে পড়াশুনা চালাত।

শশাঙ্ক দত্ত—চট্টগ্রাম কলেজের ইনটারমিডিয়েটের ছাত্র—বয়স ছিল মাত্র ১৮ বৎসর।

মতিলাল কানুনগো—চট্টগ্রামের এক দরিদ্র পরিবারের সন্তান কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র—বয়স ১৭ বৎসর।

জিতেন্দ্র দাস—১৭ বৎসর বয়স্ক যুবক। মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম।

এদিকে বিদ্রোহীদের যে খণ্ড দলটি জালালাবাদগামী দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়ে—গনেশ ঘোষ, অনন্তলাল সিংহ, জীবন ঘোষাল ও আনন্দ গুপ্তকে নিয়ে, ঐ কয়জন উপায়ান্তর আর না দেখে ২২শে এপ্রিল চারিদিককার সশস্ত্র শ্বেতাঙ্গ প্রহরীদের খর অনুসন্ধানী, দৃষ্টিতে ধূলি নিক্ষেপ করে সন্ধ্যার অন্ধকারে চারিদিক যখন ছায়াচ্ছন্ন হ'য়ে উঠেছে কুমিল্লার পথে বের হ'য়ে পড়ল ছদ্মবেশ ধারণ করে।

চার জনেরই চুল ছোট করে ছাঁটা, পোষাক পরিচ্ছদে গ্রাম্য ধোপার পরিচয়।

অন্ধকারে দীর্ঘ আট মাইল পথ অতিক্রম করে এসে সকলে ভাটিয়ারী ষ্টেশনে পৌছাল গভীর রাত্রে।

কুমিল্লার চারখানা টিকিট ওরা চাইলে কিন্তু ষ্টেশন মাষ্টার ওদের দেখে সন্দেহ হওয়ায় বললে কুমিল্লার টিকিট ফুরিয়ে গিয়েছে, লাকসামের টিকিট পাওয়া যেতে পারে।

ওরা আর কাল বিলম্ব না করে ট্রেন যেমন প্লাটফরমে এসে প্রবেশ করেছে, চারখানা লাকসামেরই টিকিট কিনে ট্রেনে চেপে বসল।

সরকারের উচ্ছিষ্টলোভী বাঙ্গালী ষ্টেশন মাষ্টার অশ্বিনী ঘোষ পুরস্কার ও বাহবা প্রাপ্তির লোভে তারই দেশের মুক্তি সংগ্রাম রত কয়েকটি তরুণ সৈনিককে ধরিয়ে দেবার জন্ম টিকিটের নম্বর দিয়ে অবিলম্বে সেই লাইনের সমস্ত ষ্টেশনে ষ্টেশনে তার করে সংবাদত' দিলই—ট্রেনের গার্ডকেও সব সংবাদ দিয়ে দিল।

ফলে ট্রেনটা ফেণী ষ্টেশনে এসে দাঁড়াতেই একদল সশস্ত্র পুলিশ ওদের কামরার মধ্যে এসে হানা দিল।

টিকিট পরীক্ষান্তে বললে পুলিশ ইনেস্‌পেকটার: তোমাদের নামতে হবে।

কোন যুক্তি তর্কই তারা মানল না, ওদের নামতে হলো ষ্টেশনে পুলিশ পরিবৃত্ত হয়ে।

সকলকে এনে পুলিশ আর. এম. এস অফিস ঘরে ঢোকাল।

তারপর বডি সার্চ করতে ওদের উদ্যত হতেই চক্ষের পলকে নিরীহ ধোপার পরিচয় ভয়াবহ বিপ্লবীতে রূপান্তরিত হলো।

গর্জে উঠ্‌লো আগ্নেয়াস্ত্র।

গুলির শব্দে ও ধোঁয়ায় মুহূর্তে চারিদিক কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন করে বিপ্লবীরা অন্তর্হিত হলো বাইরের অন্ধকারে যে যেদিকে সুবিধা পেল।

অন্ধকারে অপরিচিত আঘাটা দিয়ে কিছুক্ষণ দিগবিদিগ হারা হ'য়ে ছুটতে ছুটতে আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল দেখলে, অনন্ত সিংহ ও গণেষ ঘোষের কোন চিহ্নই নেই আশে পাশে।

এদিকে পুলিশের চীৎকারও দূরে শোনা যাচ্ছে।

শোনা যাচ্ছে অনুসরণকারীদের হৈ চৈ ও গোলমাল।

দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয় জেনে ওরা আবার অন্ধকারে ছুটলো।

দৌড়াতে দৌড়াতে ওরা দু'জনে এসে ট্রাঙ্ক রোডের উপরে উঠ্‌লো এবং ট্রাঙ্ক রোড ধরে এবারে হাঁটতে সুরু করল।

এমনি করে ট্রাঙ্ক রোড ধরে আরো কিছুক্ষণ হাঁটবার পর হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল অন্ধকারে গাছতলায় কে একজন কাপড় মুড়ি দিয়ে বসে।

হয়তো কোন গোয়েন্দা—ব্রিটিশের গুপ্তচর ভেবে মুহূর্তে ওরা দু'জনে রিভলভার বের করে বজ্র কঠোর কণ্ঠে বলে: Hands up!

লোকটি কোন প্রতিবাদ না করেই নীরবে দু'টি হাত মাথার উপরে তুলে ধরল।

'নাম কি?—'

'আমার নাম শ্রীযুক্ত গণেশ ঘোষ।'

হাসি ও আনন্দের মধ্য দিয়ে অতঃপর ওরা দু'জনে একজন হারান সাথীকে ফিরে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলো

কিন্তু চতুর্থ—অনন্ত সিংহ কোথায়!

ঐভাবে দুর্গম রাস্তা ধরে বন জংগল পাহাড় ডিঙ্গিয়ে পদব্রজে বহু ক্লেশ ও বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে রেল ষ্টেশনে এসে ওরা পৌছায় সেখান থেকে মুসলমানের ছদ্মবেশে টিকিট কেটে শ্রীহট্ট!

এবং শ্রীহট্ট থেকে তিনজন কলকাতায় এসে পৌছাল।

কলকাতার তদানীন্তন যুগান্তর দল ঐ তিনটি পলাতক বিপ্লবীকে দিলেন আশ্বাস ও প্রীতি।

তাদেরই চেষ্টায় ওরা পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে আজ এখানে কাল সেখানে আত্মগোপন করে বেড়াতে লাগল।

এমন সময় নানা বিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে অনন্ত সিংহও কলকাতায় এসে পৌঁচেছে।

এবং লোকনাথ বলও দলে এসে ভিড়ল চট্টগ্রাম থেকে।

যুগান্তর দলের সহযোগিতায় ওরা কলকাতায় ও কলকাতার বাইরে নানা স্থানে আত্মগোপন করে থেকে অবশেষে এসে উঠ্‌লো সকলে গৃহীর পরিচয়ে যুগান্তর দলেরই চেষ্টায় ফরাসী চন্দননগরের গোঁদল পাড়ায় একটি গৃহে।

গৃহস্বামীর পরিচয় নিলেন যুগান্তর দলের কর্মী শশধর আচার্য আর গৃহস্বামিনীর পরিচয় নিলেন সুহাসিনী দেবী পাতানো স্বামী স্ত্রীর পরিচয়।

আপাততঃ চন্দননগরের 'পরে ক্ষণিক বিশ্রাম দিয়ে আমরা আবার ফিরে যাই সেই শহীদ ভূমি চট্টগ্রামে।

জালালাবাদ পাহাড়ে আত্মগোপন করে থাকাকালীন সময়ে মাষ্টারদার নির্দেশে দলের অমরেন্দ্র নন্দীকে শহরে পাঠান হয়—সেখানকার অবস্থা পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু বীর সৈনিক জালালাবাদে আর ফিরে যেতে পারে নি।

২৪শে এপ্রিল সশস্ত্র পুলিশের সংগে সম্মুখ যুদ্ধে সে প্রাণ দিল।

অমরেন্দ্র ছিল চট্টগ্রাম কলেজের ইণ্টারমিডিয়েটের ছাত্র। বয়স তার ছিল মাত্র ১৭ বৎসর, সশস্ত্র অভিযানের ত্রয়োদশ শহীদ।

জালালাবাদ পাহাড় থেকে শহরে ফিরে এসে মাষ্টারদার নির্দেশক্রমে আপাততঃ সকলে আত্মগোপন করে পরবর্তী সুযোগের প্রতীক্ষায় রইলো।

হালদা নদী ও কর্ণফুলীর সঙ্গমস্থল থেকে মাত্র মাইল কয়েক দূরে নোয়াপাড়ায় নিজের বাড়ীতে কয়েকদিন আত্মগোপন করে থেকে সূর্য সেন—কোয়াপাড়া বিনয় সেনের বাটীতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন।

এদিকে দগ্ধাবস্থায় সুখেন্দু দস্তিদারের জিম্মায় থাকাকালীন সময়ে সে ও সুখেন্দু সরকারের হাতে গ্রেপ্তার হয় ও হিমাংশু হাসপাতালে নীত হয়—সেইখানেই ঐ বীরের শেষ নিঃশ্বাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে যায়—চতুর্দশ শহীদ।

মহানায়ক মাষ্টারদার বিপ্লব পরিকল্পনার তখনও সমাপ্তি ঘটে নি।

অস্ত্রাগার অধিকার অভিযান শেষের দিকে ব্যর্থ হলেও বিপ্লবীর সঙ্কল্পকে দমাতে পারে নি।

নবোদ্যমে তিনি তখন নতুন অভিযানের জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

৬ই মে আবার বজ্রাগ্নি আকাশে অগ্নি শিখায় দেখা দিল।

ইউরোপীয়ান ক্লাবটি আক্রমণের পরিকল্পনা নিয়ে মাষ্টারদার নির্দেশে—স্বদেশ রায়, রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী রওনা হলো অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে, কিন্তু শহরের অবস্থা অনুকূল নয় বুঝে বিপ্লবীরা যখন ফিরে চলেছে ঘাঁটিতে—শ্বেতাঙ্গের অনুচর খান বাহাদুর আসানুল্লা ও আবদুল আজিম গুপ্তচর মুখে বিপ্লবীদের সন্ধানে পেয়ে তাদের পিছু নিল সশস্ত্র পুলিশ সঙ্গে নিয়ে।

সংবাদ পেয়ে ওদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়, ডি, আই, জি মিঃ ফারমার, ইনেসপেকটার, ম্যাকডোনালড, সাব-ইনেসপেকটার হেমগুপ্ত ও ইষ্টার্ণ ফ্রণ্টিয়ার রাইফেলসয়ের আটজন সৈন্য।

বহুক্ষণ ধরে উভয় দলের মধ্যে ধাবমান সংঘর্ষ হলো—ফণী নন্দী ও সুবোধ চৌধুরী ধরা পড়ল বাকী চারজন গুরুতররূপে আহত হয়েও ছুটতে ছুটতে গিয়ে সামর্থ্যহীন অবস্থায় সামনের এক বাঁশবন দেখতে পেয়ে তারই মধ্যে আশ্রয় নিল।

উভয়পক্ষে সুরু হলো এবারে সম্মুখ যুদ্ধ।

কয়েক মিনিট ধরে উভয় পক্ষে অবিশ্রাম গুলি বিনিময় হলো।

তারপর সব নিঃশব্দ।

বিপ্লবীদের কোন সাড়া আর পাওয়া যায় না।

ডি, আই, জি ও অন্যান্য সকলে এবারে বীরদর্পে বাঁশ ঝাড়ের দিকে এগিয়ে যায়।

রজত সেন, স্বদেশ রায় ও দেবপ্রসাদ গুপ্তর গুলি বিদ্ধস্ত বিগত প্রাণ দেহ শুধু বাঁশঝাড়ের মধ্যে রক্ত সাগরে ভাসছে।

কালারপোলের ধুলিতে আবার রক্ত আলিম্পনে মুক্তি যজ্ঞের আর একটি পৃষ্ঠা চির স্মরণীয় হয়ে গেল।

সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের পঞ্চদশ, ষোড়শ ও সপ্তদশ শহীদ।

স্বদেশ রায়—অবস্থাপন্ন পরিবারের দুলাল। সৌখীন পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত।

১৮ই এপ্রিল যখন চট্টলার আকাশ গুলির শব্দে মুখরিত স্বদেশ তখন নিজের ঘরে বসে সেতারে সঙ্গীত সাধনায় নিমগ্ন ছিল।

সহসা তার কানে এলো গুলির শব্দ ও বন্দে মাতরম ধ্বনি। Long live Revolutionয়ের দিক ছাড়া ডাক।

ধনীর দুলাল আর ঘরের মধ্যে বসে থাকতে পারল না, দরজা খুলে ছুটে বাইরে বের হয়ে গেল।

এবং নিঃসঙ্কোচে ঝাঁপ দিল অগ্নিতে।

মা তাকে ডেকে নিয়েছিলেন, মাই তাকে তার রক্তাক্ত কোলটি পেতে সস্নেহে টেনে নিলেন।

মাত্র ১৮ বৎসর বয়স্ক যুবক।

আর রজত সেন—১৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ! কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র—মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান।

শহীদ মনোরঞ্জন সেন—এক অতি দরিদ্র পরিবারের সন্তান। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। মাত্র ১৭ বৎসর বয়েসের সময় সে দেশের জন্য হাসিমুখে শত্রুর গুলিতে প্রাণ দিয়ে গেল।

দেবপ্রসাদ গুপ্ত—কলেজের একজন কৃতী বিজ্ঞানের ছাত্র ছিল কিন্তু তার চাইতেও বেশী ছিল সে জন্ম বিপ্লবী।

মরিয়া হ'য়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ঘোষণা করলে ১৬ই মে—১৯৩০। কেউ যদি নিম্নলিখিত পলাতকদের সন্ধান দিতে পারে নিম্নলিখিত পুরস্কার পাবে।

সূর্য সেন—৫০০০৲, অনন্ত সিংহ—৫০০০৲, নির্মল সেন—৫০০০৲, গণেশ ঘোষ—৫০০০৲, অম্বিকা চক্রবর্তী—৫০০০৲, লোকনাথ বল—৫০০০৲ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আর ঐ সঙ্গে মহাসমারোহে ইতিপূর্বে দুর্ভাগ্যক্রমে যে সব বিপ্লবীরা ধরা পড়েছিল সরকার বাহাদুর তাদের নিয়েই 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাম দিয়ে আদালতে সুরু করে দিয়েছে মামলা। এক স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করে ১৯৩০—২৩শে জুলাই।

ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট শ্বেতাঙ্গ বিচারক—তদানীন্তন চট্টগ্রামের জেলা জজ—মিঃ ইডনি।

আর তার সহকারী বিচারক ট্রাইবুন্যালে—খান বাহাদুর মৌলভী আব্দুল ও রায় বাহাদুর নরেন্দ্র নাথ লাহিড়ী

বিপ্লবীদের পক্ষ নিয়ে দাঁড়ালেন—দেশের তদানীন্তন বিখ্যাত আইনজীবীর দল, শরৎচন্দ্র বসু, সন্তোষ বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, অখিলচন্দ্র দত্ত ও কামিনীকুমার দত্ত প্রভৃতিরা।

বিপ্লবের পথ চিরদিনই কণ্টকাকীর্ণ, শত দুঃখ, লাঞ্ছনা, পীড়ন, রক্তক্ষয় ও মৃত্যুর মধ্য দিয়েই তার গতি।

তাইত বিপ্লবীর ধর্ম সন্ন্যাসীর ধর্ম!

মান অভিমান প্রেম ভালবাসা তার জন্য ত নয়।

বেদনা, হতাশা ও অশ্রুমোচন ত'তার ধর্ম নয়।

বাহাদুরী বা নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখাই তার পক্ষে বিপ্লবীর ধর্ম হ'তে চ্যুত হওয়া।

সেইখানেই তার মৃত্যু!

সেই তার শেষ!

তাই মনে হয় ১৯৩০—২৮শে জুন ইনেস্‌পেক্টার জেনারেল লোম্যানকে পূর্বাহ্ণে পত্র দিয়ে অনন্ত সিংহের আত্মসমর্পণ—আর যাই হোক বিপ্লবীর নিষ্ঠার ও ধর্মের অপমৃত্যু ভিন্ন বোধ হয় আর কিছুই নয়।

কথার ফুলঝুরী গেঁথে নিজেকেই সমর্থন করা যায় কিন্তু বিপ্লবীর ধর্মকে স্বীকৃতি দেওয়া যায় না।

বিপ্লবীর ধর্মের কষ্টিপাথরে তাই লোম্যানকে লিখিত অনন্ত সিংহের পত্রখানা তার সত্যকারের মূল্যটুকুই হয়ত যাচাই করে দিয়েছে।

তাই বলছিলাম ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের যে রক্তক্ষরা স্মৃতি বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় যে অনন্তলাল সিংহের পরিচয় নিয়ে ভারতের অগণিত জনগণকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করেছিল তা স্মৃতির মণিকোঠাতেই স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাক।

১৯৩০য়ের ২৮শে জুন তাকে আর স্মরণ করতে চাই না!

১৯৩০য়ের ২৮শে জুন ১৩নং ইলিশিয়াম রো'তে গিয়ে পূর্বাহ্ণে বাংলার তদানীন্তন আই জি, মিঃ লোম্যানকে এক পত্র লিখে অনন্ত সিংহ আত্মসমর্পণ করল।

এবং বলাই বাহুল্য অতঃপর সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত করে বিপ্লবী অনন্তলাল সিংহকে শ্বেতাঙ্গের দল চট্টগ্রামে নিয়ে এসে কারাগারে রাখল।

অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে তারও অপরাধের (?) বিচার সুরু হলো।

মামলার সাড়ম্বর প্রহসন শ্বেতাঙ্গের আদালতে চলুক, আমরা ক্ষণেকের জন্য ফিরে যাই ফরাসী চন্দননগরে।

১৯৩০—১লা সেপটেম্বর রাত্রি শেষে।

তখনো নেভেনি আকাশপটে তারকার দল।

কিসের প্রতীক্ষায় তারা এখনো জেগে আছে আকাশের বুকে।

শুধু দূর আকাশের তারার দলই নয় সমস্ত প্রকৃতিও যেন কিসের প্রতীক্ষায় কান পেতে আছে।

আসছে ঘনিয়ে একটি মুহূর্ত।

শেষ রাত্রির আবছা অন্ধকারে কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার টেগার্ট সশস্ত্র একটি পুলিশ বাহিনী নিয়ে গাড়ীতে চেপে চলেছে চন্দননগরের পথে।

আবছা আলো-আঁধারে গাড়ীর হেড্‌লাইট্‌গুলো ধবকধবক করে যেন শয়তানের চোখের মত জ্বলছে। শয়তান প্যানথার্, রক্তচোষা শয়তান রক্তের সন্ধানে ছুটে চলেছে।

সতর্ক অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে বিপ্লবীদের একজন প্রহরী সজাগ ছিল। শয়তানের দল এসে গোন্দলপাড়ায় তাদের বাড়ীটা চারপাশ হ'তে ঘেরাও করে ফেলতেই অন্যান্য বিপ্লবীদের কাছে মুহূর্তে সে সংবাদ পৌঁছে গেল।

চারিদিকে শয়তানের দল সঙ্গীন উঁচিয়ে আছে। বিপ্লবীরা আর কালবিলম্ব না করে খিড়কীর দুয়ার পথে সরে পড়বার চেষ্টা করলো। কিন্তু পারলে না।

সুতীব্র টর্চের আলো ও ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি এসে ওদের চোখকে ধাঁধিয়ে দিয়ে পথ রোধ করল।

আর উপায়ন্তর না দেখে বিপ্লবীরাও প্রস্তুত হয়ে নিয়ে শক্ত মুষ্টিতে যে যার আগ্নেয়াস্ত্র উঁচিয়ে ধরল।

অগ্নুদগারে দিল জবাব।

একদিকে সুশিক্ষিত সরকারের বিরাট সশস্ত্র পুলিশবাহিনী অন্যদিকে মাত্র চারজন বিপ্লবী।

গণেশ ঘোষ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল।

দেখতে দেখতে শয়তানের গুলিতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে রুধিরাপ্লুত দেহে বিগতপ্রাণ জীবন ঘোষাল শরশয্যা নিল : বিদায় জন্মভূমি ! বিদায় ! Adieu my Native land !

শৃঙ্খলিত হলো বিপ্লবীরা।

সেইখানেই একদফা অমানুষিক অত্যাচার ও পীড়ন চললো ওদের প্রত্যেকের উপরে। সুহাসিনী দেবীও বাদ গেলেন না বর্বরোচিত নিষ্ঠুর অত্যাচারের কবল থেকে।

ব্যাটনের ঘা, বুটের লাথি, চড় কিল ঘুষি একটি নারীর দেহের উপরে অবিরাম বর্ষণ করতে তথাকথিত সুসভ্য শ্বেতাঙ্গদের রুচি বা শিক্ষায় সেদিন বাধেনি।

বীভৎস চীৎকার শ্বেতাঙ্গদের : Answer our question···answer you must—otherwise we shall make you feel what is what !

কিন্তু একটি মাত্র জবাব শোনা যেতে লাগল বার বার : I have nothing to say—Nothing ! Nothing ! Nothing !

শৃঙ্খলিত বিপ্লবীদের তারপর নিয়ে আসা হলো কলকাতায় এবং সেখান থেকে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত করে চট্টগ্রামে।

পথে পথে তারা শুনলে অভিনন্দন—বন্দে মাতরম্ ! Long live Revolution !

জীবন ঘোষাল—ধনীর দুলাল। ইণ্টারমিডিয়েটের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিল। অভিভাবকদের কত আশা ছিল ঐ সুকুমার কিশোরকে ধরে। কিন্তু শব্দ-স্পর্শ-গন্ধময়ী ধরিত্রীর মোহিনী আকর্ষণ কই তাকেত' ধরে রাখতে পারল না ! এই রূপ-রস-গন্ধভরা ধরিত্রী, যেখানে সেদিন ছিল পরাধীনতার মর্মন্তুদ জ্বালা, অত্যাচারী শোষকের নিষ্ঠুর হৃদয়হীন শোষণ—তাই তাকে ঘরের আরাম বিলাস ছেড়ে মৃত্যুর কণ্টকাকীর্ণ পথ হাতছানি দিয়ে নিয়ে গেল। মাত্র ১৭ বৎসর বয়স্ক তরুণ কিশোর। চট্টলার সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থানের সপ্তদশ শহীদ।

সেদিন বিপ্লবীদের চন্দননগর থেকে কলকাতায় ধরে আনবার পর কিশোর আনন্দ গুপ্তকে দেখিয়ে গনেশ ঘোষের পূর্ব পরিচিত জেলারবাবু যখন গনেশ

ঘোষকে প্রশ্ন করে : এই সব কচি ছেলেদেরও মার কোল থেকে ছিনিয়ে এনেছেন গনেশ বাবু ?

গনেশ ঘোষ বলেছিল : কি করি বলুন—আপনারা বড়রা যখন পিছ্ পাও হ'য়ে ইংরাজদের পোষ মেনে গিয়েছেন, তখন দেশের কাজে এমনি 'কচি ছেলেদের' বেরিয়ে আসা ছাড়া আর কোন উপায় রেখেছেন কি ?

পথে একজন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারা আনন্দ গুপ্তকে তার পরিণতির কথা সে ভেবেছে কিনা প্রশ্ন করায় মৃদু হেসে তরুণ কিশোর জবাব দিয়েছিল : পরিণতির জন্য আমরা ত প্রস্তুত হয়েই এপথে পা বাড়িয়েছি !

আর এক গাড়োয়ালী মিলিটারী পুলিশের হাবিলদার আনন্দ গুপ্তর সঙ্গে গোপনে আলোচনা করতে করতে এক সময় হঠাৎ বলেছিল : বাবুজী, আপ্ ঠিক্ই কহেথে ! তোমরা আমাদের মত নও। নিজেদের ঘর বাড়ী, মা, বাপ, সুখ দুঃখ সব কিছুকেই পিছনে ফেলে এসেছো দেশের জন্য, আমাদেরই সবার জন্য। বুঝি কি না বাবুজী ! সবই বুঝি ! সাধারণ মানুষ আমরা, পেটের দায়ে ইচ্ছার বিরুদ্ধেও গোলামী করছি। কিন্তু এখনো মন আমাদের মরে যায়নি—যখনই সুযোগ আসবে দেখে নিও আমরাও এসে দাঁড়াব তোমাদের পাশে—

বাকী কথাগুলো সরকারের গোলাম বৃদ্ধ হাবিলদার শেষ করতে পারে নি, উদ্গত অশ্রু কোনমতে রোধ করে উর্ধতন কর্মচারীর ভয়ে কেবিন থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

তাইত বলি সেদিন গোপনে যারা—

দু'পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে—
সবারে ডেকে গেল শিকল-ঝঙ্কারে।

তাদের জন্য জনসাধারণও অন্তত একটিবারও অশ্রুমোচন না করে পারে নি।

এবারে আবার নতুন করে শ্বেতাঙ্গের মামলা শুরু হলো পূর্বে আত্মসমর্পিত—অনন্ত সিংহ ও ধৃত সুবোধ চৌধুরী, ফণী নন্দী, রণধীর দাসগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, সুখেন্দু দস্তিদার, নন্দলাল সিং, লালমোহন সেন, ফকীর সেন, শান্তি নাগ, সুবোধচন্দ্র মিত্র, মধুসূদন গুহ, নিতাই ঘোষ, মনি ঘোষ, ননীগোপাল দেব, বীরেন দস্তিদার, অনিল দাস, সৌরীন দত্তচৌধুরী, অশ্বিনী চৌধুরী, সুবোধ

বিশ্বাস, সুকুমার ভৌমিক, আশু ভট্টাচার্য ও হেরম্ব বলের সঙ্গে চন্দননগরে ধৃত গনেশ ঘোষ, লোকনাথ বল ও আনন্দ গুপ্তর। এবং বিচারপর্ব চলতে লাগল চিরাচরিত আইনকে অবজ্ঞা করে শ্বেতাঙ্গের ইচ্ছা ও খুশীতে জেলের মধ্যেই কয়েদীদের থাকবার একটি ব্যারাকে দোতলার ঘরে।

বিপ্লবীদের পক্ষ্য সমর্থনে দাড়ালেন তদানীন্তন দেশের অন্যতম বিখ্যাত কয়েকজন আইনজীবী : শরৎচন্দ্র বসু, বীরেন্দ্র শাসমল, অখিল দত্ত, কামিনী দত্ত ও সন্তোষ বসু মহাশয়।

শীঘ্রই দলের সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদার সঙ্গে সুরক্ষিত কারাগারের অন্তরালে গোপন যোগাযোগ ঘটলো। এবং গনেশ ঘোষ ও অন্যান্য বন্দীদের উদ্যোগে বন্দীদের জেল ভেঙ্গে পালাবার এক অতি দুঃসাহসিক পরিকল্পনার প্রস্তুতি চলতে লাগল গোপনে, নিঃশব্দে।

দেখতে দেখতে জেল ভেঙ্গে পালাবার জন্য যাবতীয় দ্রব্য বাইরে থেকে সতর্ক প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে কারাগারের মধ্যে আমদানী হ'তে লাগল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য! কয়েকজন পাকা কয়েদীর বিশ্বাসঘাতকতায় সব ভেস্তে গেল।

তারা কিছু না দেখে আক্রোশের বশেই মিথ্যে করেই বলেছিল বিপ্লবীদের একজনের কাছে নাকি সে বোমা দেখেছে।

কথাটা শুনেই তখন কর্তৃপক্ষ সশঙ্কিত হ'য়ে জেলের সর্বত্র তচ্‌নচ্‌ করে সব আবিষ্কার করে ফেলল।

বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল।

বিপ্লবীদের বিশ্রাম ছিল না, সরকারের পাশবিক চণ্ডনীতি ও সদাসতর্ক প্রহরা সত্ত্বেও চট্টগ্রাম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মামলা চলাকালীন বারবার বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করে জানিয়ে দিতে লাগল : আমরা মরি নি! সাবধান।

এবং চট্টগ্রাম থেকে বিপ্লবের অগ্নিশিখা অনুকূল বায়ুতে বাঙ্গলাদেশের বহুস্থানে প্রসারিত হয়ে মধ্যে মধ্যে রক্তিম ঝলকে জানান দিতে লাগল : মেদিনীপুর, ঢাকা, কুমিল্লা ও কলকাতায় : বিপ্লব দীর্ঘজীবী হউক।

মেদিনীপুর জেলায় আইন অমান্য আন্দোলনের ঢেউ তখনও প্রশমিত হয় নি।

দাসপুর থানার অধীনে চেতুয়াহাটের সংগ্রামীরা বিলাতী বস্ত্র নিয়ে অগ্নিসৎকারে মেতে উঠেছে, ঐ সময় ১৯৩০—৩রা জুন দারোগা ভোলানাথ ঘোষ চেতুয়াহাটে গিয়ে সত্যাগ্রহী সংগ্রামীদের গ্রেপ্তার করে সামান্ত বচসার জন্য জনৈক স্বেচ্ছাসেবক শীতল ভট্টাচার্যকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে জর্জরিত করে অপমানিত করল।

জনতা গেল ক্ষেপে এবং সেই ক্ষিপ্ত জনতার হস্তে শ্বেতাঙ্গ অনুচর দারোগা ভোলানাথ মৃত্যুকে বরণ করতে বাধ্য হলো।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে হাকিম ফজলুল করিম জনাব বাহাদুর একদল সশস্ত্র পুলিশ নিয়ে এসে সমবেত জনতার উপরে বেপরোয়া গুলি চালাল।

চৌদ্দ জনের প্রাণ গেল গুলিতে।

তাতেও ক্ষান্ত না হয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার একটি স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করে চেতুয়াহাটের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বহু লোককে গ্রেপ্তার করে মামলা সুরু করল।

এবং মহাসমারোহে বিচার করে বারজনকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর ও পাঁচ জনের দুই বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডের আদেশ দিল।

১৬নং গোপ লেনে কলকাতায় বোমা তৈরীর অপরাধে ৮ই আগষ্ট জগন্নাথগঞ্জ ষ্টীমারঘাটে ষ্টীমার থেকে মনোরমা ঘোষ, শিশিরকুমার ও তারক করকে গ্রেপ্তার করল শ্বেতাঙ্গ সরকারের দল এবং সুরু করলে: সরিষাবাড়ী ষড়যন্ত্র মকদ্দমা।

মিঃ গার্লিককে প্রেসিডেন্ট করে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হলো ১৯৩০য়ের ২রা নভেম্বর।

বিচারে তিন জনকে—সুনির্মল, অবনী ও ক্ষিতীশকে—পাঁচ বৎসর হিসাবে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং তারক ও শিশিরের হয় তিন বৎসর করে কারাদণ্ড।

কলকাতায়—

২৫শে আগষ্ট আবার বিপ্লবীদের টেগার্টের প্রতি তাদের পুঞ্জীভূত ঘৃণা ও বিদ্বেষ প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মধ্যে প্রকাশ পেল।

বেলা এগারটা কি সাড়ে এগারটা হবে, জনবহুল কলকাতার ডালহৌসি স্কোয়ারে দেখা গেল একটি মোটর গাড়ী রাস্তার একপাশে নিঃশব্দে পার্ক করা আছে। সেই গাড়ীর মধ্যে দীনেশ মজুমদার, অনুজ সেনগুপ্ত ও অন্য একজন

বিপ্লবী বোমা ও গুলিভর্তি রিভলভার নিয়ে অপেক্ষা করছিল। তারা পূর্বাহ্ণেই সংবাদ পেয়েছিল ঐ সময়েই টেগার্টের গাড়ী ঐ রাস্তা দিয়ে যাবে।

টেগার্টের গাড়ী আসতেই প্রচণ্ড শব্দে বোমা বিস্ফোরণ হলো কিন্তু শ্বেতাঙ্গের অশেষ সৌভাগ্য—এবারেও সে বেঁচে গেল।

মুহূর্তে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল—পুলিশ ছুটে এলো।

বিপ্লবীরা বেগতিক দেখে যে যেদিকে পারলে পালাল কিন্তু আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হলো না দীনেশ—ধরা পড়লো।

অনুজ নিজের রিভলভার চালিয়ে মৃত্যু বরণ করে নিল। তৃতীয় জনকে আর ধরা গেল না। দীনেশের কাছে থেকে ও অনুজের মৃতদেহ তল্লাসী করে যে বোমা ও রিভলভার সরকার পেল বুঝতে পারল সেটা চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার হতেই লুণ্ঠিত অস্ত্র। আবার স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল—১৮ই সেপ্টেম্বর দীনেশের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ডাদেশ সগৌরবে ঘোষিত হলো।

পুলিশের ডালকুত্তারা পূর্ব হতেই বিশেষভাবে সক্রিয় হ'য়ে উঠেছিল, ঐ দিনই কৈলাস বসু ষ্ট্রীটের ডাঃ নারায়ণ রায়ের বাড়ী তল্লাসী করে ও সুরেন দত্তর বাসাও তল্লাসী করল। সেখানে কিছু গানকটন্, বিবিধ রাসায়নিক পদার্থ ও য়্যালুমুনিয়ামের সেল পাওয়া গেল।

আবার বসল স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল—ডাঃ নারায়ণ রায়, সুরেন দত্ত, অম্বিকা রায় প্রভৃতিকে অভিযুক্ত করে সরকারের ডালহাউসি স্কোয়ার বোমা ষড়যন্ত্র মামলার প্রহসন চললো নবোদ্যমে।

১৯৩১—২৭শে জুলাই হাইকোর্ট কর্তৃক ঐ মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি ঘোষিত হয়: ডাঃ নারায়ণ রায় ও ভূপাল বসুর—১৫ বৎসর হিসাবে দ্বীপান্তর। সুরেন দত্তর ১২ বৎসর কারাদণ্ড। রোহিণী অধিকারী ও যতীশ ভৌমিকের যথাক্রমে ৫ ও ২ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হলো। বাকী তিনজন পেল মুক্তি।

ঢাকা ১৯৩০—২৯শে আগষ্ট তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ আই, জি মিঃ এফ্, জে লোম্যান এবং ঢাকার এস্, পি, মিঃ ই, হড্সন্ নারায়ণগঞ্জের জল-পুলিশের এস্, পি অসুস্থ মিঃ এইচ্, এ, এস বার্টকে দেখতে ঢাকা মিট্ফোর্ড হাসপাতালে গিয়েছিল।

মিঃ বার্টকে দেখে দু'জনে যখন রোগীর ঘর হতে বের হয়ে বাইরে এসেছে, অতর্কিতে মিটফোর্ড মেডিকেল স্কুলের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তরুণ

বিপ্লবী বিনয় বসু রিভলভার হস্তে সাক্ষাৎ যমের মত সামনে এসে দাঁড়াল এবং বিনয়ের হস্তধৃত রিভলভার অগ্নুদ্গার করলে।

গুলি খেয়ে লোম্যান ও হড্‌সন উভয়েই রক্তাক্ত কলেবরে ধরাশায়ী হলো।

পুলিশ প্রচুর খানাতল্লাসী করেও বিনয় বসুকে ধরতে পারল না।

১লা সেপ্টেম্বর হাসপাতালেই লোম্যান মৃত্যুমুখে পতিত হলো।

জামসেদপুরের শ্রীরেবতীমোহন বসুর পুত্র বিনয় বসু!

কিন্তু সতর্ক প্রহরীর চোখে ধুলো দিয়ে কোথায় গেল বিপ্লবী বিনয়।

মাত্র চার মাস পরেই আবার ১৯৩০য়ের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতায় ডালহাউসি স্কোয়ারে দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্যালোকে জনবহুল কর্মব্যস্ত নগরীর বিখ্যাত সরকারী দপ্তরখানা রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে তার পুনঃ আবির্ভাব ঘটলো সঙ্গে নিয়ে আরো দু'জন বিপ্লবী সহচর—দীনেশ গুপ্ত ও বাদল ( সুধীর ) গুপ্তকে।

বাঙ্গালার তদানীন্তন ইনেস্‌পেক্টর জেনারেল অফ্‌ প্রিজনস্‌ কর্ণেল সিমসন্‌ ঐ সময় রাইটার্স বিল্ডিংস্‌য়ে তার নিজস্ব অফিস কক্ষে কর্মে ব্যস্ত—সাক্ষাৎ শমন বিপ্লবীরা ভাল ভর্তি রিভলভার হাতে সেই কক্ষ মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

মুহুর্মুহু কয়েকটি গুলির আঘাতে শ্বেতাঙ্গ সিমসনের রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ চেয়ারের উপরেই লুটিয়ে পড়ল।

সিমসন নিধন যজ্ঞ সমাপ্ত করে বিপ্লবীরা এবারে বাইরে বারান্দায় এসে অগ্নি বর্ষণ সুরু করল তাদের হস্তধৃত অগ্নিনালিকা মুখে।

গোলমাল ও গুলির শব্দে হতচকিত কর্মচারীর দল যে দিকে পারল প্রাণভয়ে আত্মরক্ষার্থে ছুটলো। আই, জি, মিঃ ক্রেগ্‌, সহকারী আই, জি, মিঃ জোনস্‌ ও অপর একজন ইংরাজ মিঃ ফোর্ড সকলে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে গুলি বর্ষণ সুরু করল। কিন্তু বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলির মুখে দাঁড়াতে পারল না তারা।

এদিকে টেলিফোনে সংবাদ পেয়ে টেগার্ট ততক্ষণে দলবল নিয়ে এসে হাজির হয়েছে রাইটার্স বিলডিংসে।

কিন্তু সকলের মিলিত প্রতিরোধ চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে যায় বুঝি বা!

সত্যপ্রিয়, নিরঞ্জন ও বাঘা যতীনের অমর আত্মা বুঝি বিনয় দীনেশ বাদলের পরে এসে ভর করেছে।

রাইটার্স বিল্ডিংস্‌ দ্বিতীয় বুড়ি বালামের তীরে হয়েছে পরিণত।

ঘন ঘন অগ্ন্যুদগারে রাইটার্স বিল্ডিংস্ প্রকম্পিত হচ্ছে।

ভারতের মুক্তি যজ্ঞের সে এক অভিনব দৃশ্য!

* * * শেষ পর্যন্ত তূণের বাণ বিপ্লবীদের ফুরিয়ে এলো। শহীদ বাদল বা সুধীর গুপ্ত তীব্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানইড্ ভক্ষণ করে শেষ নিঃশ্বাস নিল।

দীনেশ ও বিনয় আত্মহত্যার চেষ্টা করে গুরুতর আহতাবস্থায় ধৃত হয়ে হাসপাতালে নীত হলো।

শ্বেতাঙ্গ পত্রিকা ষ্টেটস্‌ম্যান পরের দিন লিখল : Battle Veranda!

বিনয়ের জ্ঞান আর ফিরে এলো না, হাসপাতালে থাকাকালীন ১৩ই ডিসেম্বর তার মহাপ্রয়াণ হলো।

আর দীনেশ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বার পর স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে তার অপরাধের (?) বিচার হলো।

এবং চিরাচরিত ভাবে ১৯৩১—৭ই জুলাই আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলে তার ফাঁসী হয়ে গেল।

সে এক যুগ। সেই এক মাহেন্দ্রক্ষণ!

বাঙলার নাড়ীতে নাড়ীতে এসেছে যেন জীবনযজ্ঞের এক জোয়ার।

ধমনীতে ধমনীতে উষ্ণ প্রস্রবণ!

কিশোর তরুণ যুবার দল দেখছে আবার নতুন করে মুক্তির স্বপ্ন!

চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থান কি বৃথাই যাবে।

> নিমেষ তরে ইচ্ছা করে বিকট উল্লাসে
> সকল টুটে যাইতে ছুটে জীবন উচ্ছ্বাসে।
> শূন্য ব্যোমে অপরিমাণ মত্তসম করিতে পান
> মুক্ত করি রুদ্ধ প্রাণ, ঊর্দ্ধ নীলাকাশে!
> থাকিতে নারি ক্ষুদ্র কোণে আম্রবন ছায়ে,
> সুপ্ত হয়ে লুপ্ত হয়ে গুপ্ত গৃহ বাসে।

প্রাণের আবেগ যেন তারা আর রোধ করতে পারছে না।

আর ওদিকে নতুন করে নবীন উদ্যমে মহানায়ক মাষ্টারদার সুচতুর

পরিচালনায় চট্টগ্রামের বিপ্লবীরা দ্রুতগতিতে শক্তি সঞ্চয় করে চলেছে নিঃশব্দে—ব্যাপক গোরিলা সংগ্রামের জন্য।

সরকারের পুলিশ ও মিলিটারীর তাণ্ডবলীলাও উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।

সহসা আবার ১৯৩০-এর ১লা ডিসেম্বর শীতের রাত্রিশেষে চাঁদপুর ষ্টেশনে বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদগার করলে।

রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ও কালী চক্রবর্তীর উপরে নির্দেশ হলো পুলিশের আই, জির জীবন নিতে হবে—বিপ্লবী-চক্রে স্থির হয়েছে।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, তারা ভুলক্রমে আই, জি'র বদলে গোয়েন্দা ইনেস্পেকটার তারিণী মুখার্জীকে গুলি মেরে হত্যা করলে।

ওরা দু'জন পালাতে পারল না নির্বিঘ্নে। দু'জনেই ধৃত হলো চাঁদপুর থেকে পনের মাইল দূরে। পরে বিচারে রামকৃষ্ণর হলো প্রাণদণ্ড আর কালী চক্রবর্তীর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড—বয়সে সে বালক বলে!

রামকৃষ্ণ—রামকৃষ্ণ বিশ্বাস। চট্টগ্রামের শরোয়াতলী গ্রামের এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান। চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কর্মী, কলেজের ইণ্টার মিডিয়েটের একজন কৃতী ছাত্র। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র হওয়ায় তার উপরে বিস্ফোরক তৈয়ারীর গুরু দায়িত্ব অর্পিত হয়। এবং বিস্ফোরক তৈরী করতে করতেই একদিন বিস্ফোরণের ফলে দেহের অনেক জায়গা তার পুড়ে যায়। নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও রামকৃষ্ণর সে সময়কার হাসিমুখে সহ্যশক্তি সত্যিই সকলকে বিস্মিত করেছে দিনের পর দিন।

* * *

মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত রামকৃষ্ণ যখন ফাঁসীর সেলে, হঠাৎ একদিন এক তরুণী ভগ্নীর ছদ্মবেশে এসে রামকৃষ্ণর দর্শনপ্রার্থী হলো।

'রামকৃষ্ণ আমার ভাই! আমি তার বোন।—'

অনুমতি পাওয়া গেল।

সেলের মধ্যে প্রবেশ করতেই বিস্মিত রামকৃষ্ণ আগন্তুক তরুণীর দিকে মুখ তুলে তাকাল: আপনি?

তরুণীর মুখে মৃদু হাসি: আপনার বোন রাণী!

বোন!—

রামকৃষ্ণ বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল এক বাঙ্গালী তরুণীর দুর্জয় সাহসের পরিচয় পেয়ে।

পরিচয় পেল তরুণীর নাম প্রীতিলতা ওয়াদ্দার।

এরপর হ'তে প্রায়ই প্রীতি সেলে এসে রামকৃষ্ণর সঙ্গে দেখা করতে লাগল।

প্রীতি রামকৃষ্ণের কাছেই বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্রে উজ্জীবীতা হয়ে ওঠে সেদিন এবং যার ফলে পরবর্তী জীবনে হাসতে হাসতে দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নিঃশেষে নিজেকে সে আহুতি দিয়ে স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের একটি পৃষ্ঠা চিরোজ্জ্বল, চিরভাস্বর করে রেখে গিয়েছে ভারতের বীরাঙ্গণা রাণী ঝান্সী ও দুর্গাবতীর মত।

ফাঁসীর দিন এগিয়ে এলো।

রামকৃষ্ণ অসুস্থ—১০৩° জ্বর।

তথাপি নির্ভীক সৈনিক দৃঢ় পদবিক্ষেপে উঠে দাঁড়াল যে মুহূর্তে সেলের দরজার সামনে প্রহরীরা এসে দাঁড়াল।

'প্রস্তুত!—'

'হাঁ। চল!—'

কিছু গোপন ছিল না সেদিন অন্যান্য বন্দীদের কাছে এবং নির্দিষ্ট ক্ষণটি বন্দেমাতরম ধ্বনিতে আলিপুর জেলের রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক বন্দীদের মিলিত কণ্ঠের সরকারের কারাকক্ষের দেয়াল ও প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল!

বন্দেমাতরম্!

শহীদ রামকৃষ্ণ কি জয়!

আবার রেখা পড়লো রক্তের আঁচড়ে বিদ্রোহী ভারতের বিদ্রোহের ইতিবৃত্তের পাতায়।

কলকাতায় কালিঘাট—১৯৩০—১২ই ডিসেম্বর ৪১নং ঈশ্বর গাঙ্গুলী লেনে—তরুণ বিপ্লবী চুণীলাল মুখার্জীকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ সরকার গ্রেপ্তার করলো, এবং ঐ সঙ্গে পরে মণীন্দ্রলাল সেন ও সুবোধ দাসগুপ্তকেও গ্রেপ্তার করা হয়। চুণীলাল ছিল তরুণ সঙ্ঘের সম্পাদক। 'বিচারপতি গার্লিককে প্রেসিডেণ্ট ক'রে স্পেশাল ট্রাইবুন্যালে ওদের বিচার হলো; বিচারে প্রত্যেককে এক বৎসর করে কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হলো।

আবার! আবার বিপ্লবের আগুন!

কোথায়? পাঞ্জাবে—

২৩শে ডিসেম্বর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি পাঞ্জাবের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণর জি, ডি, মনেটরেন্সিকে লক্ষ্য করে বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠলো।

কিন্তু গভর্ণর সামান্য আহত হলো, নিহত হলো সরকারী দারোগা চন্নন সিং গুলির আঘাতে।

বিপ্লবীকে ঘটনাস্থলেই ধৃত করা হলো।

বাইশ বৎসর বয়স্ক পেশোয়ারবাসী এক তরুণ যুবক—হরকিষণ।

বিচার সুরু হলো—হরকিষণের সঙ্গে পাঞ্জাবের 'মিলাপ' নামক সংবাদপত্রের সম্পাদক চমনলাল ও রণবীর সিংও ধৃত হয়ে কারারুদ্ধ হলো।

বিচারে দণ্ডাদেশ হলো তিনজনেরই মৃত্যুদণ্ড। অপূর্ব নাটক!

১৯৩১—২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবসে যখন ভারতের সর্বত্র নীরব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ চলেছে সেইদিন প্রত্যুষে স্বাধীনতার বিজয় তিলক কপালে এঁকে হাসতে হাসতে হরকিষণ ইংরাজের ফাঁসীর দড়িতে প্রাণ দিয়ে গেল।

ভারতে ১৯৩০ সালটি যেন বিশেষ ভাবেই চিহ্নিত।

মুক্তিযজ্ঞের লাল সাল যেন।

মহাত্মার অসহযোগ ডাণ্ডি অভিযান, লবণ আইন ভঙ্গ থেকে শুরু করে চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুব অভ্যুত্থান, কলিকাতা, ঢাকা, চন্দননগর, মেদিনীপুর ও কুমিল্লায় বিপ্লবের অগ্নিক্ষরণ, বিদেশী দ্রব্যসমূহ বয়কট—বা বর্জন, শ্রমিকদের ধর্মঘট, সরকারের বেপরোয়াভাবে শান্তির অজুহাতে নিরস্ত্র জন সাধারণের প্রতি গুলি বর্ষণ—ব্যপক ধরপাকড় এবং ২৩শে এপ্রিল তারিখে এক অর্ডিনান্স জারী করে আইন অমান্য ঘটিত সংবাদটুকু পর্যন্ত পত্রস্থ করা নিষিদ্ধ ঘোষণা।

১৩১ খানা সংবাদপত্রের নিকট হ'তে ২,৪০,০০০৲ টাকা জামিন আদায় করল সরকার।

চৌকীদারী ট্যাকস বন্ধ করা, বা আইন ভঙ্গ করা বহুবিধ ব্যাপার একের পর এক ঘটে যায়।

সারাটা বৎসর ধরেই যেন এক ঝড়ের তাণ্ডব নৃত্য চলে ভারতের বুকে—স্বৈরাচার ও নিষ্ঠুর দুর্ধর্ষ দমননীতির।

১৯৩০—১২ই নভেম্বর তারিখে লণ্ডনে গোলটেবিল বৈঠক নাম দিয়ে শ্বেতাঙ্গ সরকারের আপন খেয়াল-খুশী মত যত সব তাঁবেদার ভারতীয় ও ব্রিটিশ নেতৃবর্গকে নিয়ে ভারতের ভাবী শাসনতন্ত্র স্থির করবার জন্য এক সম্মেলন সুরু করা হয়।

রাজন্যবর্গের তরফ থেকে ১৬জন, ব্রিটিশ ভারত থেকে ৫৬ জন, ও বিলাতের ১৩ জন প্রতিনিধি নেওয়া হয়েছিল।

যথাসময়ে সাড়ম্বরে তথাকথিত শ্বেতাঙ্গ কল্পিত গোলটেবিল বৈঠকের বুজরুকী পর্ব সুরু হলো। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সরকার বুঝতে পেরেছিল বৈঠকে কংগ্রেসী নেতারা আসন না গ্রহণ করলে সাফল্যের সম্ভাবনা খুবই কম।

অতঃপর বহু বাক্‌বিতণ্ডার পর কতকগুলো প্রতিশ্রুতি আদায় করে মহাত্মা ১৯৩০—২৯শে আগষ্ট লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করলেন শ্বেতাঙ্গের গোলটেবিল প্রহসনে যোগদান করতে। পূর্ব বৈঠকেই সাধারণ আলোচনা হ'য়ে গিয়েছিল। এবারের বৈঠক পৃথক পৃথক কমিটিতে বিভক্ত হ'য়ে শাসন সম্পর্কীয় আলোচনা সুরু করলো।

প্রত্যেক কমিটিতেই মহাত্মা ভারত শাসন সমস্যা সম্পর্কে সুন্দর, প্রাঞ্জল ও স্পষ্ট ভাষায় কংগ্রেসের অভিমত ব্যক্ত করলেন।

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী, দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্র নীতি, রাজস্ব, বাণিজ্য, জাতীয় ঋণ প্রভৃতি নানা বিষয় তাঁর বক্তৃতার বিষয় হলো।

কিন্তু চোরা নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী।

কোন প্রকার প্রতিশ্রুতিই পাওয়া গেল না, কেবল মৌখিক অর্থহীন আশ্বাস।

১লা ডিসেম্বর গোলটেবিল পর্ব শেষ হলো।

যা হবার এবার আবার তাই হলো।

তথাকথিত গোলটেবিল পর্ব সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে সরকারের দমননীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে সুরু হয়ে গেল।

পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ৫ই ফেব্রুয়ারী শেষ নিঃশ্বাস নিলেন।

লোকমান্য তিলককেও দেশবাসী ঐ সঙ্কট মধ্যেই হারায়।

কাল এগিয়ে চলেছে তার পরিক্রমার পথে।

শোণিত সিক্ত পদে এগিয়ে চলেছে বিপ্লবীর দল: ভারতের মুক্তি-যজ্ঞের ইতিহাসের পাতাগুলো একের পর এক ভরে উঠ্‌ছে।

১৯৩০ সাল পার হয়ে গেল পশ্চাতে আগুনের দেদীপ্য শিখার স্মৃতি রেখে—
.মুখে ১৯৩১ সাল।

গোলটেবিল প্রহসনের শেষ দিন মহাত্মার বক্তৃতার কথাগুলো ভোলা যায় না। যার সারমর্ম এই।

তার বক্তৃতা বা তার প্রচেষ্টা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার উপরে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে এ দুরাশায় তিনি কোন কিছু বলেন নি। কারণ শাসক ও শোষিতের সম্পর্কটা তার কাছে ত' অবিদিত ছিল না।

বহু ব্যক্তিই দুঃশ্চিন্তা বোধ করেছেন ও প্রকাশ করছিলেন ভারতে ঐ সময় যে ভাবে সন্ত্রাসবাদ ( ? ) আন্দোলন ( বিপ্লব আন্দোলন ) ও আইন অমান্য আন্দোলন চলছিল তার গতি দেখে। তার উত্তরে মহাত্মা বলেছিলেন : আমি একজন ঐতিহাসিক না হলেও একথা বলতে পারি যে, যাঁরা দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করে গিয়েছেন, তাদের রক্তে ইতিহাসের পাতা রাঙা হ'য়ে আছে। দুঃখকে বরণ না করে কোনও জাতির স্বাধীন হওয়ার কোন নজির আমার জানা নেই। ( তথাকথিত ) সন্ত্রাসবাদীদের পক্ষে ওকালতি না করেও একথা বলা যায় যে, গুপ্তঘাতকের অস্ত্র, বিষ, রাইফেলের কার্তুজ বা বর্শা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র—স্বাধীনতার অন্ধ-পূজারীরা আজ পর্যন্ত যা ব্যবহার করেছেন—তার জন্য ঐতিহাসিকেরা তাঁদের অপরাধী ব'লে গণ্য করেন নি।

> যাহারা শোণিতসিক্ত পদচিহ্নে পথ রচি' বিক্ষুব্ধ ধুলায়
> উত্তপ্ত বুকের রক্তে মৃতপ্রায়া জননীর করিল তর্পণ,
> মানুষের মহালোভ—বাঁচিবার লোভ যারা ত্যাজিল হেলায়
> নিশ্চিন্তে জীবন যাত্রা অমারাত্রি সার করি কৈল বিসর্জ্জন।
> স্বাধীনতা সঁপি দিতে বহু লক্ষ পরাধীন আশাহীন জনে
> পথ-কুকুরের মত পথে পথে তাড়া খেয়ে ফিরে দীর্ঘ দিন,
> কেহবা বরিল কারা—কেহ মৃত্যু, মহোল্লাসে প্রেম আলিঙ্গনে—
> জীবনের সর্ব্ব আশা স্বেচ্ছাবৃত অপঘাতে করিল বিলীন।
> ক্লেদপঙ্ক-সমাকীর্ণ এ তিমিরে তাহারা আলোকবার্ত্তাবহ—
> তাহারা জানিয়াছিল দিশাহীন অন্তহীন নহে পারাবার—
> ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদের স্মরণ করি মৃত্যু দীক্ষা লহ,
> নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার॥

হাঁ নমস্কার করি! নমস্কার করি! প্রণাম জানাই!

চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের বহু সংগ্রামী তখনও ব্রিটিশের শ্যেন চক্ষুর প্রহরাকে ব্যর্থ ও পর্যুদস্ত করে পলাতক জীবন যাপন করছে। তাদের মধ্যে দুইজন—চট্টগ্রামের ফিরিঙ্গীবাজারনিবাসী শরৎচন্দ্র দস্তিদারের পুত্র তারকেশ্বর দস্তিদারকে ও চট্টগ্রামের বরমা ও ফিরিঙ্গি বাজার নিবাসী চন্দ্রকান্ত দের পুত্র—বীরেন্দ্র দেকে ধরিয়ে দিতে পারলে শ্বেতাঙ্গ সরকার ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দেবে ঘোষণা করেছিল। তারা জরুরী প্রয়োজনে বরমা গ্রামের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে ১৬ই মার্চ হঠাৎ একদল পুলিশের সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আকর্ষিত হল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের দারোগা দেশের শত্রু শশাঙ্ক ভট্টাচার্য ওদের চ্যালেঞ্জ জানাল: দাঁড়াও, তোমার কে!

পরিচয় দিল তারা তাদের দেহের অভ্যন্তরে সংগুপ্ত লোডেড্ রিভলভার বের করে অগ্নিঝলকে।

এদিকে তখন সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে

দুই পক্ষেই গুলি বিনিময় সুরু হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে।

শশাঙ্ক গুলিতে আহত হয়ে ধরাশায়ী হলো, ঐ ফাঁকে সন্ধ্যার ঘনায়মান অন্ধকারে তারক ও বীরেন গা ঢাকা দিল।

সরকার বুঝতে পারল গুপ্ত বিপ্লবীর দল তাদের ভয়ে চুপ করে বসে নেই! তারা তাদের কাজ করে চলেছে।

মেদিনীপুরেও ঐ সময় পুলিশের জুলুম পুরো মাত্রাতেই চলছিল।

দাসপুর থানাকে কেন্দ্র করে যে অসন্তোষের বহ্নি আত্মপ্রকাশ করে ও পুলিশের অগ্নিনলিকার মুখে রক্তক্ষয় হয় যে তার জের তখনও থেমে যায় নি।

মেদিনীপুরে ঐ সময় জিলা ম্যাজিস্ট্রেট্ মিঃ পেডি—এক শ্বেতাঙ্গ।

শ্বেতাঙ্গ হলেও লোকটি তত খারাপ ছিল না। তবে তারই শাসনকালে মেদিনীপুরে নানা অত্যাচার জনসাধারনের প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়ায় এবং ম্যাজিস্ট্রেট্ হয়েও তার কোন প্রতিকার করতে সক্ষম না হওয়ায় বিপ্লবী দলের আক্রোশ তাকেই সব কিছুর জন্য দায়ী করে আত্মপ্রকাশ করলো।

পেডির মৃত্যু পরোয়ানা তার অজ্ঞাতেই রক্তাক্ষরে স্বাক্ষরিত হ'য়ে গেল।

মেদিনীপুরে ঐ সময় কলেজিয়েট স্কুল প্রাঙ্গণে এক শিল্পপ্রদর্শনী চলছে।

৭ই এপ্রিল: পেডি ঐ প্রদর্শনীতে সভাপতির আসন গ্রহণ করতে এলো।

সভার কার্য চলছে, চারিদিকে অগণিত নর নারী বালক বৃদ্ধ যুবা শিশু—

সহসা বিপ্লবীর আগ্নেয়াস্ত্র মুখে বজ্রবিদ্যুতের হুঙ্কার জেগে উঠ্‌লো শান্ত পরিবেশকে ছিন্ন ভিন্ন করে।

শ্বেতাঙ্গের রক্তে মাটি আবার লাল হ'য়ে গেল।

মৃত্যুর করাল ছায়া নেমে এলো।

ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে বিমল দাশগুপ্তকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরে বিচারে প্রমাণাভাবে বেকসুর খালাস দেওয়া হয় তাকে।

চট্টগ্রামের আদালতে ১৯৩১য়ের জুন—তখন্ প্রথম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা মহাসমারোহে চলছে।

শহরের চারিদিকে সশস্ত্র মিলিটারির সতর্ক প্রহরা। পথে ঘাটে সর্বত্র সঙ্গীনের চোখ রাঙানি। মহানায়ক মাষ্টারদা মনে মনে সঙ্কল্প করলেন: প্রচুর পরিমাণে বিস্ফোরকের সাহায্যে তিনি ল্যাণ্ড মাইন তৈয়ারী করবেন এবং যে সব রাস্তা দিয়ে ট্রাইবুন্যালের বিচারপতিরা ও কর্তৃস্থানীয় সরকারী কর্মচারীরা যাতায়াত করে বেছে বেছে সেই সব পথে মাইন বসিয়ে সুযোগ ও সুবিধা মত ঐ সব দুর্বৃত্তদের প্রাণনাশ ঘটান হবে মাইন বিস্ফোরণের সাহায্যে।

কল্পনামত প্রস্তুতি চলতে লাগল।

চট্টগ্রামের নানাস্থানে প্রচুর পরিমাণে সোরা, গন্ধক প্রভৃতি বারুদের উপকরণ সংগ্রহ করে প্রায় পাঁচমণ বারুদ তৈয়ারী হলো।

কল্পনা দত্ত ও মনোরঞ্জন রায়ের প্রচেষ্টায় কলকাতা থেকে প্রচুর পরিমাণে সালফিউরিক য়্যাসিড্, নাইট্রিক য়্যাসিড্ ও গান কটনও আমদানি করা হলো এবং বিস্ফোরকও তৈয়ারী হলো। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই—শ্বেতাঙ্গ সরকার বিশ্বাসঘাতক স্পাইয়ের মুখে গোপনে সংবাদ পেয়ে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল এবং ২৯শে মার্চ দ্বিপ্রহরে একটি বালককে সন্দিগ্ধভাবে একটি বাণ্ডিল নিয়ে রাস্তা দিয়ে যেতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করল। বালকের নিকট প্রাপ্ত বাণ্ডিলটার মধ্যে একটি ক্যানেস্তারা (Canister) পাওয়া গেল। পরে আরো ঐ ধরনের এগারটি ক্যানেস্তারা পুলিশ আবিষ্কার করে। সরকারের বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ মৈত্র ঐ ক্যানেস্তারাগুলো পরীক্ষা করে মত দিল, ঐগুলিকে বৈদ্যুতিক তারযোগে দূর হতে জ্বালাবার ব্যবস্থা উহার মধ্যেই আছে এবং কোন ঘর উড়িয়ে দেবার জন্য ঐরূপ মাইন খুব সহজেই ব্যবহৃত হতে পারে।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সুরু হলো ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড়।

এবং এগারজনকে গ্রেপ্তার করে সরকার ডিনামাইট্ ষড়যন্ত্র মামলা রুজু করলো ফলাও করে

অভিযুক্ত করা হলো ১৬।১৭ বৎসর বয়স্ক একদল তরুণ কিশোর ও একজন কিশোরীকে।

কল্পনা দত্ত, অর্ধেন্দু গুহ, কালী দে, নিবারণ ঘোষ, প্রফুল্ল মল্লিক, রবি সেন, সুশীল সেন, অপূর্ব সেন, অনিল রক্ষিত, প্রভাত দত্ত ও শচীন সেন।

বিচারে দণ্ডাদেশ হলো আটজনের প্রতি—অর্ধেন্দু, নিবারণ, প্রফুল্ল, রবি, সুশীল, অনিল, হৃদয় ও প্রভাত।

আবার বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলো—২৩শে জুলাই সুদূর পুণা সহরে। পুণার ফার্গুসন কলেজে বোম্বাইয়ের শ্বেতাঙ্গ গভর্ণর স্যার আর্ণেষ্ট হট্সন উপস্থিত কলেজের লাইব্রেরী ঘরে বক্তৃতা দিতে।

গরম গরম বক্তৃতা চলেছে, এমন সময় অতর্কিতে উনিশ বৎসরের এক বিপ্লবী মহারাষ্ট্রীয় যুবক বলবন্ত গোগটির হাতের আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করলো। গভর্ণর কিন্তু অক্ষত দেহে বেঁচে গেল—কারণ গুলি লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়েছিল—দুর্ভাগ্য !

ঘটনার পরে সেই নির্ভীক যুবককে গভর্ণর বাহাদুর দয়াপরবশ হয়ে বোধ হয় বলেছিল : **A foolish thing to do my boy, what made you to it !**

নির্বোধ সে ছিল না, তোমার প্রশ্নই ছিল নির্বুদ্ধিতার চরম। কেমন করে তুমি বুঝবে কি যাতনায় সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিল !

এদিকে ঠিক চারদিন বাদেই আবার বিপ্লবীর হাতের আগ্নেয়াস্ত্র শহীদ দীনেশ গুপ্ত ও রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের প্রতি বিচারে প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়ার পুরস্কার স্বরূপ বিচারপতি শ্বেতাঙ্গ গার্লিকের বক্ষস্থল লক্ষ্য করে মৃত্যুগর্জন করে উঠলো।

মিঃ আর, আর, গার্লিক, আই, সি, এস আলিপুরের তৎকালীন ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ।

রামকৃষ্ণ ও দীনেশের বিচারের জন্য যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হয়—

গার্লিক ছিল তার প্রেসিডেণ্ট। প্রকৃতপক্ষে তারই কলমে দীনেশ ও রামকৃষ্ণের মৃত্যু পরোয়ানা লিখিত হয়—কিন্তু সে বুঝতেও পারে নি প্রায় ঐ সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীদের গুপ্ত বৈঠকে তার নিজেরও মৃত্যু পরোয়াণা স্বাক্ষরিত হয়ে গিয়েছে।

শহীদ দীনেশ গুপ্তর ফাঁসীর মঞ্চে জীবন দানের মাত্র কুড়ি দিন পরেই ২৭শে জুলাই বিচাপতি গার্লিক যখন তার এজলাসে বসে বিচারে নিযুক্ত, জামার মধ্যে গুলি ভরা আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে এক বিপ্লবী যুবক ধীর শান্ত নির্ভীক পদে এজলাস কক্ষে এসে প্রবেশ করল।

দুড়ুম!—

অব্যর্থ নিশানা বিপ্লবীর হাতের ব্যর্থ হলো না!

বুলেট গিয়ে গার্লিকের বক্ষ বিদ্ধ করলো: রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ বিচারপতি মুহূর্তে এলিয়ে পড়লো বিচারাসনের উপরেই।

একটা হৈ চৈ গোলমাল সুরু হয়ে যায়, ঘটনাস্থলে ঐ সময় একজন শ্বেতাঙ্গ সার্জেণ্ট, একজন কনেষ্টবল ও একজন গোয়েন্দা বিভাগের দারোগা উপস্থিত ছিল, তারাও সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছুঁড়তে সুরু করে বিপ্লবীকে লক্ষ্য করে।

কিন্তু জীবন্ত বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না ওরা, পটাসিয়াম সায়ানাইড্ খেয়ে নিমেষে যুবক স্বেচ্ছায় প্রাণ দিল।

মৃত বিপ্লবীর দেহ সার্চ করে জামার পকেটে একটুকরো কাগজ পাওয়া গেল:

তুমি ধ্বংস হও. দীনেশকে যে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছো, তাহার এই শাস্তি!

বিমল গুপ্ত

গার্লিকের বক্ষরক্তে দীনেশ ও রামকৃষ্ণের হত্যা-তর্পণ এতদিনে বুঝি অনুষ্ঠিত হলো।

২১শে আগষ্ট ঢাকার কমিশনার মিঃ এ, ক্যাসেলের উপরে টাঙ্গাইলের কো-অপারেটিভ কার্যালয়ে একজন বিপ্লবী গুলি চালায়। কিন্তু কমিশনার বাহাদুর দৈবগতিকে অক্ষত থেকে যায়।

বিপ্লবী যুবকটি উধাও হ'য়ে যায়।

উক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক দিবস বাদে ৩০শে আগষ্ট আবার চট্টগ্রাম শহরে অগ্নস্ফুলিঙ্গার দেখা দিল বিপ্লবীর দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র মুখে।

উন্মুক্ত খেলার মাঠে ফুটবল ফ্যাইনাল ম্যাচ খেলা চলেছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটা হবে।

বহু দর্শক আজ এসেছে খেলার মাঠে এবং উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীরাও অনেকে এসেছে খেলা দেখতে। তাদের মধ্যে এসে বসেছে কুখ্যাত, অত্যাচারী শয়তান পুলিশ ইনেস্‌পেক্টার এবং ঐ সময়কার ভারপ্রাপ্ত গোয়েন্দা কর্মচারী বহু দুষ্কৃতির হোতা জনাব আসাহুল্লা।

জনাব আসাহুল্লা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে তার বহু অত্যাচার ও দানবীয় কুকীর্তির জবাবদীহির সময়টি ঘনিয়ে এসেছে ঐদিন ঐখানেই। তার মৃত্যুলিপি স্বাক্ষরিত হ'য়ে গিয়েছে।

মৃত্যুদণ্ডাদেশ নিয়ে অদূরে জনসমুদ্রের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে গুলি ভর্তি পিস্তল নিয়ে এক কিশোর বালক : শ্রীমান হরিপদ ভট্টাচার্য।

দুম্! দুম্!...

সহসা অগণিত দর্শকজনকে সচকিত ও বিমূঢ় করে হরিপদর হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্র মৃত্যু গর্জন করে উঠ্‌লো। শয়তানের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহ মুহূর্তে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

কিন্তু সতর্ক পুলিশ প্রহরীদের ও জনতার ভিড়ের মধ্যে বালক হরিপদ পালাবার পথ করে নিতে পারল না। আগ্নেয়াস্ত্র সহ হরিপদ সরকারের করতলগত হলো।

গ্রেপ্তারের সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ দানবীয় উল্লাসে বালক হরিপদর দেহের উপরে একদফা তাণ্ডব নৃত্য করল। তারপর জেলের মধ্যেও হাত পা বেঁধে লোক-চক্ষুর অন্তরালে আরো কয়েক দফা চালান হয় নিষ্ঠুর হৃদয় বিদারক অত্যাচার বালকের সুকুমার দেহের উপর।

কিন্তু একটি কথাও, একটি প্রতিবাদও এত অত্যাচারে উচ্চারিত হয়নি সেদিন নির্ভীক সেই বালকের কণ্ঠ হতে।

মাষ্টারদার নির্দেশ যে সে অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে।

আর ত তার কোন ক্ষেদ নেই, কোন দুঃখ নেই!

সে ত জানতই :

প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে<br>
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে!

অত্যাচারে অত্যাচরে, চরম পাশবিক নিষ্ঠুরতম পীড়নে বালকের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও মুখ হতে রুধির নির্গত হয়ে সর্ব দেহ তার সিক্ত করে দিল।

তবু নিশ্চুপ!

ধন্য তুমি মাষ্টারদা! ধন্য সূর্য সেন!

কি মন্ত্র তুমি দিয়েছিলে ঐ সুকুমারমতি বালকের শ্রবণবিবরে তা তুমিই জান!

দুর্ধর্ষ পুলিশও সেদিন চমকিত হয়েছিল বৈকি এক কিশোর বালকের দেশপ্রেম ও দেশপ্রীতির নিষ্ঠার চরম ও অভূতপূর্ব বিকাশ দর্শনে!

ভারতের লৌহশিশু দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ।

যথাসময়ে বিচার প্রহসন সুরু হলো: বিচারে হলো হরিপদর প্রাণদণ্ডাদেশ। পরে হাইকোর্টে আপীলে—পুনরাদেশ হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড।

শ্বেতাঙ্গের ভারত শাসনের ইতিবৃত্তের পাতায় জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ও হিজলীর হত্যাকাণ্ড চিরদিন তাদের শ্বেতাঙ্গীয় বর্বর নীতির স্বাক্ষর দেবে।

১৬ই সেপটেম্বর—১৯৩১ সনের লাল তারিখটি দেশবাসী কোন দিনও ভুলবে না।

মেদিনীপুর জেলায় খড়্গপুর স্টেশন হ'তে প্রায় দেড় মাইল দুরে অবস্থিত হিজলী নামক স্থানকে এক সময় শ্বেতাঙ্গ সরকার জেলার সদর করবে বলে মনস্থ করায় অনেকগুলো বাড়ি নির্মাণ করে।

পরে সদরের স্বপ্ন নিয়ে তৈরী সেই বাড়ীগুলোই পরিণত হয় বন্দীশালায়।

কর্মকুশল, ন্যায়নিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ সরকার গায়ের জোরে বিনা বিচারেই ছয়শত ভারতবাসীকে হিজলী বন্দী নিবাসে অন্তরীণাবদ্ধ করে রেখেছিল।

১৯৩১য়ে যখন এক অমানুষিক হত্যাকাণ্ডে হিজলীর মাটি রক্তরাঙা হয়ে উঠেছিল তখন প্রায় আড়াইশত বন্দী ঐখানে অন্তরীণ ছিল।

ভদ্র সন্তান তারা। শিক্ষিত মার্জিতরুচি প্রত্যেকে।

চোর ডাকাত নয় তারা—তাদের অপরাধ ছিল দেশপ্রেম! দেশকে তারা অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে এই অপরাধেই তাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল বিনা বিচারে কেবল মাত্র তাদেরই মনের বিকৃত সন্দেহে।

বন্দীদের দৈনিক খোরাকীর ব্যবস্থা ছিল সর্বসাকুল্যে এক টাকা দশ আনা। অবশ্য কাপড়-চোপড়ের জন্য তাদের আলাদা করে কিছু টাকা দেওয়া হতো।

সাধারণ মানুষই তারা, সাধু বা যোগী নয় যে দিনের পর দিন আত্মীয়

পরিজন ছেড়ে একটা চতুষ্কোণ বাড়ির মধ্যে বন্দীজীবন আনন্দের সঙ্গে যাপন করবে।

মিঃ বেকার সিভিলিয়ান হলেও সে কথাটা বুঝতেন সেই কারণেই প্রথম দিকে কিছুকাল বন্দীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় ছিল। কিন্তু কয়েকটি ঘটনায় ঐ সদ্ভাবটুকু আর বজায় রইলো না।

বন্দীনিবাসের নিয়ম ছিল বন্দীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'য়ে হাসপাতালে গেলে ডবল অর্থাৎ সোয়া তিন টাকা খোরাকী পেত। ঐ কারণেই ও হাসপাতালের কিছুটা শুদ্ধ আবহাওয়ার ও সুব্যবস্থার জন্য বোধহয় বন্দীদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হলেই হাসপাতালে যাওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠ্‌তো।

কর্তৃপক্ষ ভাবলেন বন্দীদের ওটা একটা অন্যায় অজুহাত সৃষ্টি করা ছাড়া আর কিছুই নয়; বন্দী যারা তাদের আবার অসুখ কি! কি অন্যায় সত্যিই ত!

কর্তৃপক্ষ এরপর হতে সুরু করলো বন্দীদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলেও সহজে হাসপাতালে পাঠাতে অনিচ্ছা ও জিদ প্রকাশ।

এই হলো উভয় পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল কারণ।

দ্বিতীয় কারণ হলো বন্দীদের মাসিক খরচা কর্তৃপক্ষ কমিয়ে দেওয়ায়।

বন্দীদের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলতে লাগল।

ভিতরে ভিতরে তারা গুমরাতে লাগল।

আরো একটি স্ফুলিঙ্গ সংযোজিত হলো—আলীপুরের জজ মিঃ গার্লিক নিহত হবার পর হিজলী বন্দী-নিবাসকে বন্দীগণ কর্তৃক আলোকসজ্জায় সুসজ্জিত করার ব্যাপারটাকে কেন্দ্র করে।

কর্তৃপক্ষ কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন তুললো: এ সবের অর্থ কি! What do you mean!

বন্দীরা জবাব দিল: ডালহাউসী স্কোয়ার বোমার মামলায় হাইকোর্টের আপীলে অনেকে মুক্তি পেয়েছে, তাদেরই সম্মানার্থে এই আলোকসজ্জা!

কর্তৃপক্ষ স্পষ্টই বুঝলো সত্য তা নয়।

মনের ভিতরের আগুন দ্বিগুণ হয়ে উঠ্‌লো।

১৫ই সেপ্টেম্বর বন্দী দীনেশ সেনকে হিজলী বন্দী-নিবাস থেকে বক্সা বন্দী-নিবাসে স্থানান্তরিত করা হয়—বিদায়ের সময় রাত্রে সহবন্দীরা দীনেশ সেনকে বন্দী-নিবাসের মেইন গেইট পর্যন্ত পৌছে দিতে যায়।

প্রহরীরা দিল বাধা কিন্তু ওরা বাধায় কর্ণপাত করলে না।

কিছু বচসা হলো পরস্পরের মধ্যে।

স্পষ্টই চাঞ্চল্য দেখা গেল প্রহরীদের মধ্যে।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাত্রে কয়েকজন বন্দী বাইরের কম্পাউণ্ডের মধ্যে পায়চারী করছিল। তাদের সঙ্গে আবার প্রহরীদের ঐ সময় কিছু বচসা হলো।

প্রহরীদের আক্রোশ-বহ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়লো।

এতদিনকার চাপা আগুন সহসা দপ্ করে শত শিখায় লেলিহ হ'য়ে উঠ্লো।

পূর্বাহ্ণেই তারা ঐ মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ময়মনসিংবাসী একজন মুসলমান হেড্ কনেস্টবল সহসা তার হস্তধৃত রাইফেলটা উচিয়ে চীৎকার করে উঠ্লো: হুকুম মিল গিয়া। শালালোক্‌কো মার ডালো।

দেখতে দেখতে চারপাশ থেকে সেপাইদের হাতের অগ্নিনালিকা অগ্নুদ্গার সুরু করে দিল।

দুম্! দুম্!...দুম্! দুম্!...

বীভৎস, তাণ্ডব, নারকীয় সে দৃশ্য।

নিষ্ঠুর পৈশাচিকতায় মুহূর্তে বন্দীনিবাসটি বন্দুকের শব্দে, ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে, নিরীহ নিরস্ত্র বন্দীদের রক্তে ও আর্তকাতর শব্দে যেন নরকখানায় পরিণত হলো।

নৃশংস বেপরোয়া গুলি চালনার ফলে শতাধিক নিরীহ, নিরস্ত্র বন্দী আহত হলো।

শহীদ সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত আপন আপন বক্ষরক্তে হিজলীর মাটী রাঙা করে সেইখানেই মৃত্যুমুখে ঢলে পড়লো।

হৈ হৈ পড়ে গেল চারিদিকে!

মেদিনীপুর থেকে শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডগলাস্ সাহেব, খড়্গপুর থেকে কমাণ্ডান্ট্ মিঃ বেকার, পুলিশ সুপার, ইনেসপেকটার প্রভৃতি অবিলম্বে এসে হিজলী বন্দীনিবাসে হাজির হলো।

শ্বেতাঙ্গ ডগলাস মহাপ্রভু ত এসেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে চেয়ারের উপরে উপবেশন করলো এবং সোজা টেবিলের পরে পা তুলে দিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললে: বেকার, তুমি একেবারে ছেলেমানুষ, এদের অত্যাধিক আদর দিয়েছো।

বাহবা নন্দলাল! সাবাস!

আশ্চর্য কিছুই নয়।

কারণ, কথিত আছে দয়ার অবতার কোন এক দেশবিশ্রুত শ্বেতাঙ্গ একজন পথের ভিক্ষুককে শ্রীচরণের আঘাত হেনে বলেছিলেন : These street dogs, do you think they have got any life !

অতএব ডগলাস সাহেবের মুখে সন্দেহক্রমে ধৃত ও বন্দী ভারতীয়দের রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ হতে দেখে অমন স্বর্গীয় উক্তি উচ্চারিত হবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে।

বেকার বোধ হয় একটু বুদ্ধিমান ছিল বললে, Exchange our Posts, you will see !

বেশী দিন নয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই শ্বেতাঙ্গ ডগলাসকে বক্ষরক্ত দিয়ে ভারতের সে রক্তঋণ শোধ করতে হয়েছিল।

Tooth for a tooth ! Eye for an Eye !

এদিকে কলকাতা থেকে, শ্রীসুভাষ, দেশপ্রিয় যতীন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা হিজলীতে গিয়ে চাক্ষুষ সব ব্যাপারটা দেখবার জন্য হাজির হলেন।

শ্বেতাঙ্গ সরকার আহত ঐ অন্তরীণ দেশপ্রেমিকদের বিপক্ষেই তোড়জোড় করে একটি মামলা সুরু করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল কিন্তু ইনেসপেক্টার আলতাফ্ আলী ও আলিপুরের পাব্লিক প্রসিকিউটার নগেন বাড়ুয্যের অসমর্থনের জন্য একপ্রকার বাধ্য হয়েই সরকারকে চুপ করে যেতে হলো।

অতঃপর একটি বিভাগীয় তদন্ত হলো। তদন্ত করলেন, জাষ্টিস্ সত্যেন্দ্রচন্দ্র মল্লিক ও ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ড্রামণ্ড।

তদন্তে স্থির হলো—আসামীদের ব্যবহার সময় সময় উত্যক্তজনক ছিল বটে, তবে বেপরোয়া গুলি চালান খুবই অন্যায় হয়েছে।

আহা ! সাধু ! সাধু ! তোমার মহিমা বর্ণিতে অপার।

১৭ই দ্বিপ্রহরে হাওড়া ষ্টেশনে দুই শহীদ তারকেশ্বর ও সন্তোষের মৃতদেহ নিয়ে আসা হলো। কেওড়াতলার শশ্মানঘাটে তাদের শেষ কৃত্য করা হয়।

২৬শে সেপটেম্বর কলকাতার গড়ের মাঠে লক্ষাধিক লোকের জনসভায়

হিজলী বন্দীনিবাসের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি দিলেন জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ সমস্ত দেশের হ'য়ে।

কবি বললেন :

প্রথমেই বলে রাখা ভাল, আমি রাষ্ট্রনেতা নই ; আমার কর্মক্ষেত্র রাষ্ট্রিক আন্দোলনের বাইরে। কর্তৃপক্ষের কৃত অন্যায় বা ত্রুটি নিয়ে সেটাকে আমাদের রাষ্ট্রিক খাতায় জমা করতে আমি বিশেষ আনন্দ পাইনে। এই যে হিজলীর গুলি চালনা ব্যাপারটি আজ আমাদের আলোচ্য বিষয়, তার শোচনীয় কাপুরুষতা ও পশুত্ব নিয়ে যা কিছু আমার বলবার সে কেবল অবমানিত মনুষ্যত্বের দিকে তাকিয়ে।

যেখানে নির্বিবেচক অপমান ও অপঘাতে পীড়িত হওয়া দেশের লোকের পক্ষে এত সহজ, অথচ যেখানে যথোচিত বিচারের ও অন্যায় প্রতিকারের আশা এত বাধাগ্রস্ত, সেখানে প্রজারক্ষার দায়িত্ব যাঁদের পরে সেই সব শাসনকর্তার এবং তাদেরই আত্মীয়-কুটুম্বের শ্রেয়োবুদ্ধি কলুষিত হবেই এবং সেখানে ভদ্রজাতীয় রাষ্ট্রবিধির ভিত্তি জীর্ণ না হয়ে থাকতে পারে না।

* * *

প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করা রাজার পক্ষে কঠিন না হ'তে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকার নিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে, তখন তাকে নিরস্ত্র করতে পারে কোন শক্তি ?

•

উপসংহারে শোকতপ্ত পরিবারবর্গের নিকট আমাদের আন্তরিক বেদনা নিবেদন করি এবং সেই সঙ্গে একথাও জানাই যে, এই মর্মভেদী দুর্যোগের একটা সম্পূর্ণ অবসান হলেও সকল দেশবাসী ব্যথিত স্মৃতি দেহমুক্ত আত্মার বেদীমূলে পুণ্য শিখায় উজ্জ্বল দীপ্তি প্রদান করবে।

ওদিকে তখন—

কাকোরী মামলার অভিযুক্তের দল যারা হিন্দুস্থান রিপাব্লিক এসোসিয়েশন গঠন করে দেশের মুক্তি সাধনায় এগিয়ে চলেছিল—রামপ্রসাদ, আসফাকউল্লা ও ঠাকুর রোশেন সিং প্রভৃতির ফাঁসীতে সেই দলের নেতৃত্ব নতুন করে এসে চন্দ্রশেখর আজাদের স্কন্ধে অর্পিত হয়।

কাকোরী মামলা থেকেই চন্দ্রশেখর আজাদ সরকারের অভিযুক্তের তালিকায় স্থান পেয়েছিল কিন্তু বহু চেষ্টা করেও সরকার চন্দ্রশেখরকে ধরতে সক্ষম হয় নি।

ফেরার অবস্থাতেই চন্দ্রশেখর কিছুকাল ভগৎ সিং প্রভৃতিকে নিয়ে নতুন ভাবে দল গঠন করে মুক্তি সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল।

ঐ দলেরই পরিচালনায় কয়েকটি লুণ্ঠন ও ১৭ই ডিসেম্বর সাণ্ডার্স হত্যাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়।

ডালকুত্তার দল দ্বিগুণ উৎসাহে চন্দ্রশেখরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয় এরপর।

অবশেষে ১৯৩১এর ২৭শে ফেব্রুয়ারী এলাহাবাদ নগরীর এলফ্রেড্ পার্কে গুপ্তচর মুখে পূর্বাহ্ণেই সংবাদ পেয়ে চন্দ্রশেখরকে ধরবার চেষ্টায় চারিদিক থেকে পার্কটি ঘিরে ফেলল লাল পাগড়ীর দল।

সুরু হয়ে গেল উভয়পক্ষে অগ্নিনালিকা মুখে গুলি বিনিময়।

একজন শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্মচারী গুরুতর রূপে আহত হলো।

কিন্তু বিপ্লবী চন্দ্রশেখরকে ধরতে পারল না শ্বেতাঙ্গের অনুচর।

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে,
কে বাঁচিতে চায়।
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় রে
কে পরিবে পায়।

চিরমুক্ত চিরস্বাধীন বিদ্রোহী আপন আগ্নেয়াস্ত্রের মুখে বক্ষ্য পেতে হাসতে হাসতে মৃত্যুকে বরণ করে দেশ জননীর পায়ে শেষ প্রণাম জানিয়ে গেল।

আবার কবির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি:

ওরে হতভাগ্য দেশ, তাঁদের স্মরণ করি মৃত্যুদীক্ষা লহ,
নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার॥

নমস্কার!

ওগো মহাপ্রাণ
সার্থক হউক তব
এ মহাপ্রয়াণ—

এদের স্মরণ করে মনে হয় চিরদিন যেন বলতে পারি।

সার্থক জনম আমার
জন্মেছি এই দেশে—

কুমিল্লার তদানীন্তন কুখ্যাত অত্যাচারী পুলিশ সুপার শ্বেতাঙ্গ মিঃ এলিসনেরও আসাহুল্লার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মৃত্যু পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হয় বিপ্লবী চক্রের সিদ্ধান্তে।

জালালাবাদ সমরাঙ্গণের অন্যতম দুঃসাহসী সৈনিক বিনোদ দত্ত মহানায়ক সূর্য সেন—মাষ্টারদার নির্দেশে গোপনে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে কুমিল্লায় গিয়ে সেখানকার দলটিকে পুনরুজ্জীবনের ভার নেয়।

কুমিল্লার বিপ্লবী সঙ্ঘের নেতারূপে বিনোদ দত্ত সঙ্ঘের অন্যতম কর্মী শৈলেশ রায়ের উপরে এলিসন নিধনের ভার দিল তুলে।

একটা গুলি ভর্তি পিস্তল শৈলেশের হাতে তুলে দিয়ে বিনোদ দত্ত বললে: এই পিস্তল! এলিসনের বক্ষরক্ত চাই!

নিঃশব্দে আজ্ঞা প্রতিপালনে অগ্রসর হলো শৈলেশ।

শৈলেশকে পূর্বাহ্নেই এলিসনের গতিবিধি সম্পর্কে যথোপযুক্ত নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বিপ্লবী চক্র হতে।

পথের বাঁকে রিভলভার হাতে শৈলেশ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

ঠিক সময়েই দেখা গেল এলিসন সাইকেলে চেপে ঐ পথেই আসছে।

গুলির সীমানার মধ্যে এলিসন সাইকেলে এসে পৌছানর সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীর হস্তধৃত পিস্তল অগ্নি ঝলকে মুখর হয়ে উঠ্‌লো।

মুহূর্তে এলিসনের মৃতদেহ রক্তাপ্লুত হয়ে সাইকেল থেকে মাটির উপরে লুটিয়ে পড়ল।

অনেক অনুসন্ধান করেও ডালকুত্তার দল এলিসনের প্রাণদণ্ডকারীর সন্ধান করতে পারে নি। এবং উক্ত ঘটনার মাত্র কয়েক দিবস পরেই—

ঢাকায় আবার অগ্নি ঝলক দেখা দিল বিপ্লবী সরোজ গুহ ও রমেন ভৌমিকের মুষ্টিবদ্ধ আগ্নেয়াস্ত্র মুখে।

সরোজ গুহ চট্টগ্রাম যুব অভ্যুত্থানের একজন পলাতক সৈনিক। চট্টগ্রাম সহরের উকীল শ্রী নন্দলাল গুহর পুত্র।

ঐ সময় পলাতক নিরুদ্দিষ্ট সরোজ গুহ সম্পর্কে সরকারী ঘোষণা ছিল ৫০০৲ টাকা পুরস্কার।

চট্টগ্রাম থেকে সরোজ গোপনে পলায়ন করে একেবারে ঢাকায় চলে যায়।

সেখানে গিয়ে নোয়াখালির বিপ্লবী রমেন ভৌমিককে সঙ্গে নিয়ে ঢাকার জেলা মেজিষ্ট্রেট মিঃ ডুর্ণোর নিধনকল্পে প্রস্তুত হয়।

ডুর্ণোকে ওরা দু'জনে ছায়ার মত সর্বত্র আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় অনুসরণ করে ফিরতে থাকে।

অবশেষে এলো সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এক অপরাহ্ন বেলায়।

শ্বেতাঙ্গ পুঙ্গব ডুর্ণো এক মদের দোকান থেকে যখন বগলে মদের বোতল নিয়ে খোস মেজাজে নির্গত হয়ে পথের উপরে এসে তার নিজের অপেক্ষমান গাড়ীর পাদানীতে পা দিয়েছে দুম্ দুম্ শব্দে গুলি ছুটে এলো।

আহত রক্তাক্ত ডুর্ণো মাটিতে পড়ে গেল—বিপ্লবীরা ডুর্ণোকে মৃত জেনে চকিতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কিন্তু ডুর্ণোর কৈ মাছের প্রাণ, বুলেটও সে হজম করে বেঁচে উঠ্‌লো।

পুলিশ আততায়ীর কোন সন্ধানই করতে পারল না এবং সেই আক্রোশে দীর্ঘদিন ধরে ঢাকা সহরবাসীর উপরে যে নির্মম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হয় ভাষায় তা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য! একমাত্র শ্বেতাঙ্গের অভিধানেই পৃথিবীতে তার নজির পাই!—

নিজহাতে সৃষ্টিধর সাগরের কিনারে স্বর্গদ্বারে বিনয়ের চিতা শয্যা প্রস্তুত করে দিল।

একে একে সকলেই চলে যাচ্ছে।

প্রথম যৌবনে হাত ধরাধরি করে সকলে পথে এসে নেমেছিল: কণ্টকাকীর্ণ পথে পথে দীর্ঘদিন ধরে সেই চলা। কত লাঞ্ছনা, ক্লেশ অপমান; দুঃসহ দুঃখের হোমানলে প্রতিটি দিন ও রাত্রির সেই দীর্ঘ দুস্তর অসমাপ্ত সাধনার ইতিবৃত্তের পাতাগুলো যেন স্মৃতির আকাশ পটে উড়ে উড়ে চলেছে।

সন্তোষ, নীলাঞ্জন, বিনয়, দিদি—হিরণ্ময়ী !

দিদি আর তার বড় আদরের মা-হারা ছোট ভাইটি নীলাঞ্জন।

আজ কেন যেন বার বার ঐ নীলাঞ্জনের কথাই মনে পড়ছে।

হিরণ্ময়ী, নীলাঞ্জন, সন্তোষ আর মৃণাল!

জীবনের সেই দীর্ঘ পরিচ্ছেদটা ওদের চারজনকে নিয়ে যেন ভরে আছে।

আজই রাত্রের ট্রেণে সতীকে সঙ্গে করে সৃষ্টিধর কলকাতায় ফিরে যাবে।

আশ্চর্য মেয়ে ঐ সতী !

কাল থেকে এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলে নি।

মেয়েটা যদি একটু প্রাণ খুলে কাঁদতও, বুকের ভিতরের নিরুদ্ধ বেদনার বোঝাটা হয়ত একটু হালকা হতো।

পিয়ন এসে দাঁড়াল বারান্দায়, বাবু চিঠি !

'চিঠি।—'

বিস্মিত সৃষ্টিধর পিওনের হাত থেকে চিঠিটা নিল।

বহু ডাকঘরের ছাপে কণ্টকিত হ'য়ে অনেক ঘুরে ঘুরে চিঠিটা এসেছে।

শেষ রিডাইরেকটেড হ'য়ে এসেছে কলকাতার মেস থেকে।

চিঠিটা খুলে ফেললে সৃষ্টিধর।

মৃণাল! মৃণাল চিঠি লিখেছে।

তোমার মনে আছে কিনা আজও আমাকে জানি না। তবে তুমি বলেছিলে যদি কোন দিন শোন যে স্বামী পুত্র নিয়ে আমি সুখের সংসার গড়েছি তখন একদিন আসবে। দেখতে আসবে। অন্তরের শুভেচ্ছা জানাতে আসবে !

কতদিন তোমার ঠিকানা খুঁজেছি কিন্তু জানতে পারিনি। কেউ বলতে পারেনি।

কাল হঠাৎ আমার স্বামীর মুখে তোমার সংবাদ পেয়ে দেশের বাড়ীর ঠিকানায় তোমাকে এই চিঠি লিখছি। একবার এসো।

আমার স্বামীকে হয়ত তুমি চিনতে পারবে। বর্তমানে তিনি কৃষ্ণনগরে ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ! এ, এন্, মুখার্জী !

ইতি: মৃণাল।

জজ্ এ, এন মুখার্জী। রায় অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী বাহাদুর !

নামটা অত্যন্ত চেনা চেনা বলে মনে হচ্ছে কেন।

হাঁ, মনে পড়েছে। মনে পড়েছে। ঠিক্ !

বহরমপুরে একদা ঐ ভদ্রলোকটিই জজ সাহেব ছিলেন।

এবং ওরই এজলাসে জেল থেকে পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে সেণ্ট্রির রাইফেলের গুলিতে আহত হ'য়ে ধরা পরে নীলাঞ্জনের পুনর্বিচার হয়।

অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জীরই বিচারে নীলাঞ্জনের ফাঁসীর হুকুম হলো ও যথাসময়ে বহরমপুর জেলেই তার ফাঁসী হ'য়ে গেল।

আপীল করা হয়েছিল কিন্তু জাস্‌টিস্ মুখার্জীর সুসংবদ্ধ জোরালো রায়ের স্বপক্ষেই হাইকোর্টের বিচারপতিদ্বয় রায় দেন।

আশ্চর্য!

মৃণাল! আজও নিরুদ্দিষ্ট বিপ্লবী সন্তোষের বোন মৃণাল রায়বাহাদুর জাস্‌টিস্ মুখার্জীর স্ত্রী!

কেমন করে সম্ভব হলো।

সৃষ্টিধর যে কাহিনীটুকু জানত না।

সরকারকর্তৃক ধৃত হয়ে সন্তোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হওয়ার কিছুদিন পরেই সন্তোষ সেই যে জেল থেকে পালায় আজও সে নিরুদ্দিষ্ট এবং সেই ঘটনার পরই সন্তোষের বিধবা জননী গাঁয়ে আর টিকতে পারলেন না।

বাধ্য হয়েই তাঁকে মেদিনীপুরে তার ভাইয়ের বাসায় অনূঢ়া কন্যাটির হাত ধরে এসে উঠ্‌তে হলো।

মৃণালের মামা অবিনাশ চৌধুরী তখন মেদিনীপুরের গভর্ণমেণ্ট প্লিডার।

প্রথমটায় অবিনাশ বাবু ত বোনকে গৃহে স্থান দিতে কিছুতেই রাজী হন নি: পুত্র যার সন্ত্রাসবাদী, বিপ্লবী—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিত হবার পর জেল থেকে পলাতক—তার মা নিজের মায়ের পেটের বোন হলেও তাকে বাড়ীতে স্থান দেওয়া মুস্কিল বৈকি।

বিশেষ করে সরকারের পৃষ্ঠপোষক ও খয়ের খাঁ হ'য়ে।

কিন্তু বাদ সাধলেন অবিনাশ বাবুর মা কারণ বৃদ্ধা তখনও জীবিতা ছিলেন।

কোন অজুহাতেই তিনি নিজের গর্ভজাত কন্যাটিকে তাড়িয়ে দিতে পারলেন না।

এবং অবিনাশ বাবুর স্ত্রীও মৃণাল ও তার বিধবা মাতাকে স্থান দেওয়ার পক্ষপাতী থাকায় শেষ পর্যন্ত এক প্রকার অনিচ্ছার সহিতই অবিনাশবাবু বোন ও ভাগ্নীকে নিজের গৃহে স্থান দিলেন।

অমর মুখার্জী ঐ সময় ঐখানকার জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট এবং তখনও অবিবাহিত।

অদ্ভুত মৃণালের রূপের খ্যাতি শীঘ্রই অমর-জননীর কর্ণে গিয়ে প্রবেশ করল এবং তারই চেষ্টায় ও ইচ্ছায় মৃণালের সঙ্গে একদিন অমর মুখার্জীর বিবাহও হয়ে গেল।

এতদিনে অনিশবাবুও যেন আরামের নিঃশ্বাস নিতে পারলেন।

মৃণালের জননী কন্যার স্বষ্টিধর সান্যালের প্রতি দুর্বলতার কথাটা জানতেন। তাই প্রথমটায় তাঁর বিশেষ ভয় ছিল হয়ত কন্যা এই বিবাহে মত নাও দিতে পারে।

কিন্তু আশ্চর্য! একান্ত শান্ত ভাবেই মৃণাল সমস্ত আয়োজন ও অনুষ্ঠানকে যেন মাথা পেতে নিল। এবং আরো আশ্চর্য স্বামীগৃহে যাবার প্রাক্কালে বেশ হাসতে হাসতেই সে সকলের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছিল।

মা। মৃণালের মা কিন্তু ঐ দিনই যেন একটু ভীত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব কিছুই নিঃশব্দে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল।

মৃণাল স্বামীর গৃহে চলে গেল।

এবং সেই যে মৃণাল স্বামীর গৃহে গেল আর দ্বিতীয়বার সে আজ পর্যন্ত মা'র কাছে ফিরে আসে নি।

মৃণালের মা বহুবার চেষ্টা করেও একটি ঘণ্টার জন্যও কখনো মেয়েকে নিজের ঘরে নিজের কাছে আর আনতে পারেন নি।

অথচ একমাত্র পুত্র সন্তোষ ও একটি মাত্র কন্যা মৃণাল যে তার কত বড় স্নেহের ধন ও আদরের বস্তু ছিল তা তিনিই জানতেন।

কৃষ্ণনগর থেকেই মৃণাল চিঠিটা লিখেছে মাসখানেক আগের তারিখে।

সতীর পাশাপাশি স্বষ্টিধরের আজ মৃণালকে যেন নতুন করে মনে পড়ছে।

মৃণাল আর সতী।

বাঙ্গলা দেশেরই দুটি মেয়ে।

সতীর সর্বাঙ্গে আজ বিধবার বেশ! একটি রাত্রের সিঁথির সিন্দুর তার রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই মুছে দিয়েছে নির্মম ভাগ্যবিধাতা। সমাজের নিষ্ঠুর হাত মুছে দিয়েছে বটে সীমন্তের সিন্দুরটুকু কিন্তু তার সীমন্ত জুড়ে যে অদৃশ্য রক্তরাগ স্বয়ং প্রেমের দেবতা এঁকে দিয়েছেন এখনো তা রক্তের মতই রাঙা হ'য়ে আছে। এবং চিরদিন থাকবেও।

কারো সাধ্য নেই তা মুছে দেয়।

সে দাগ, সে রক্ত চিহ্ন ত' মুছবার নয়।

সূর্যাস্তের পরও পশ্চিমাকাশে অস্তরাগের মতই সে চির সত্য ও চির ভাস্বর।

আর মৃণাল!

মৃণাল অনেক দিনই ত' সৃষ্টিধরের জীবনাকাশ থেকে অস্ত গিয়েছে।

যৌবনবসন্তের সে পুষ্পোৎসব কবে কোন যুগে ফুরিয়ে গিয়েছে, তবে কেন আজ শীতের হাওয়ায় ঝরা পাতার রিক্ততায় সে অতীত বসন্তের সকরুণ স্মৃতি নিয়ে অশ্রু মোচন।

যাক! অবশিষ্টটুকুও মুছে যাক।

তবু! হাঁ, তবু একটিবার যেতে হবে সৃষ্টিধরকে মৃণালের ওখানে।

কথা দিয়েছিল যে সে! কথা তার রাখতে হবে বৈকি!

প্রত্যয়ের পাপে কেন সে লিপ্ত হবে।

সতীকে বীরুর ওখানে পৌঁছে দিয়েই সৃষ্টিধর কৃষ্ণনগরে যাবে।

সতীর আখ্যায়িকা শেষ হয়েছে এইবার মৃণালের আখ্যায়িকাও শেষ হোক।

কত দেরী আর পনেরই আগস্টের।

বছর আষ্টেকের একটি সুন্দর ফুট্ ফুটে ছেলে জজসাহেবের কম্পাউণ্ডে একটা খেলার এয়ারগান নিয়ে অদূরে একটা শিশুগাছের মোটা গুড়িতে টার্গেট্ প্র্যাকটিস্ করছিল।

বেলা তখন সাড়ে নয়টা হবে।

একটি হিন্দুস্থানী আয়া কাচের গ্লাসে দুধ নিয়ে বালকটির পশ্চাতে দাঁড়িয়ে বারংবার অনুরোধ জানাচ্ছে: খোকাবাবু দুধ পি লেও!

বালকের সেদিকে কিন্তু খেয়ালই নেই সে টার্গেট্ প্র্যাক্‌টিস্ নিয়েই ব্যস্ত।

সৃষ্টিধর গেটের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

বালকটির হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী চেহারা সৃষ্টিধরকে আকর্ষণ করেছিল।

'খোকাবাবু!—'

'দেখ্ জানকীয়ার মা!' বীর বালক এয়ারগান্ হাতে ফিরে দাঁড়াল:. 'ফের তুই আমাকে বিরক্ত করবি ত' তোকে এক গুলিতে খতম্ করে দেবো!—'

'বাস্! বাস্—গোলি করো লেকেন দুধ ত' পি লেও!—'

'জানিস্ আমার হাতের aim কখনো miss করে না! মরতে তোর ভয় করে না! আমি বিপ্লবী সৃষ্টিধর সান্ন্যালের শিষ্য—'

'হাঁ! আরে বাপ্ মরণে কো কোই নেই ডরাতা!—'

'খোকা!'

সৃষ্টিধরের ডাকে চকিতে বালক ফিরে দাঁড়াল এবং গম্ভীর মুখ করে বললে: আমার নাম খোকা নয়, সত্যপ্রিয় মুখার্জী!

'সত্যপ্রিয় মুখার্জী!' সৃষ্টিধর ততক্ষণে বালকের একেবারে নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে: 'সুন্দর নাম! তোমার বাবার নাম কি সত্যপ্রিয়!'

'শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ মুখার্জী!'

'তোমার বাবা বাড়ীতে আছেন?'

'হাঁ। এখুনি ত' অফিস যাবেন! কিন্তু আপনি কে?'

'তুমি ত আমাকে চিনবে না সত্যপ্রিয়! তোমার মা আমাকে চেনেন!'

'মাকে আপনি চেনেন! আমার মাকে—'

'হাঁ! তোমার মাকে বলোগে সৃষ্টিধর সান্ন্যাল—'

সৃষ্টিধরের কথাটা শেষ হলো না, হর্ষোৎফুল্ল কণ্ঠে সত্যপ্রিয় বলে ওঠে: আপনি! আপনিই মাষ্টারদা! যাই আমি মাকে বলি গে—

বালক সত্যপ্রিয় একপ্রকার ছুটতে ছুটতেই বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

একটু পরেই সুন্দরমত একজন ভদ্রলোক সত্যপ্রিয়র সঙ্গে সঙ্গে এসে উপস্থিত বাইরে।

'কি আশ্চর্য! আপনি বাইরে এখনো দাঁড়িয়ে কেন সৃষ্টিধর বাবু! আসুন! আসুন—ভিতরে আসুন।'

এসে হাত ধরে সাদরে টেনে নিয়ে ভদ্রলোক সৃষ্টিধরকে সোজা একেবারে অন্দরের দিকে চললেন।

'কোথায় গেলে মৃণাল! দেখো এসে এই যে তোমার মাস্টারদাকে ধরে এনেছি!—'

পাশের ঘর থেকে স্বামীর ডাকে মৃণাল বের হয়ে এলো।

অবাক বিস্ময়ে সৃষ্টিধর মৃণালের দিকে তাকিয়ে থাকে।

লাল চওড়া পাড় একটি মিলের শাড়ী পরিধানে: প্রত্যূষে বোধ হয়

স্নান সারা হ'য়ে গিয়েছে : ঘোমটার ফাঁক দিয়ে ভিজে চুলের গোছা বক্ষের পাশ দিয়ে নেমে এসেছে।

কপালে রক্ত সিন্দুরের টিপ।

সীমন্তে সিন্দুর।

নিঃসংকোচে ধীর শান্ত পদে এগিয়ে এসে মৃণাল স্থষ্টিধরের পায়ের কাছে নত হয়ে প্রণাম করতে করতে বললে : ভাল আছেন মাষ্টার দা !

'তুমি ভাল আছোত' মৃণাল !—'

'হাঁ !—'

আবার মৃণালের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায় স্থষ্টিধর।

মৃণাল যেন আরো অনেকটা লম্বা হয়েছে এই কয় বৎসরে !

রোগা কৃশ চেহারা।

কিশোরী সে মৃণাল কই !

নিরুদ্ধ যৌবনা এই মৃণালই কি অতীতের সেই তন্বী কিশোরী মৃণাল !

'উঃ মশাই কম কষ্টে কি আপনার পাত্তা যোগাড় করেছিলাম !—' ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, তাছাড়া যত ওকে বলি আমি হচ্ছি সে যুগের এক কুখ্যাত বিচারক, তোমার স্থষ্টিধরবাবুর মত একজন বরেণ্য পূজ্য বিপ্লবী আমার ঘরে ডাকলেই বা আসতে চাইবেন কেন ! তা সে শোনে কি আমার কথা ! কিন্তু নাঃ, এখন দেখছি ওরই জিত হয়েছে, আমারই হার !—'

'যাও ত তুমি তোমার কাজে—' তরল অনুযোগ জানায় মৃণাল স্বামীকে।

'ও এখন বুঝি মনের মানুষকে পেয়ে এই চির অনুগত লোকটার কথা একেবারেই ভুলে গেল—'

'আঃ থামত তুমি ! চলুন, আমার ঘরে চলুন—'

অভিভূতের মতই স্থষ্টিধর মৃণালের পিছু পিছু তার শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল।

সত্যপ্রিয় এতক্ষণ মার আঁচল ধরে সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরছিল, মৃণালের সেদিকে লক্ষ্য ছিল না এখন ঘরে প্রবেশ করে পুত্রকে স্নেহে কাছে টেনে নিয়ে স্থষ্টিধরকে ইংগীত করে বললে, 'খোকন ! ইনিই তোমার সেই মামা ! যাকে তুমি ঘুমাবার আগে রোজ রাত্রে স্মরণ করে প্রণাম জানাও !—'

'চিনেছি মামণি !—' ছেলে সকৌতুকে বলে।

'হাঁ বাবা ! প্রণাম করেছ—'

সত্যপ্রিয় এগিয়ে এসে নীচু হ'য়ে সৃষ্টিধরকে প্রণাম করতে যেতেই সৃষ্টিধর সস্নেহে মৃণালের ছেলেকে বুকের উপরে তুলে নিয়ে নিবিড়ভাবে চেপে ধরলো : 'থাক বাবা !'

'নামিয়ে দিন ! মামণি আমাকে খোকন বলে ডাকলেও আমিত্ত আর ছোট্টটি নই।...'

'সত্যি।—'

হাসতে হাসতে সৃষ্টিধর সত্যপ্রিয়কে নামিয়ে দিল।

'মামণি বলেন আপনার হাতের গুলী নাকি কখনো miss করে না ! আপনি বুঝি খুব ভাল গুলী চালাতে জানেন ? কিন্তু কই, আপনার পিস্তল কই ?—দেখান না পিস্তলটা।—'

'পাগল ছেলে, পিস্তল আমি কোথায় পাবো ! পিস্তলত' আমার নেই—'

'বাঃ, আপনি আমাকে দেখাবেন না তাই। সত্যি বলছি, দেখান না আপনার পিস্তলটা !—আমি জানি, মামণি সব কিছু আমাকে বলেছেন, ইংরাজ জেলেও আপনাকে ধরে রাখতে পারে নি। ধরতে পারলে আপনার ফাঁসী হবে। রাত্রে শুয়ে শুয়ে তাই ভগবানকে ডেকেছি কেউ যেন কোনদিন না আপনাকে ধরতে পারে—'

সৃষ্টিধরের চোখেও বুঝি জল এসে যায় !

ভারতের ভবিষ্যত কি আজ এমনি করেই সত্যপ্রিয়র মত ঘরে ঘরে জন্ম নিয়েছে।

কানাই, সত্যেন, বাঘাযতীন, ভগৎ সিং, রামপ্রসাদ, সূর্য সেন এরা কি মরেনি !

এই সব সত্যপ্রিয় হয়েই কি তারা আবার আমাদের মধ্যে ফিরে এসেছে।

বিদ্রোহী ভারতের তপস্যা আজও শেষ হয়নি সত্য, কিন্তু শেষ হবে যদি এমনি সব সত্যপ্রিয়ের দল ঘরে ঘরে জন্ম নেয়।

ওরে হতভাগ্য দেশ, তাদেরে স্মরণ করি মৃত্যু-দীক্ষা লহ,
নবাগত হে সাধক, বিগত সাধকদলে কর নমস্কার।

সত্যিই সৃষ্টিধর যেন চোখের জল রোধ করতে পারে না।

ইচ্ছা করে যেন চেঁচিয়ে বলতে এই মুহূর্তটতে, মৃণাল ! মৃণাল সত্যিই তুমি বেঁচে আছো আজো এই সৃষ্টিধরের পাষাণ বুকখানার মধ্যে।

হঠাৎ সত্যপ্রিয়র কথায় আবার সৃষ্টিধর চমকে ওঠে : বাবা কোথায় গেল মামণি! বাবাকে এ ঘরে আসতে দিও না। বাবা হয়ত মামুকে ধরিয়ে দেবে ইংরাজের হাতে—

মৃণালের দু'চোখের কোণেও জল ভরে আসে।

'না সত্যপ্রিয়, আর তোমার বাবা আমাদের ধরবেন না!—'সৃষ্টিধর বলে ওঠে।

'ফাঁসি দেবে না?—'

'না!—'

'ও, ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ স্বাধীন হচ্ছে সেই জন্য বুঝি?—'

'হাঁ।—'

'এবারে তুমি বাইরে যাও খোকন, খেলা করগে—' মৃণাল ছেলেকে বলে।

'না মামণি, আমি যাব না—'

'থাক না ও এখানে মৃণাল।—'

'না, আপনি ক্লান্ত। ঐ দেখ, আপনাকে এখনো চা পর্যন্ত এনে দিলাম না এক কাপ।—' দ্রুতপদে মৃণাল কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে গেল।

নিষ্পলক দৃষ্টিতে সৃষ্টিধর মৃণালের গমন পথের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মৃণাল!

মনে পড়ছে সকলকে আবার—দিদি, হিরণ্ময়ী, নীলাঞ্জন, বিনয়, বীরু, সতী, সন্তোষ, মৃণাল!

বিদ্রোহী ভারতের মাটিতে এক একটি অগ্নিস্ফুলিংগ যেন।

অমৃত সন্ধানীর দল!

এদের শেষ নেই, এদের মৃত্যু নেই! সংগ্রামেরও এদের সমাপ্তি নেই!

সত্যিই এদের শেষ নেই!

আরো আছে। আরো অনেক পৃষ্ঠা বাকী বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের। ১৯৩১য়ের ২রা অক্টোবর উল্টাডিঙ্গি ক্যানেল ওয়েষ্ট রোডে একদল বিপ্লবী কৈলাশচন্দ্র সনাতন পালের গদি থেকে আগ্নেয়াস্ত্রর মুখে, সিন্দুক থেকে ৩০০৲ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালায়। কিন্তু পলায়নের সময় তাদের গাড়ী গর্ত্তের মধ্যে পড়ে যাওয়ায় বিপ্লবীরা ধৃত হয়।

উক্ত ব্যাপারকে কেন্দ্র করে সরকার মামলা শুরু করে—অভিযুক্ত করা হয়

শ্রীযুক্তা বিমলপ্রতিভা দেবী, প্রফুল্ল ভট্টাচার্য, ধীরেন চৌধুরী, কালিপদ রায় ও নরহরি সেনকে।

১৯৩১—১৪ই ডিসেম্বর রায় দেওয়া হয়, ধীরেন চৌধুরীর ও কালিপদর পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাবাস, নরহরি সেনের তিন বৎসর, বাকী দু'জন মুক্তি পান।

২৮শে অক্টোবর আবার ইউরোপীয়ান সভার সভাপতিকে বিপ্লবীরা গুলি করে হত্যা করলো।

স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ যে আগুন ভারতের মাটিতে অত্যাচারে ও পীড়নে জ্বেলেছিল তারই মুহুর্মুহু অগ্নিঝলকে ভারতের এক প্রান্ত হতে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ঝলসে পুড়ে যেতে লাগল।

ব্রিটিশ-সিংহ তার সমস্ত শক্তি দিয়েও তাকে যেন কোন মতেই রোধ করতে সক্ষম হয় না।

পৌনে দুইশত বৎসরের পুঞ্জীভূত অত্যাচারের হিসাব নিকাশ একের পর এক চলতে লাগল অব্যাহত।

১৫ই ডিসেম্বর আবার কুমিল্লায় বিদ্রোহীর হাতের পিস্তল অত্যাচারের বিরুদ্ধে অগ্নুদ্গার করল।

এবারে এগিয়ে এলো দু'টি কিশোরী।

রাণী দুর্গাবতী, রাণী ঝান্সীর দেশের দুটি মেয়ে।

শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী।

কুমিল্লা ফয়জুন্নেশা গার্লস স্কুলের শান্তি ও সুনীতি ছিল ছাত্রী।

তাদেরই দেশের সোনা ভাইয়েরা একের পর এক প্রাণ দিচ্ছে, বোন তারাই বা কেমন করে ঘরে বসে থাকে!

দুরাশার ডাক তাদের কানেও এসে পৌছাল।

নির্জন শান্ত গৃহকোণ ছেড়ে তারাও বের হয়ে এলো: ঝলকে উঠ্‌লো হাতের আগ্নেয়াস্ত্র: জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শ্বেতাঙ্গ স্টিভেন্সয়ের প্রাণহীন রক্তাক্ত দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল;

বিচারে শান্তি ও সুনীতির হলো যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

বিপ্লব ও সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কতকটা পাল্লা দিয়েই যেন সরকারের দমননীতি ও স্বৈরাচার বেড়ে চলেছিল। ২৯শে অক্টোবর একটি ও ৩০শে নভেম্বর আর একটি অর্ডিনান্স সরকার দেশে জারী করে।

এদিকে দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠ্‌তে লাগল।

তথাপি সরকারী চাপে পড়ে প্রাণের দায়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্পাদনের পর হ'তে দেশের হতভাগ্য কৃষকের দল তাদের সাধ্যমত খাজনা দিয়েই আসছিল।

শেষ সম্বলটি দিয়েও শেষ পর্যন্ত হতভাগ্যের দল যখন সরকারী রাঘব-বোয়ালের হাঁ'কে ভরাট করতে পারলে না তখন উপায়ান্তর আর না দেখে সরকারের দয়াপ্রার্থী হলো তারা বাকী অবশিষ্ট খাজনা মকুবের জন্য।

অত্যাচারী সরকার কিন্তু ভিজল না তাতে, কর বন্ধ হবার আশঙ্কায় কৃষক সমিতি ও কৃষক সম্মেলন দমনে তারা হলো বদ্ধপরিকর।

পণ্ডিত জওহরলাল ও মিঃ সেরওয়ানীকে কারারুদ্ধ করল সরকার এবং ১৪ই ডিসেম্বর আর একটি অর্ডিনান্স পাশ করে কৃষক আন্দোলন ও করবন্ধ প্রচেষ্টা বে-আইনী বলে ঘোষণা করে দিল।

জওহরলাল ও সেরওয়ানী মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য বোম্বাই অভিমুখে রওনা হলেন। কিন্তু পথিমধ্যেই সরকার ঐ দুই দেশনেতাকে গ্রেপ্তার করে যথাক্রমে দু'বৎসর ও ছয় মাসের জন্য কারারুদ্ধ করলো। লাল জামা বা কোর্তা পরিধান করবার জন্য সীমান্ত গান্ধী আব্দুল গফুর খাঁর খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে লালকোর্তা বাহিনী বলেও অভিহিত করা হতো। ওয়ার্কিং কমিটি ১৩ই আগস্টের অধিবেশনে উক্ত খোদাই খিদমতগার বাহিনীকে কংগ্রেসের অংগীভূত করে নেয়।

ঐ বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা আব্দুল গফুর খাঁ ও তদীয় ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেবকেও সরকার ঐ বৎসরেই কারাগারে প্রেরণ করল।

২৮শে ডিসেম্বর শূন্য রিক্ত হস্তে মহাত্মা গোলটেবিল প্রহসন হ'তে ভারতে বোম্বাই নগরীতে পদার্পণ করলেন।

## —চার—

বিদ্রোহী ভারতের রক্তাক্ষরে লিখিত ইতিবৃত্তের, বিদগ্ধ—অগ্নিদগ্ধ আর একটি সাল পার হ'য়ে গেল।

১৯৩১ সাল।

সপ্তকোটি পরাধীন ভারতবাসীর আরো একটি বেদনাবিক্ষুব্ধ বৎসর—তিনশত পঁয়ষট্টি দিন রক্ত ঢালা সংগ্রামের স্বাক্ষর হ'য়ে রইলো।

এগিয়ে এলো নতুন বর্ষের নতুন দিন—১৯৩২ সাল।

পুরাতনকে বিদায় দিয়ে নতুনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে উঠুক কোটি কোটি বক্ষের বেদনাবিক্ষুব্ধ আশা আর আকাঙ্খা।

চাব না পশ্চাতে মোরা, মানিব না বন্ধন ক্রন্দন,
হেরিব না দিক্,
গণিব না দিনক্ষণ, করিব না বিতর্ক বিচার—
উদ্দাম পথিক।
মুহূর্তে করিব পান মৃত্যুর ফেনিল উন্মত্ততা
উপকণ্ঠ ভরি—
খিন্ন শীর্ণ জীবনের শতলক্ষ ধিক্কার লাঞ্ছনা
উৎসর্জন করি॥

১৯৩১য়ের ২৯শে অক্টোবর সরকার বাহাদুরের অন্যতম অর্থহীন দমন নীতির নতুন আইন বেঙ্গল অর্ডিনান্স্ পাশ হয় অর্থাৎ প্রয়োগ সুরু হয়।

সে অর্ডিনান্সের বলে জজ্ ও জুরীর সহায়তা ছাড়াও ডাকাতি, হত্যা প্রচেষ্টা প্রভৃতি অপরাধ বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেটদের বিচার করবার অধিকার বা ক্ষমতা (power) দেওয়া হয়; যে কোন মুহূর্তে, যে কোন স্থানে যে কেউকে মাত্র সন্দেহের জন্য অন্তরীণে আবদ্ধ করবার ক্ষমতাও ম্যাজিষ্ট্রেটরা প্রাপ্ত হলো, এবং যে কোন স্থানে পাইকারী জরিমানা আদায় করবার ক্ষমতাও দেওয়া হয়।

এক কথায় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুররা জনসাধারণের দণ্ডমুণ্ডের হর্তা-কর্তা হয়ে দাঁড়ান।

এক রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর।

বেঙ্গল অর্ডিনান্স যখন পাশ হয় মহাত্মা তখন লণ্ডনে ছিলেন।

অর্ডিনান্সয়ের সংবাদ পেয়ে মহাত্মা লিখে পাঠালেন ব্যথিত কাতর চিত্তে।

The Bengal ordinance of 1931 is more ghastly than that of 1925. It reminds us of the Sepoy Mutiny and the Amritsar Massacre of 1919.

একমাত্র সিপাহী বিদ্রোহের পর শ্বেতাঙ্গ প্রভু ও তস্য প্রতিনিধিদের বেপরোয়া নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও ১৯১৯য়ের পাঞ্জাবে জালিওয়ালানাবাগের বীভৎস ব্যাপক ও নিষ্ঠুর হত্যালীলার সঙ্গে সরকারের নতুন ঐ আইনটির তুলনা করা চলতে পারে।

আরো তিনি বলেছিলেন: কি সর্বনাশ! হত্যা করা হয় নাই কেবল চেষ্টা হইয়াছে মাত্র, তারও দণ্ড মৃত্যু!···ইহাতে যে কেবল মূল্যবান জীবনই নষ্ট হইবে তাহা নহে, সমগ্র জাতিটাকেই পঙ্গু করিবার উদ্দেশ্যে অর্ডিনান্সের ধারা-গুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

মহাত্মাজী দেশে প্রত্যাবর্তন করে বেঙ্গল অর্ডিনান্স এবং যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্রবর্তিত কয়েকটি অর্ডিনান্সও প্রত্যাহার করবার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড উলিংডন বাহাদুরকে বিনীত অনুরোধ জানালেন।

যা হবার তাই হলো: কোন সুরাহাই হলো না।

অতঃপর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে পুনরায় সত্যাগ্রহ করাই স্থিরীকৃত হলো।

সরকারও নবোদ্যমে বেপরোয়া লাঠি চালনা ও ব্যাপক খানাতল্লাসী এবং যথেচ্ছা ধরপাকড় সুরু করে দিল অত্যুৎসাহে।

দলে দলে সত্যাগ্রহী ও সংগ্রামীরা ফিরিঙ্গীর আইনে কারারুদ্ধ হতে লাগল।

মাত্র বার দিনের মধ্যে ভীত ত্রস্ত সরকার ২২৭টি সমিতিকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করলে। অত্যাচার ও পীড়ন এত অধিক হতে লাগল যে সুদূর সাগর পার হ'তে মনীষী রোমা র‍্যলাঁ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক প্রতিবাদের জন্য সকলকে উৎসাহিত করলেন।

১৯৩২য়ের গোড়া হতেই এক প্রকার কংগ্রেসের সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ শক্তির পুরো-পুরি সংঘর্ষ সুরু হয়ে গেল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা পূর্ব হতেই প্রস্তুত ছিল—কিন্তু প্রস্তুত

ছিল না কংগ্রেস মহল। তাই অতর্কিতে ঐ শ্বেতাঙ্গের তাণ্ডব নৃত্য সুরু হওয়ায় তারা যেন বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল।

কিন্তু দেশের অন্য মুক্তি সংগ্রামীর দল—কণ্টকক্ষত রক্তাক্ত পথে যাদের চলাচল সেই দুর্ধর্ষ বিপ্লবীর দল তারা শঠ প্রতারক সরকারকে পুরোপুরিই চিনেছিল। তাই তারা একটি মুহূর্তের জন্য তাদের সংগ্রামকে থামায় নি।

তাদের হাতের রক্ত মশালের আলোয় ভারতের দিগন্ত আবার রক্তরাঙা হয়ে উঠ্‌লো।

অগ্নি নালিকা মুখে বজ্রাগ্নি ঝলক্ দিতে লাগল পূর্বের মত।

এবং অগ্নি বালক বাংলার মাটিতে দেখা দিল।

১৯৩২য়ের ৬ই ফেব্রুয়ারী কলকাতার বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবের মধ্যেই বিপ্লবী এক দুঃসাহসিকা ২১ বৎসর বয়স্কা তরুণীর হস্তধৃত আগ্নেয়াস্ত্র অগ্নুদ্গার করল।

সমাবর্তন উৎসবে সভাপতি ছিল বাংলার তদানীন্তন শ্বেতাঙ্গ গভর্নর স্যার স্ট্যানলে জ্যাকসন।

ছাত্রী বীণা দাসই সেই দুঃসাহসিক কার্যের নায়িকা।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বীণার লক্ষ্য ব্যর্থ হলো, গভর্নর অক্ষতই রইলো এবং বীণা দাস অকুস্থানেই ধৃত হলো। দেহ তল্লাস করে পিস্তল ও কিছু কার্তুজ আবিষ্কৃত হলো।

বিচার সুরু হলো বীণা দাসের ট্রাইবুন্যাল গঠন করে, বিচারপতি মন্মথনাথ মুখার্জী, চারুচন্দ্র ঘোষ ও মহিমচন্দ্র ঘোষকে নিয়ে।

সরকারের ৩০৭ ধারা দণ্ডবিধি ও অস্ত্র আইনের ১৯ এফ্ ধারায় বিচারে বীণা দাসের প্রতি নয় বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হলো।

ঐদিকে তখন চট্টগ্রামে সরকারের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাও প্রায় সমাপ্ত হ'য়ে এসেছে।

দীর্ঘ দিন ধরে বিচার প্রহসন চালাবার পর ১৯৩২য়ের ১লা মার্চ প্রহসনের সমাপ্তি ঘোষিত হলো। সকাল ৯টায় একজন সার্জেণ্ট এসে গম্ভীরভাবে বন্দী বিদ্রোহীদের সম্বোধন করে বললে: তোমাদের এখুনি ৩ নং কয়েদী ব্যারাকের দোতালায় যেতে হবে।

ওরাও প্রস্তুত হয়েই ছিল বললে: চল।

জোড়ায় জোড়ায় বিদ্রোহীদের হাতকড়াবদ্ধাবস্থায় দোতালার ব্যারাকে এনে জড়ো করা হলো।

অতঃপর বিচারক ইউনি ঘোষণা করল গম্ভীর কণ্ঠে সকলের প্রতি দণ্ডাদেশের বিস্তৃত বিবরণ।

গনেশ ঘোষ, অনন্তলাল সিংহ, লোকনাথ বল, ফণী নন্দী, সুবোধ চৌধুরী, রণধীর দাসগুপ্ত, সুবোধ রায়, সহায়রাম দাস, লালমোহন সেন, সুখেন্দু দস্তিদার ও আনন্দপ্রসাদ গুপ্ত—প্রত্যেকের প্রতি দণ্ডাদেশ হলো যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ( ২৫ বৎসর )।

নন্দলাল সিংহ—দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

অনিলবন্ধু দাস—১৬ বৎসর বয়স হওয়ায় ৩ বৎসর বোরষ্টাল জেলে কারাদণ্ড।

এবং বাকী বন্দীদের প্রামানাভাবে মুক্তি দিয়েই সংগে সংগে আবার কুখ্যাত সরকারের নতুন অর্ডিনান্সের কবলে ফেলে ডেটিনিউ করা হলো।

বন্দীদের মিলিত কণ্ঠে বিচারালয় মথিত হ'য়ে উঠালো : বন্দেমাতরম্।

বন্দেমাতরম্!

বাইরে বসে নায়ক সূর্য সেন সবই শুনলেন এবং বুকখানা কাঁপিয়ে বোধ হয় তাঁর একটি দীর্ঘশ্বাস নির্গত হলো।

এবং সেই দীর্ঘশ্বাসের আগুন খুব শীঘ্রই চট্টলার আকাশকে আবার রক্তাক্ত করে তুলল।

কিন্তু তারও আগে ৩০শে এপ্রিল আবার মেদিনীপুরে এক তরুণ কিশোর বিপ্লবীর হাতে অগ্নিনালিকা অগ্নি গর্জনে হিজলীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তদন্তকারী ও ১৯৩২ সনের কংগ্রেসের আন্দোলনে সর্বতোভাবে দমনবিশারদ সদম্ভ, অত্যাচারী শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ আর, কে, ডগলাসের বক্ষ রক্তে প্রতিবাদ জানানো হলো।

যে তরুণ কিশোরের প্রচেষ্টায় বিপ্লবীর হাতে ৩০শে এপ্রিল আগ্নেয়াস্ত্র গর্জে উঠেছিল বিদ্রোহী ভারতের রক্তরাঙা পৃষ্ঠায় তার স্মৃতি চিরদিন রক্তাক্ষরেই লেখা থাকবে।

প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য।

মেদিনীপুরে আলিগঞ্জে রেভিন্যু এজেণ্ট ভবতারণ ভট্টাচার্যের চতুর্থ সন্তান প্রদ্যোৎ : দাসপুর থানার অন্তর্গত কংসাবতী নদীতটে অবস্থিত গোপালনগরে ১৯১৩—৩রা নভেম্বর শ্রীমান প্রদ্যোৎকুমারের জন্ম। প্রদ্যোৎয়ের মাতা ছিলেন পঙ্কজিনী দেবী। রত্নগর্ভা জননী।

১৯৩১ সালে হিন্দু স্কুল থেকে সসম্মানে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে মেদিনীপুর কলেজে অধ্যায়নরত ছিল প্রদ্যোৎ।

বড় চমৎকার চেহারা ছিল প্রদ্যোৎয়ের।

রূপ ও স্বাস্থ্য দিয়ে যেন ভগবান তাকে মাটির পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন কোন একটি মহৎ কার্যের উদ্দেশ্যেই।

মায়ের জন্ত বলি প্রদত্ত, চিহ্নিত জন্মবিপ্লবী!

সহপাঠি অমর চট্টোপাধ্যায়ই প্রদ্যোৎকে বিপ্লবী দলের মধ্যে নিয়ে যায় এবং ক্রমে প্রদ্যোৎয়ের মেদিনীপুরের তৎকালীন বিপ্লবী নেতা দীনেশ গুপ্তর সঙ্গে পরিচয় ও সৌহার্দ্য হয়।

১৯৩২ সনে সরকার আবার নতুন করে ভারতবাসীর উপরে দমননীতির প্রয়োগ সুরু করল। হতভাগ্য ডগলাস্ ছিল মেদিনীপুর শহরের তখন একজন চণ্ডনীতি ও অপকীর্ত্তির কংস।

কিন্তু কংস জানতে পারে নি যে তাহারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

বধের দিনটি ঘনিয়ে এলো।

১৯৩২—৩০শে এপ্রিল। ডিসট্রিক্ট্ বোর্ডের সভার কাজ চলছে, চেয়ারে আসীন বোর্ডের চেয়ারম্যান ডগলাস্।

অতর্কিতে মৃত্যুদণ্ড কক্ষে এসে প্রবেশ করল : প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশু দুইজন বিপ্লবী। প্রদ্যোৎয়ের রিভলভার থেকে গুলী নির্গত হলো না বার বার টিগার টেপা সত্ত্বেও। তখন প্রভাংশুর পিস্তল সক্রিয় হয়ে ওঠে।

গর্জে উঠ্‌লো অগ্নি ঝলকে আগ্নেয়াস্ত্র : দুড়ুম!

রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ ডগলাসের দেহ চেয়ারের উপরেই ঢলে পড়লো, প্রদ্যোৎ দৌড়াল।

সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে সকলে প্রদ্যোৎ ও প্রভাংশুকে তাড়া করে। নিমেষে প্রদ্যোৎ তার কর্তব্য স্থির করে নিয়ে রুখে দাঁড়াল উদ্যত পিস্তল হাতে অনুসরণকারীদের ; সেই ফাঁকে প্রভাংশু সকলের নাগালের বাইরে চলে গেল এবং ধরা পড়লো প্রদ্যোৎ।

থানাতল্লাসী করে প্রদ্যোৎয়ের পকেটে একটা কাগজের টুক্‌রা পাওয়া গেল তাতে লেখা ছিল :

ইহাদের মরণেতে বৃটিশরা বুঝুক।
আমাদের আহুতিতে ভারত জাগুক ॥

সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত প্রদ্যোৎকে থানায় নিয়ে আসা হলো।

বড় পরিশ্রান্ত বোধ করছিল প্রদ্যোৎ—বললে সে স্নান করতে চায়।

স্নানের পর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘটনার সম্পর্কে নানারূপ প্রশ্ন করায় বললে : কেন মিথ্যে এখন বিরক্ত করছেন। পরে আপনারা সবই জানতে পারবেন, আমার কাছে কোন কথা পাবেন না।

অনেক চেষ্টা ও অত্যাচার করেও প্রদ্যোৎয়ের নিকট হ'তে একটি কথাও সরকার জানতে পারল না।

অতঃপর খুনের ষড়যন্ত্র করা ও সহায়তা করার অভিযোগে দণ্ডবিধি ৩০২, ১২০ বি ও ৩০২-৩৪ ধারায় ট্রাইবুন্যাল গঠন করে প্রদ্যোৎয়ের বিচার প্রহসন সুরু হলো।

ট্রাইবুন্যালের প্রেসিডেণ্ট হলো কে, সি, নাগ, মিঃ ভুজগেন্দ্র মুস্তাফি ও জ্ঞানাঙ্কুর দে, আই, সি, এস। বিচারে জ্ঞানাঙ্কুর দে প্রদ্যোৎয়ের প্রাণদণ্ড দেওয়ার সপক্ষে না থাকলেও বাকী দু'জনের ইচ্ছায় ২৬শে জুন প্রদ্যোৎয়ের প্রাণদণ্ডেরই আদেশ হলো।

পরে হাইকোর্টে আপীল হলে, বিচারপতি মিঃ জ্যাক ও চারুচন্দ্র ঘোষ উভয়ে একমত হওয়ায় প্রাণদণ্ডাদেশই প্রদ্যোৎয়ের বহাল রইলো।

প্রদ্যোৎ জননী সরকার বাহাদুরের নিকট পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাইলেন কিন্তু ফল হলো না।

কিন্তু প্রদ্যোৎয়ের মনের মধ্যে কোথায়ও এতটুকু ভীতি বা আক্ষেপ ছিল না।

সদাহাস্য প্রশান্তচিত্ত কিশোর তরুণ সে যে জানত গীতার সেই বাণী।

বাসাংসি জীর্ণানি—

কেবল তার যা একটু দুঃখ ছিল মায়ের কথা ভেবে।

ক্রমে এগিয়ে এলো সেই যাত্রার লগ্ন।

শূন্য আকাশ পথে চির বিদায়ের ডাক এসে পৌছল: এসো। এসো মৃত্যুহীণ প্রাণ!

১৯৩৩—১২ই জানুয়ারী প্রত্যুষে ছয় ঘটিকার সময় নির্ভীক প্রশান্ত চিত্তে বিপ্লবী সৈনিক ফাঁসীর মঞ্চে দৃঢ় পদবিক্ষেপে এসে দাঁড়াল।

ডগলাস সাহেবের শূন্য সিংহাসনে তখন শ্বেতাঙ্গ জে, ই, জে বার্জ ম্যাজিষ্ট্রেট্ হয়ে এসে বসেছে। বার্জ উপস্থিত ছিল ঐ সময়টিতে।

সে প্রশ্ন করলো: 'Are you ready, Prodyot ?'

প্রদ্যোৎ তুমি প্রস্তুত ?

জবাব এলো সকলকে শুম্ভিত ও বিস্মিত করে: 'One minute please, Mr. Burge, I have something to say.'

'Yes, Speak out.—'

'We are determined Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnaporr. Yours the next turn, get yourself ready.—

প্রতিজ্ঞা কঠোর মোদের
সূচ্যগ্র মেদিনী নাহি দিব মোরা
হেথা কোন শ্বেতাঙ্গেরে।
ঐ হের আসিতেছে রক্ত কৃপাণ হস্তে
মৃত্যুর আমোঘ দূত—

একটি শ্বেতাঙ্গকেও আমরা থাকতে দেবো না এই মেদিনীপুরে। অতএব প্রস্তুত হও, এবারে তোমার পালা।

I am not afraid of death. Each drop of my blood will give birth to hundreds of Prodyots in all houses of Bengal.

বাংলার ঘরে ঘরে প্রদ্যোতের প্রতি রক্ত বিন্দুতে বিন্দুতে আবার নতুন করে প্রদ্যোৎয়ের দল জন্ম নেবে। কিসের শঙ্কা। কিসের ভয়।

আমরা মরবো না ভাই মরবো না।

Yes, Do your work please—

কই এবারে নিয়ে এসো তোমার রজ্জুর ফাঁস। কণ্ঠ আমার এগিয়ে দিলাম।

আর এক ফোঁটা রক্ত রক্ত-সমুদ্রে মিশিয়ে গেল।

পর পর দুইটি লুণ্ঠন হলো বিপ্লবীদের দ্বারা।

প্রথমটি ১৩ই মে তেজগাঁও ও ঢাকার মধ্যবর্তী স্টেশনে। টাকার পরিমাণ ছিল মোট ৩৮৬৫০৲। এবং দ্বিতীয়টি ঘটলো ২৯শে মে ময়মনসিংয়ের কমলপুরে কিশোরমোহন বণিকের গৃহে—টাকার পরিমাণ ৪০০০৲। প্রথমটির জন্য বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর সুধীর কুমার আচার্যের স্বীকারোক্তিতে বিচারে জ্যোতির্ময় সেনগুপ্তর সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হলো।

অন্য জন ধীরেন্দ্রচন্দ্র দে মামলায় মুক্তি পেলেও—অর্ডিনান্সের বলে অন্তরীণ বদ্ধ হলো।

দ্বিতীয় ঘটনাকে কেন্দ্র করে—মনীন্দ্র সেন, বীরেন্দ্র লাহিড়ী ও সুধাংশুকিরণ লাহিড়ীর—দশ বৎসর করে কারাদণ্ডাদেশ ও ভুবনমোহন চন্দ্র, জানকী দাস, হরিপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি ১৪ জনের সাত বৎসরের মেয়াদে কারাদণ্ডাদেশ হলো।

থেকে থেকে ভারতের আকাশে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ এমনি করেই দেখা দিতে লাগল।

গভর্ণমেণ্টের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ ও পর্য্যুদস্ত করে আবার চট্টলার আকাশে রক্ত মেঘ দেখা দিল।

১৯৩২য়ের ১৩ই জুন।

সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে বিপ্লবী-সূর্য—সূর্য সেন—মাষ্টার দা, তার সহকারী নির্মল সেন, অপূর্ব সেন তখন ধলঘাটে নবীন চক্রবর্তীর বাড়ীতে গোপনে আশ্রয় নিয়েছে।

১৩ই জুনের সেই স্মরণীয় রাতে প্রীতিলতাও এসে ঐ বাড়ীতে গোপন পরামর্শর জন্য জুটেছে।

দোতলার কোঠাঘরে বসেছে বিপ্লবীদের গোপন চক্র।

সহসা এমন সময় ক্যাঃ ক্যামেরন, পটিয়ার দারোগা মনোরঞ্জন বসু,

এস, আই শৈলেন, একজন হাবিলদার, দুইজন কনেস্টবল ও সাতজন সেপাহী সশস্ত্র হ'য়ে গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেয়ে ধলঘাটে বিপ্লবীদের আড্ডাটা ঘেরাও করে ফেললে।

চরম একটি মুহূর্ত রাত্রির অন্ধকারে ঘনিয়ে এলো।

কুত্তাগুলোর আগমন সংবাদে মুহূর্তে বিপ্লবীর দল পায়ে পায়ে উঠে দাঁড়ায়।

যে যার আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রস্তুত!

ঘেরাওকারীদের একদল ততক্ষণ নীচের কামরায় যেখানে নবীন তার স্ত্রী—পুত্র রামকৃষ্ণ ও কন্যা হেমলতা ছিল সেখানে গিয়ে প্রবেশ করল।

সকলে পুলিশ দেখে প্রমাদ গণে।

আর ওদিকে শ্বেতাঙ্গ ক্যাঃ ক্যামেরন সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠ্‌তে সুরু করেছে তখন।

সিঁড়িতে পদশব্দ বিপ্লবীদের কানে আসে।

শেষ ধাপে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিপ্লবীদের হাতের আগ্নেয়াস্ত্র ভীমগর্জন করে উঠ্‌লো!

দুম্! দুম্—দুদুম! দুম্!···ক্যাঃ ক্যামেরনের যুদ্ধ-সাধ মুহূর্তে মিটে গেল। রক্তাক্ত বিগতপ্রাণ দেহটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে পড়ে গেল।

সুরু হয়ে গেল উভয় পক্ষ থেকে প্রচণ্ড বেগে গুলী বর্ষণ!

নির্মল সেন একাকীই সম্মুখ সমর চালিয়ে যায়।

ঐ ফাঁকে দোতলা থেকে একটা মই ঝুলিয়ে মাস্টারদা ও প্রীতি—চতুর্দিকে অবিশ্রাম গুলী বর্ষণের মধ্যেই—নিচের অন্ধকারে গিয়ে আত্মগোপন করে।

কিছুক্ষণ অবিশ্রাম গুলী বর্ষণের পর পুলিশের দল হটে আসতে বাধ্য হয় এবং আরো অস্ত্র ও সৈন্য আনবার জন্য পটিয়ার দিকে একজনকে দ্রুত পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

গুলীবর্ষণের বিরতি।

অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে তখনও মাস্টার দা ও প্রীতিলতা অপেক্ষা করছে।

একটা করুণ গোঙানীর শব্দ প্রীতির কানে ভেসে এলো।

কার! কার যন্ত্রণাকাতর শব্দ!

নির্মলের! হাঁ, নির্মল সেনের।

প্রীতি ছটফট্ করে ওঠে: আমি উপরে যাই, দেখে আসি—নির্মল দা—

বাকা কথাটা প্রীতির শেষ হয় না, মাস্টারদা প্রীতির একখানা হাত চেপে ধরেন: না! তুমি কি ক্ষেপে গেল রাণী! চল, আর একটি মুহূর্তও আর এখানে নয়।

'মাস্টার দা—'

'না! না—'

ছিঃ রাণী! তুমি না বিপ্লবী! পশ্চাতের দিকে ফিরে তাকাবার তোমার কোন অধিকার নেই!

বিপ্লবীর চোখেত' শোকাশ্রু সাজে না।

যে গেল তাকে যেতে দাও।

এগিয়ে চল! এগিয়ে চল: সম্মুখে তোমার ঐ কণ্টকাকীর্ণ পথ, মৃত্যুর ঝঞ্ঝা!...বজ্রের হুংকার।

ঐ। ঐ তোমার পথ!

পরের দিন সকালে দ্বিগুণ একবাহিনী নিয়ে এসে'সরকারের দল দেখলো: সিঁড়ির নীচে ক্যাঃ ক্যামেরনের রক্তাক্ত গুলীবিদ্ধ মৃতদেহ, উপরের কক্ষে শহীদ নির্মল সেনের গুলীবিদ্ধ মৃত দেহ, এবং বাড়ির উত্তর-পূর্ব কোণায় শহীদ অপূর্ব সেনের মৃতদেহ গত রাত্রের খণ্ড প্রলয়ের সাক্ষ দিচ্ছে।

মাস্টারদা ও প্রীতির কোন সংবাদই কেউ পেল না।

নির্মল সেন—চট্টগ্রামের সশস্ত্র যুবঅভ্যুত্থানের অন্যতম নেতা। অসহযোগ আন্দোলনে কারাবাসের পর থেকেই তার বিদ্রোহী জীবনের সূত্রপাত।

সরকারের তালিকায় ঐ সময় তার মাথার দাম ধার্য হয়েছিল পাঁচ হাজার মুদ্রা।

গণেশ, লোকনাথ প্রভৃতি সহকারীর দল যখন সরকারের কারাগারে বন্ধ, সেই সময় নির্মল সেনই ছিল মাস্টার দার একমাত্র যোগ্য সহচর ও বন্ধু।

প্রীতির জীবনে নির্মল সেনের রেখাপাত প্রীতির নিজেরই স্বীকারোক্তিতে সুস্পষ্ট হয়ে ছিল: নির্মল দার মর্মান্তিক মৃত্যু আমায় গভীর ভাবে নাড়া দেয়— এরপর আমি মরিয়া হয়ে উঠ্‌লাম।

মৃত্যুর সময় নির্মল সেনের বয়স ছিল মাত্র ৩৫ বৎসর।

আর শহীদ অপূর্ব সেন—মৃত্যুর সময় বয়স ছিল তার মাত্র ১৫ বৎসর। এক নবীন কিশোর।

স্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র থাকতে পারলে না শান্ত নির্জন গৃহকোণে, স্বদেশের মুক্তির জন্য অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল বাংলার কিশোর মৃত্যুহীন!

এমনি করেই ধলঘাটের বুকে বিদ্রোহী-ভারতের ইতিহাসের আর একটি পৃষ্ঠা রক্তরঞ্জিন হয়ে রইলো চিরকালের জন্য, চিরদিনের জন্য।

১৩ই জুন পার হয়ে গেল এলো এবারে ২৬শে জুন।

বিশ্রাম নেই! বিপ্লবীর বিশ্রাম ত' নেই!

এবারে খুব কাছেই, চট্টগ্রামের কাছাকাছি আবার ঢাকা সহরের বুকে। আর এবারে বিপ্লবীর হাতের মৃত্যুদণ্ড নেমে এলো এক অত্যাচারী—দেশের শত্রু বাঙালী সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্—পরউচ্ছিষ্টলোভী কামাখ্যা সেনের মাথায় বজ্র গর্জনে।

দুরাচার কামাখ্যার গুণের অন্ত ছিল না,—একেবারে সাক্ষাৎ গুণমণি!

সরকার বাহাদুরের সরননীপুষ্ট আদুরে নীলমণি!

পাপের বোঝা হতভাগ্যের অনেক দিনের সঞ্চিত পাপেই ভারী হয়ে উঠেছিল।

এই দেশেরই একজন হয়ে দেশের লোকদের উপর অনেক অত্যাচারই সে অকুণ্ঠে চালিয়েছিল।

প্রহার, লাঠিবাজী, এমন কি নিজের দেশের মা বোনকেও কুৎসিত অপমান করতেও পশ্চাৎপদ হয় নি।

এমন কি দৈত্যকুলের ঐ হিরণ্যকশিপু সম্পর্কে তার প্রভুরা পর্যন্ত সন্ত্রস্ত সশঙ্কিত হয়ে উঠ্‌লো।

তাড়াতাড়ি তাকে তারা ছুটি দিয়ে দিল।

কিন্তু বিপ্লবীচক্রের বিচারে তখন তার চরম দণ্ডাজ্ঞা স্বাক্ষরিত হ'য়ে গিয়েছে।

মৃত্যুই যেন তাকে হাত ধরে ২৩শে জুন ঢাকায় টেনে নিয়ে এলো।

কামাখ্যা সেন ঢাকায় এসে সদর মহকুমার ম্যাজিস্ট্রেট্ শচীন্দ্র চ্যাটার্জীর বাড়ীতে আতিথ্য নিল।

২৬শে জুনের রাত্রি।

নিশ্চিন্ত আরামে কামাখ্যা শয্যায় নিদ্রিত।

খোলা জানালা পথে পা টিপে টিপে এলো মৃত্যু! অমোঘ অবধারিত।

গর্জে উঠ্লো আগ্নেয়াস্ত্র!

গুলির শব্দে বাড়ীর সকলে ঘরে এসে দেখলো কামাখ্যার মৃত রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটা শয্যার উপরে তার শত অত্যাচারের ঋণ শোধের শেষ সাক্ষ্য দিচ্ছে।

চারিদিকে সশস্ত্র পুলিশ সক্রিয় হয়ে উঠ্লো।

হতভাগ্য বিপ্লবী তার নিজের ভুলের জালে নিজেই জড়িয়ে পড়লো—পোস্ট অফিসে একটা টেলিগ্রাম করতে গিয়ে।

**Kamaksha's operation successful. No anxiety!**

মনোরঞ্জন তারটা পাঠাচ্ছিল ইচ্ছাপুরের "সারদা মেডিকেল হলের" সুরেশ গাঙ্গুলীর নামে।

পোস্ট অফিসের পর্তুগীজ কেরাণী রোজারিওর সন্দেহ হওয়ায় মনোরঞ্জনকে অপেক্ষা করতে বলে দ্রুত থানায় সংবাদ পাঠিয়ে দিল।

সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ এসে মনোরঞ্জনকে গ্রেপ্তার করল।

মনোরঞ্জনকে নিয়ে পুলিশ নানা স্থানে হানা দিয়ে অবশেষে ১৯ বৎসর বয়স্ক বিপ্লবী কালিপদ চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করল।

কালিপদ স্বীকারোক্তি দিল: আমার দেশের স্বার্থেই আমি কামাখ্যা সেনকে গুলি মেরে হত্যা করেছি। সে স্ত্রীজাতির প্রতি অত্যাচার করত, এতে আমি বড় ব্যথা পাই। এই খুনের জন্য কেউ দায়ী নয়—একমাত্র আমিই দায়ী। কেবল সন্দেহের উপরে নির্দোষী ব্যক্তিদের অকারণে ধরে অত্যাচার করা হচ্ছে বলে আমি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করলাম। কেউ আমাকে শিখিয়ে দেয় নি।

কালিপদর বিচার করলে শ্বেতাঙ্গ আদালত এবং দণ্ডাদেশ হলো ফাঁসী।

মৃত্যু! **To be hangged till death!**

নির্দিষ্ট দিনে কালিপদর অমর আত্মা বায়ুস্তরে মিলিয়ে গেল রক্তসাগরে আর একবিন্দু রক্ত দান করে।

বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে লাগল এমনি করেই থেকে থেকে।

কোথায় এর শেষ।

কোথায় এর সমাপ্তি!

তারপর এলো ৫ই আগস্ট: ফিরিঙ্গীদের পত্রিকা স্টেটসম্যানের কুখ্যাত সম্পাদক ওয়াটসনের উপরে এক তরুণ বিপ্লবী গুলি বর্ষণ করে কিন্তু অল্পের জন্য ওয়াটসন বেঁচে যায়। বিপ্লবীকে ধরেও ধরতে পারা যায় না—স্বেচ্ছায় কালকূট গ্রহণ করে সে মৃত্যুকে বরণ করে নেয়।

আগস্টের শেষাশেষি ২৮শে তারিখে আবার বিপ্লবীর হাতের অগ্নিনালিকা এক কুখ্যাত শ্বেতাঙ্গ পুলিশ সুপারকে লক্ষ্য করে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করে। কিন্তু ওয়াটসনের ন্যায় ঐ শ্বেতাঙ্গ সুপারও আহত হয়েও প্রাণে বেঁচে যায়। এবং বিপ্লবী বিনয়ভূষণ রায় ধৃত হয়।

শ্বেতাঙ্গর নাম মিঃ সি, এম্‌, গ্রাসবি।

গ্রাসবি ছিল ঢাকার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার।

বিচারে বিনয়ভূষণের প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ হয়।

আবার চট্টলা। ২৪শে সেপ্টেম্বর—১৯৩২।

চট্টলার বিদ্রোহীদের যেন বিশ্রাম নেই!

মহানায়ক মাস্টারদার নির্দেশক্রমে আবার এক বিরাট অগ্নিযজ্ঞ দেখা দিল।

এবারকার স্থান চট্টগ্রামের পাহাড়তলীস্থিত শ্বেতাঙ্গ নরনারীদের অন্যতম প্রমোদশালা—ক্লাব।

চারিদিকে চট্টগ্রামে তখন শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীদের অবর্ণনীয় নগ্ন বর্বর অত্যাচার চলেছে অবাধে।

পাহাড়তলীর বিপ্লবীদের দুরন্ত মৃত্যু অভিযান যেন তারই প্রত্যুত্তর।

তারই জবাব।

১৭ই সেপ্টেম্বর পুরুষের বেশভূষায় তিনজন লোককে ট্যাক্সিযোগে পাহাড়তলীর দিকে যেতে দেখা যায়। দেওয়ানহাটের নিকটে তাদের কথাবার্তা শুনে সরকারের এক উচ্ছিষ্টলোভীর মনে কেমন সন্দেহের উদ্রেক করে এবং আরো তার মনে হয় ওদের মধ্যে তিনজনই পুরুষ নয়, একজন নারী।

সত্যিই একজন নারী ছিল—চট্টগ্রামের অন্যতম দুঃসাহসিনী বিপ্লবী নায়িকা কল্পনা দত্ত।

সেই নরাধম ওদের অনুসরণ করল এবং তারই চেষ্টায় ওরা ধরা পরে। এবং কল্পনা জামিনে মুক্ত হ'য়ে নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেল সরকারের শ্যেন দৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে।

সে অভিযানের আসল উদ্দেশুটা বেশী দিন আর গোপন রইলো না—মাত্র সাত দিনের মধ্যেই ২৪শে চট্টগ্রামের চিরস্মরণীয়া বিপ্লবী নায়িকা সেই প্রীতিলতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ও ঘন ঘন বিপ্লবীদের হাতের অগ্নিনালিকার অগ্নিগর্জনে বিদ্রোহী ভারতের ১৯৩২য়ের ২৪শে আগস্টের রাত্রি চিরোজ্জ্বল হ'য়ে রইলো।

বিদ্রোহী বাঙ্গলার প্রথম নারী শহীদ প্রীতি-রাণী ছিল তদানীন্তন বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের অবিস্মরণীয় অগ্রদূতী!

মাস্টারদার শ্রেষ্ঠ কয়েকটি শিষ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ।শয্যা।

আশ্চর্য মাস্টারদা—সূর্য সেন।

বেছে বেছে পাহাড়তলী অভিযানের পুরোভাগে নেতৃত্ব তুলে দিলেন এক তরুণীর স্কন্ধে নিশ্চিন্ত স্থির বিশ্বাসে।

প্রীতির নেতৃত্বে আটজন তরুণ বিপ্লবী—২৪শে সেপ্টেম্বর রাত্রি দশ ঘটিকায় যখন চল্লিশ জন শ্বেতাঙ্গ নরনারী পাহাড়তলীর প্রমোদশালায় নৃত্য-গীত-পান ও ক্রীড়া উৎসবে মাতোয়ারা—সহসা তাদের উপরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গুলির শব্দ, ধোঁয়া, বারুদের গন্ধ ও আহতের আর্তনাদে মুহূর্তে শ্বেতাঙ্গের প্রমোদশালাটি যেন রক্তাক্ত এক রণক্ষেত্রে হলো পরিণত।

শ্বেতাঙ্গর দলও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা আক্রমণ চালাল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল বিপ্লবীরা প্রায় সকলেই পলাতক—আর এদিকে মিসেস্ সলিভান নিহত ও এগার জন সভ্য আহত।

আর! আর দেখতে পাওয়া গেল প্রমোদশালা হ'তে প্রায় একশত গজ দূরে মাটিতে পরে আছে পুরুষবেশে সজ্জিতা এক বাঙ্গালী তরুণীর গুলিবিদ্ধ ও রক্তাক্ত দেহ!

এবং তদন্তে আরো প্রকাশ পেল তরুণী তীব্র হলাহল পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে জীবন দিয়েছে।

কে ঐ তরুণী।

আমাদের প্রীতিলতা।

নির্মল সেনের শিষ্যা—রাণী।

মাস্টারদার প্রিয় শিষ্যা—প্রীতিলতা।

উভয়পক্ষের গুলিবর্ষণের ফলে প্রীতি আহত—গুরুতররূপে আহত হ'য়ে টলতে টলতে কিছুদূরে গিয়েই মাটিতে পড়ে গেল!

কিন্তু প্রাণ থাকতে শ্বেতাঙ্গের হাতে ধরা দেওয়া চলবে না।

এর চেয়ে মৃত্যুও ভাল।

সঙ্গে ছিল পটাসিয়াম সায়ানাইড।

নীলকণ্ঠের ন্যায় সেই বিষ সে কণ্ঠে তুলে নিল।

চট্টগ্রামেরই এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রীতির জন্ম।

বাড়ীর অবস্থা কোনদিনই খারাপ ছিল না ধনী না, হলেও বেশ স্বাচ্ছল্যই ছিল সংসারে।

চট্টগ্রামের খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয় হ'তে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'য়ে প্রীতি ঢাকায় ইডেন কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো।

সেখান হ'তে আই. এ কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে কলকাতায় গেল বেথুন কলেজে বি. এ পড়তে।

ঢাকায় অধ্যয়নকালেই প্রীতি দীপালী সঙ্ঘের সংস্পর্শে এসে মনের মধ্যে বিপ্লবের দীক্ষা পায়।

১৯৩১ সনে মে মাস থেকে জুলাই পর্যন্ত শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস যখন আলীপুর জেলের সেলে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে সেই সময় প্রীতি রামকৃষ্ণের ভগ্নীর পরিচয়ে সেখানে বহুবার যাতায়াত করে এবং রামকৃষ্ণর নিকট হতেই রাণী মৃত্যুমন্ত্রের প্রথম দীক্ষা নেয়।

তারপর রাণী আসে ১৯৩২য়ের মে মাসে শহীদ নির্মল সেন ও বিপ্লবী-সূর্য মাস্টারদার সংস্পর্শে।

অন্তরের অন্তঃস্থলে যে অগ্নিমন্ত্র এতদিন ধিকি ধিকি জ্বলছিল শত রক্তরঙিন শিখায় তার দেহ ও মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

নির্মল সেনের মৃত্যু সেই অগ্নিকে আরো লেলিহ করে তুলল।

এবং শেষ আহুতি হলো ২৪শে সেপ্টেম্বরের সেই দুর্যোগময়ী রাত্রির অন্ধকারে।

বাঙলার জোয়ান অফ আর্ক—বিপ্লবী নায়িকা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার ভারতের বিদ্রোহের ইতিবৃত্তের পাতায় একটি অবিস্মরনীয় অগ্নিস্ফুলিংগ!

ভারতের বিদ্রোহাকাশে আবার অগ্নিস্ফুলিংগ দেখা দিল।

১৯৩২য়ের ২৯শে অক্টোবর।

কলকাতা শহরের উপরে।

কলকাতা শহরে ৮০ নং ক্লাইভ ষ্ট্রীটে গিলেণ্ডার্স হাউসের উপরের তলায় বেলা সাড়ে এগারটার সময় শ্বেতাঙ্গ এসোসিয়েসনের প্রেসিডেণ্ট্ মিঃ ই, ভিলিয়াস্ মেসার্স লকহার্ট, মেলেঞ্চান ও মুলকের সঙ্গে যখন আলাপে রত, অতর্কিতে—পরিধানে কোট, ট্রাউজার ও মাথায় ফেজক্যাপ এক যুবকের আবির্ভাব ঘটলো ওদের সামনে। এবং অকস্মাৎ সেই যুবকের হাতে পিস্তল অগ্নুদগার করলো।

চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল।

যুবক ধৃত হলো আগ্নেয়াস্ত্র সমেত।

কে ঐ দুঃসাহসী যুবক!

বিমল দাশগুপ্ত—ইতিপূর্বে যে মেদিনীপুরে ম্যাজিস্ট্রেট্ পেডি হত্যার অভিযোগে ধৃত হয়ে পরে প্রমাণাভাবে মুক্তি পায়। বিমল বরিশাল জেলার বাসণ্ডা ঝালকাঠির অক্ষয় দাশগুপ্ত মহাশয়ের পুত্র।

৩১শে অক্টোবর ধৃত বিমলকে নিয়ে মামলা সুরু হলো ট্রাইবুনাল গঠন করে।

১২ই নভেম্বর রায় দেওয়া হলো : দশবৎসরের জন্ম সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ।

ঐ নভেম্বর মাসেই এক বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর—ফণী ঘোষকে বিপ্লবীরা হত্যা করে।

বিশ্বাসঘাতক ফণী একদা বিপ্লবীদের দলেই ছিল।

ফণীর অনেক কীর্তি! কীর্তিমান পুরুষ সে।

১৯৩০য়ে দ্বিতীয়বার লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় সরকার পক্ষের হয়ে সে সাক্ষী দেয়।

মৌলনীতে দ্বিতীয়বারের ডাকাতি মোকদ্দমায়ও সে রাজসাক্ষী হয়।

এবং মতিহারী ষড়যন্ত্র মামলা ও পাটনা ষড়যন্ত্র মামলায়ও কীর্তিধ্বজ রাজার পক্ষে সাক্ষ্য দেয় তৃতীয় দফায়।

বেতিয়াতে ঐ ফণীর একটা দোকান ছিল।

১৯৩২য়ের নভেম্বরের এক সন্ধ্যায় ফণী, গণেশপ্রসাদ ও অন্য এক ব্যক্তি যখন ফণীর দোকানে বসে খোসগল্পে মেতে আছে সহসা দুইজন বিপ্লবী ধারাল একটা ভোজালী হাতে সাক্ষাৎ যমের মত ফণীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিপ্লবীর হাতের ধারালো ভোজালী মুখেই দেশদ্রোহী ফণী তার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।

গণেশপ্রসাদকেও বিপ্লবীরা বাদ দেয় নি।

রক্তাক্ত আহত ফণী ও গণেশপ্রসাদ হাসপাতালে নীত হয়।

২০শে নভেম্বর গণেশ প্রসাদের ও ১৭ই নভেম্বর ফণীর মৃত্যু হয়।

দেশের জাতীয় কলঙ্ক এমনি করে ভোজালী মুখে সরান হলো।

উক্ত ঘটনার এক বৎসর পরে বৈকুণ্ঠ সুকুল ও চন্দ্রমা সিংহকে ঐ মামলায় জড়িত করে সরকার বাহাদুর উভয়েকেই চালান দেয় এবং ১৯৩৪—২৩শে ফেব্রুয়ারী T. Luby চন্দ্রমা সিংহকে মুক্তি দেয় ও বৈকুণ্ঠ সুকুলের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ হয়।

কিছুদিন গত না হতেই, ১৯৩২—২৮শে নভেম্বর রাজসাহীতে অগ্নিঝলক দেখা দিল আবার, রাজসাহী সেণ্ট্রাল জেলের জেলার চালর্স লুক যখন জেলের কমপাউণ্ড থেকে বের হ'য়ে রাস্তায় এসে সবে মাত্র নেমেছে অতর্কিতে গুলির শব্দ শোনা গেল।

আহত রক্তাক্ত অবস্থায় চালর্স সাহেব পড়ে গেল।

আহত অবস্থায় চিকিৎসার জন্য চালর্সকে কলকাতায় প্রেরণ করা হলো।

সরকার বাহাদুর সুকঠোর দমননীতির রজ্জুতে ফেলে, কারাবাস, গুলিবর্ষণ বর্বরোচিতভাবে প্রাণনাশ করেও বিদ্রোহী ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। আগুনের মতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জনগণের বুকে দিবানিশি জ্বলতে থাকে।

১৯৩৩য়ের ২রা ফেব্রুয়ারী স্যার হেনরী হেইগ যে বিবৃতি দেয় তা থেকে জানা যায়—

Bengal Criminal law Amendment Act অনুযায়ী ১৯৩২য়ের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাঙ্গলা দেশে ১৩৪৮ জন ধৃত হয়।

দেউলীতে ৯৮ জন ও পাঞ্জাবে একজন বন্দী ছিল।

৩৫ জন রাজবন্দী।

এবং সরকার বাহাদুর তৃতীয় গোলটেবিল প্রহসনও শেষ করল।

সাল তামাম।

রক্তক্ষরা ১৯৩২ সালও পার হ'য়ে গেল।

এলো ভৈরব হরষে ১৯৩৩ সাল।

বিদ্রোহী ভারতের রক্ত ইতিহাসের আরো একটি রক্তক্ষরা বৎসর।
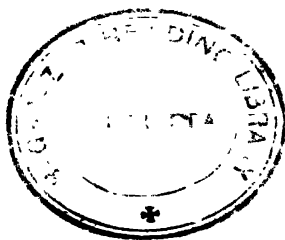
## —পাঁচ—

১৯৩৩

১৯৩৩য়ের ১৮ই এপ্রিলের পর ১৯৩৩য়ের ১৬ই ফেব্রুয়ারী খুব দীর্ঘ দিন নয়। তথাপি অবিস্মরণীয় দুটি দিন।

সিরাজ, কাশেমআলী, মহারাজ নন্দকুমার, ক্ষুদিরাম, কানাই, সত্যেন, প্রফুল্ল অনেকে অনেক রক্তদান করেছে।

১৮৫৭ থেকে সুরু করে ১৯৩৩ পর্যন্ত অনেক রক্তই বর্ষিত হয়েছে ভারতের মাটিতে।

ইতিহাস তা ভোলে নি, ভুলবেও না।

ভুলবার নয়।

ভোলেনি ভারত ভোলে নি সে কথা।

সূর্য সেন।

দুঃখ করো না হে মহান্। হে জ্যোতির্ময় মুক্ত পুরুষ!

মীরজাফর উমিচাঁদ, ভবানন্দ, নরেশ, ফণী, ইন্দু—এদের পাপের গুরুভারে আজও আমরা পদে পদে লাঞ্ছনা ও গ্লানির পঙ্কে নিমজ্জিত হচ্ছি।

মুক্তি পাই নি, মুক্তি পাই নি।

বুকের পাঁজরের তলায় আজও যে জলছে তাই অনির্বাণ অগ্নিশিখা !

সূর্য সেন।

সূর্যের ন্যায় প্রখর উদ্দীপ্ত জ্যোতির্ময়, জলন্ত তলোয়ার মতই ধারালো মহা-বিপ্লবের মহানায়ক সূর্য সেন—ভারতের মাস্টার দা !

বালাশোরে বুড়ীবালামের তীরে বাঘা যতীন আর চট্টলার গৈরালা গ্রামে সূর্য সেন চিরদিন চিরকাল জাতীয় মুক্তির ইতিহাসে অগ্নির অক্ষরে জল জল করে জলবে।

অনেক খুঁজেছে সরকার তন্ন তন্ন করে চট্টগ্রাম শহর ও তার অন্ত্য প্রত্যন্ত কিন্তু তথাপি কোন সংবাদই পায়নি সূর্য সেনের। পুরস্কারের পরিমাণ ৫০০০৲ থেকে ১০,০০০৲ টাকায় গিয়ে উঠ্‌লো।

অবশেষে এক দেশদ্রোহী বিশ্বাঘাতক মীরজাফরের বংশধর নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় সব শেষ হয়ে গেল।

শেষ আশার আলোক বিন্দুটি নির্বাপিত হলো।

এখানে ওখানে দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে সরকারের শ্যেণ চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে অবশেষে সূর্য সেন গৈরালা গ্রামে ঐ বিশ্বাসহন্তা নেত্র সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজেন সেনের গৃহে তখন আত্মগোপন করে আছেন।

নেত্র সেন যখন দেখলো সূর্য সেন—মাস্টারদা—তারই ভ্রাতার গৃহে আত্মগোপন করে আছেন তখন সেই দুরাত্মা ১০,০০০৲ টাকার লোভ আর সামলে উঠ্‌তে পারল না।

গোপনে সে পুলিশের কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল।

১৯৩৩য়ের ১৬ই ফেব্রুয়ারী রাত্রির অন্ধকারে সুসজ্জিত পুলিশ ও মিলিটারীর এক বিরাট বাহিনী এসে অকস্মাৎ ব্রজেন সেনের বাড়ীটা ঘিরে ফেলল।

এবং তীব্র অনুসন্ধানী আলো ফেলে ও ইলিউমিনেশন রকেট্ ছুঁড়ে রাতের আকাশকে আলোয় আলোয় যেন ঝল্‌সে দিল।

তারপর ঐ সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হলো চারিদিক থেকে অবিশ্রাম মেসিনগান, রাইফেল ও রিভলভারের মুখে মুহুর্মুহু অগ্নুদ্গার !

মাস্টারদাও নিশ্চুপ থাকলেন না। বিরাট বাহিনীর মুখে অকম্পিত দাঁড়িয়ে সম্মুখ যুদ্ধ সুরু করলেন।

একদিকে মাস্টারদা, কল্পনা দত্ত, শান্তি চক্রবর্তী ও মণিদত্ত চারজন বিপ্লবী—অন্যদিকে সরকার বাহাদুরের বিরাট সশস্ত্র বাহিনী।

একদিকে মাত্র চারটি রিভলভার, অন্য পক্ষে মেসিনগান, রাইফেল ও রিভলভার।

কতক্ষণ চালান যেতে পারে ঐ ভাবে যুদ্ধ।

তথাপি ঐ চক্রব্যূহ ভেদ করেই কোন মতে মাস্টারদা ও কল্পনা দত্ত ও অন্য সকলে সশস্ত্র বাহিনীকে অতিক্রম করে বাড়ীর বাইরে গেলেন।

সামনেই একটা বাঁশের বেড়া—বেড়া ডিঙিয়ে যে যেদিকে পারল পালাল।

সূর্য সেন সে রাত্রে অসুস্থ ছিলেন—বড় ক্লান্ত, পালাতে পারলেন না। সহসা সামনের অন্ধকার থেকে মনবিহারী ক্ষেত্রী গুর্খা প্রহরী লাফ দিয়ে এসে তাঁকে দু'হাতে সবলে জাপটে ধরে চীৎকার সুরু করে দিল।

ব্রজেন সেনও ধরা পড়ল।

এত আলো আকাশে, তথাপি যেন চারিদিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে গেল; রাহুকবলিত হলেন সূর্য সেন। কল্পনা দত্ত পালাল।

এত বড় বিশ্বাসঘাতকতা সে কি তার যোগ্য পুরস্কার পাবে না ?

এত বড় দেশদ্রোহিতার কি শাস্তি হবে না।

বৃথাই যাবে ?

দেশে কানাইলালের কি অভাব হয়েছে ?

না !—

চার দিনের মধ্যেই বিশ্বাসহন্তা—দেশের শত্রু নেত্র সেন যখন দিবা দ্বিপ্রহরে আহারে বসেছে, স্ত্রী তার পরিবেশন করতে করতে রন্ধনশালার দিকে গিয়েছে, সহসা শানিত কৃপাণ ঝলকে উঠলো।

স্ত্রী ফিরে এসে দেখলো নেত্র সেনের দ্বিখণ্ডিত মুণ্ড।

১০,০০০৲ টাকা পুরস্কার মিলেছে তার স্বামীর।

সূর্য সেনকে—শৃঙ্খলগত করে মহাবীরকে যখন চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হলো সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারীর দ্বারা পরিবেষ্টিত চারিদিক অবস্থায়, থেকে পুলিশের ছোট বড় সব কর্তারা উপকর্তারা ছুটে এলো।

সূর্য সেন ধরা পড়েছে !

বিপ্লবী সূর্যকে শৃঙ্খলিত করে আনা হয়েছে!

কোথায়? কোথায় সে?

কেমন সে দেখতে? কটা তার হাত, কটা তার পা? কটা তার মাথা কটা তার চোখ?

দীর্ঘ তিন বৎসর ধরে এত বড় বিরাট বাহিনীকে যে ঘোল পান করিয়ে ছাড়ছে সে কে!

**Who is that Surja Sen!**

অবাক হয়ে গেল সকলে—এই খর্বাকৃতি বিরল কেশ ছোট্টখাট্ট মানুষটিই সূর্য সেন!

বিরাট বিপ্লবের মহানায়ক!

একি বিশ্বাসযোগ্য!

অভিনন্দন জানাতে সুরু করলো সব সরকারী ভৃত্যেরা—কেউ চড়, কেউ কিল, কেউ একটা লাথি—অনেক দিনের পুঞ্জীভূত আক্রোশ!

নৃশংস বর্বরতায় শতমুখী হয়ে উঠ্‌লো শ্বেতাঙ্গীয় সভ্যতা ও শিক্ষা।

সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করে সূর্য সেনকে লৌহ কারাগারে নিয়ে গিয়ে ঢুকান হলো।

বন্দী সূর্য!

মেঘাবৃত অশনি।

তারকেশ্বর দস্তিদারের স্কন্ধে এলো নেতৃত্ব।

আবার বিপ্লবীচক্রের গোপন অনুষ্ঠান হলো—মাস্টারদাকে যে উপায়েই হোক কারাগার থেকে মুক্ত করে আনতে হবে।

আয়োজন চলতে লাগল গোপনে গোপনে অতি সন্তর্পণে।

কিন্তু হায়রে দুর্ভাগ্য!

হায়রে হতভাগ্য দেশ!

আয়োজন সম্পূর্ণ হবার পূর্বেই ২০শে মার্চ একটি বালক চট্টগ্রাম কারাগারের আশে পাশে যখন ঘুরছে, একজন লোক নিঃশব্দে জেলখানা হতে বের হয়ে এসে লালদীঘির পাড়ে বসল।

ছেলেটি ঐ লোকটির সামনে এলো, তারপর সুরু হলো উভয়ের মধ্যে কথাবার্তা।

ছেলেটির নাম শৈলেশ রায়। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র।

দু'জনকে কথা বলতে দেখে দূর থেকে এক সরকারী অনুচরের সন্দেহ হয় সে তক্ষুণি কর্তৃপক্ষকে সংবাদ দিল।

দু'জনেই গ্রেপ্তার হলো।

সমস্ত ষড়যন্ত্র সরকারের গোচরীভূত হয়ে গেল।

পরিকল্পনা হলো ব্যর্থ।

উক্ত ঘটনার কয়েক দিন বাদেই পটিয়া থানার দারোগা মাখন দীক্ষিত বিপ্লবীদের গুলিতে প্রাণ দেয়।

এদিকে তারকেশ্বর দস্তিদার, কল্পনা দত্ত, মনোরঞ্জন দাস মে মাসে এসে আনোয়ারা থানার অন্তর্গত গহিরা গ্রামে পূর্ণ তালুকদারের গৃহে আশ্রয় নিয়েছে গোপনে।

সহসা অতর্কিতে ১৯শে মে রাত্রির অন্ধকার শেষ না হতেই মেজর কীনের নেতৃত্বে একদল সশস্ত্র পুলিশ এসে পূর্ণ তালুকাদারের বাটি ঘেরাও করে ফেলল।

পলায়নের আর কোন পথই নেই দেখে বিপ্লবীর দল সম্মুখ সমরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সুরু হলো উভয় দলের মধ্যে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণ!

প্রতিপক্ষের গুলিতে গৃহস্বামী পূর্ণ তালুকদার ও মনোরঞ্জন দাস নিহত হলো।

তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত গ্রেপ্তার হলো।

উভয়কে সশস্ত্র প্রহরাধীন অবস্থায় চট্টগ্রাম কারাগারে নিয়ে আসা হলো।

এইবার সরকার বাহাদুর মহোৎসাহে সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্তকে কেন্দ্র করে তৃতীয় দফায় নবোদ্যমে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা সুরু করলো—২৬শে জুন ১৯৩৩ সনে।

অতি সতর্কতার সঙ্গে অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি নিভৃত কক্ষে, Mr. W. Macsharpe, রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েফ্‌কে নিয়ে স্পেশ্যাল ট্রাইবুন্যাল গঠন করে বিচার প্রহসন সুরু করল।

সরকার পক্ষে দাঁড়াল—পাবলিক প্রসিকিউটার নগেন বাড়ুয্যে ও শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী।

আর বিপ্লবীদের পক্ষে দাঁড়ালেন—কৌসলি জে ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও শ্রীরজনী বিশ্বাস মহাশয়।

মামলা চলতে লাগল।

ইতিমধ্যে আমরা বর্ণনা করবো তদানীন্তন আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলার কাহিনী।

সেও এক অভিনব অধ্যায় বিদ্রোহী ভারতের।

সরকারের সদা সতর্ক প্রহরীদের শ্যেন চক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে বিভিন্ন সময়ে কয়েকজন দুর্ধর্ষ বিপ্লবী সরকারের হিজলী, দেউলী ও বক্সা বন্দী-নিবাস থেকে পলায়ন করে এবং গোপনে তারা অনান্য বিপ্লবীদের সংগে সংযোগ স্থাপন করে এক বিরাট ও ব্যাপক বিপ্লব-অভ্যুত্থানের সাধনায় নিযুক্ত হয়। বিরাট ছিল তাদের পরিকল্পনা—বাংলা দেশ হতে সুরু করে পাঞ্জাব, বোম্বাই, মদ্রদেশ, গুজ্‌রাট্, দিল্লী, বিহার, উড়িষ্যা, এমন কি সুদূর বর্মামুলুক পর্যন্ত তার ব্যাপ্তি ও ও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল।

সরকারের গুপ্তচরেরা অনেকদিন থেকেই ঐ বিপ্লব-অভ্যুত্থানের ঘ্রাণ পেয়েছিল এবং তারা সর্বত্র অনুসন্ধানে ফিরতে থাকে ও সঙ্গে সঙ্গে তাদের মনে সামান্যতম সন্দেহ হলেই ধরপাকড় করতে থাকে। অবশেষে ১৯৩২য়ের ২৮শে ডিসেম্বর সরকার পলাতক বন্দী জিতেন্দ্রনাথ গুপ্তকে গ্রেপ্তার করল।

জিতেন্দ্রনাথ ১৯৩৩য়ের ১৪ই ফেব্রুয়ারী বক্সা বন্দী নিবাস থেকে পলায়ন করেছিল।

এর পর ক্রমে ক্রমে সরকার প্রভাত চক্রবর্তী,কিশোরী মোহন দাশগুপ্ত, বিমল ঠাকুর, সুরেন্দ্রধর চৌধুরী ও জ্যোতিষ মজুমদার প্রভৃতি অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। অতঃপর ১৯৩৩য়ের ৭ই আগষ্ট জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রভৃতি ৩৮ জনকে গ্রেপ্তার ও বন্দী করে সুচতুর শ্বেতাঙ্গ সরকার ঐ আটত্রিশ জনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১২১ক (ষড়যন্ত্র) খুন ও ডাকাতির ষড়যন্ত্র ৩০২, ৩৯৫।১২০ বি, অস্ত্র আইন (Arms Act 19 and 20.), বিস্ফোরক আইন (Explossive Substances Act) প্রভৃতি বহুবিধ ধারায় অভিযোগ এনে আলিপুরে এক মামলা সুরু করল: আন্তঃপ্রাদেশিক ষড়যন্ত্র মামলা।

প্রভাত চক্রবর্ত্তীই ছিল ঐ প্রচেষ্টার নেতা।

বক্সা বন্দী নিবাস থেকে আসানসোলের অন্তর্গত ফরিদপুর গ্রামে স্থানান্তরিত হবার সময় প্রভাত চক্রবর্তী ১৯৩২য়ের ১০ই জানুয়ারী পালিয়ে যায়।

একটি সাঙ্কেতিক চিহ্নযুক্ত কাগজ থেকে ঐ দলের অবনী ভট্টাচার্য, ইন্দু মজুমদার, সুধীর ভট্টাচার্য, সঞ্জীব মুখার্জী প্রভৃতিও গ্রেপ্তার হয়।

সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরে বিচার প্রহসন চালিয়ে—১৯৩৫য়ের ১লা মে মামলার রায় দেওয়া হয়। দণ্ডাদেশ হলো—প্রভাত চক্রবর্তী, জিতেন্দ্রনাথ গুপ্ত, পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, সীতানাথ দে ও নরেন্দ্রনাথ ঘোষের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

পূর্ণানন্দ দাশগুপ্ত ও সীতানাথ দে রায় ঘোষিত হবার সময় পলাতক—পূর্বেই তারা জেল থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

অন্যান্যদের—দশ, সাত, পাঁচ ও ছয় বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়।

১৯৩৩য়ের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের এক বাড়ীতে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দীনেশ মজুমদার—মেদিনীপুর জেল হতে পালিয়ে যখন হিজলী বন্দী নিবাস হতে পলাতক আরো দু'জন বিপ্লবী—নলিনী দাস ও জগদানন্দ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আত্মগোপন করে আছে, সরকার গোপনে সংবাদ পেয়ে সহসা অতর্কিতে একদিন এসে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে বাড়ীটা ঘেরাও করে ফেলল।

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবীরা উপায়ন্তর না দেখে যুদ্ধং দেহি বলে সম্মুখ সমরে গর্জন-মুখর অগ্নিনালিকা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

পুলিশ বাহিনীও প্রত্যুত্তর দিল।

মহানগরীর পথে সুরু হয়ে গেল এক অগ্নিযুদ্ধ।

শেষ পর্যন্ত দীনেশ, নলিনী ও জগদানন্দ তিনজন ধৃত হয়।

আবার ওদের নিয়ে নতুন করে বিচার হলো।

এবারে দীনেশের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ ও অন্য দুজনের প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হলো।

১৯৩৩য়েই হিলি ষ্টেশনে সরকারীডাক বিপ্লবীরা লুঠ করে নেয়।

এবং সরকার বাহাদুর ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হৃষীকেশ ভট্টাচার্য, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য প্রভৃতি কয়েকজনকে বন্দী করে এনে হিলির মামলা সুরু করে।

মামলার বিচারে—হৃষী ও প্রাণকৃষ্ণের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ জারী হয়।

বিপ্লবের অগ্নিশিখা আবার ভারতের আকাশকে রক্তাক্ত করে তুললো।

২রা সেপটেম্বর—১৯৩৩ সনে।

শহীদ প্রদ্যোতের সে সতর্কবাণী! মৃত্যুর মতই কঠোর অমোঘ সেই, অনুশাসন, We are determined Mr. Burge, not to allow any European to remain at Midnapore. Yours is the next turn!

এইবার তোমার পালা!

তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে।

হতভাগ্য বার্জ ভুললেও বিপ্লবীরা ভোলে নি।

২রা সেপটেম্বর অপরাহ্নকালে এলো সেই মৃতপথযাত্রীর ভবিষ্যত সাবধান-বাণীর পারন লগ্ন।

অপরাহ্ন বেলায় সেদিন মাঠে টাউন ক্লাবের সঙ্গে মহামেডান ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ্।

শ্বেতাঙ্গ মিঃ বার্জ সেদিন টাউন ক্লাবের তরফে খেলবে।

দর্শকদের ভিড়ে মাঠে তিল ধারণেরও স্থান নেই।

বহু সশস্ত্র পুলিশ ও সরকারী কর্মচারীও দর্শকদের মধ্যে সেদিন ছিল।

খেলা সুরু হওয়ার আর বেশী দেরী নেই, শ্বেতাঙ্গ বার্জ তার গাড়ীতে করে মাঠের সামনে এসে নামল।

উৎফুল্ল চিত্তে অগ্রসর হ'য়ে চলেছে ময়দানের দিকে, সহসা নীলাকাশ হতে যেন বজ্রবিদ্যুতের হুংকার শোনা গেল।

দুম্···দুম্! দুড়ুম!

প্রদ্যোতের সতর্কবাণী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালিত হলো, রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহে বিগতপ্রাণ বার্জ মাটিতে পড়ে গেল!

সঙ্গে সঙ্গে বার্জের দেহরক্ষীরাও তাদের আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বেপরোয়া গুলি চালাতে সুরু করল।

বিপ্লবীদের মধ্যে দু'জন অনাথবন্ধু পাঁজা ও মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত প্রতিপক্ষের গুলিতে ঐখানেই চির নিদ্রায় ঢলে পড়লো তাদের কর্তব্য সমাপনান্তে।

অন্যান্য বিপ্লবীদের ধরা গেল না, তারা সড়ে পরল।

সুরু হলো এবারে মেদিনীপুর সহরে সরকারের দানবীয় দমননীতির ও বর্বর অত্যাচারের ব্যাপক কুৎসিত দৌরাত্ম্য।

মিলিটারী মার্কা পুলিস সুপার মিঃ ইভানস তার চেলাচামুণ্ডাদের নিয়ে যেন উন্মাদ নৃত্য সুরু করে দিল।

খানাতল্লাসী, মারপিট, গ্রেপ্তার—জনসাধারণের উপর দিয়ে যেন ঝড়ের গতিতে চলতে লাগল।

এত করেও সুদক্ষ সরকার ষড়যন্ত্র-কারীদের মধ্যে—বিপ্লবীচক্রের কাউকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হলো না।

পীড়নে আতঙ্কে জর্জরিত জনসাধারণ সহর ছেড়ে পালাতে লাগল।

অপরাধীদের ধরিয়ে দেবার জন্য ৫০০০৲...১০০০০৲ টাকা পুরস্কার ঘোষিত হলো।

তথাপি কোন ফল হলো না।

জনহীন সহর শ্মশানের মত স্তব্ধ, খাঁ খাঁ করছে।

রাস্তায় একটি লোক নেই, জন নেই।

মধ্যে মধ্যে মিলিটারী প্রহরী ও সশস্ত্র পুলিশ প্রহরীর লোহার নাল বসান ভারী য্যামুনিশন বুটের মচ্ মচ্ শব্দ।

শ্বেতাঙ্গ কর্তা ও তাদের সাঙ্গপাঙ্গরা যখন ব্যর্থকাম হলো ডাক পড়লো এবারে বাঙ্গালী ডেঃ সুপারের। চারিদিকে গোয়েন্দা কুত্তাদের ছেড়ে দেওয়া হলো।

অর্থের বিনিময়ে এবারে সুরু হলো সত্য ও মিথ্যা সংবাদের বেঁচা-কেনা।

দেশপ্রেম ও বিশ্বাসঘাতকতার জুয়াখেলা চলতে লাগল এবারে অবাধে।

মেদিনীপুরের উকিল, ১৯০৮য়ে মেদিনীপুর বোমার ষড়যন্ত্র মামলার মধ্যে অভিযুক্ত যোগজীবন ঘোষের কনিষ্ঠ সহোদর—যামিনী বাবুর দুই পুত্রকে সরকার গ্রেপ্তার করে আরো অন্যান্য কয়েকটি যুবকের—নির্মলজীবন ঘোষ, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, সনাতন রায়, রামকৃষ্ণ রায়, ব্রজকিশোর চক্রবর্তী প্রভৃতির সঙ্গে। আবার

দেশের মুখে কলঙ্ক কালিমা ছিটিয়ে দিয়ে যামিনী বাবুর এক পুত্র মীরজাফরের পদানুসরণ করল।

জর্জ মিঃ ওয়েইটুকে নিয়ে ট্রাইবুন্যাল বসল।

নিয়মিত প্রথায় সম্পূর্ণ ভাবেই এক সজ্জিত ও সুপরিকল্পিত মামলা সাজিয়ে বিচার প্রহসন সমাপ্ত করা হলো।

রায় হলো : ব্রজকিশোর, রামকৃষ্ণ ও নির্মলজীবনের প্রতি to be hangged till death—ফাঁসী ও সনাতন রায় প্রভৃতি পাঁচটি যুবকের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সরকার পক্ষ ঘুষ দিয়ে সাক্ষ্য জোগাড় করে তাদের আক্রোশবহ্নি প্রশমিত করল।

পুলিশ যেমন করেই হোক জানতে পেরেছিল মেদিনীপুরের পূর্বতন শ্বেতাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডগলাস নিধনে প্রদ্যোৎ প্রভৃতির সহযোগী ছিল বিপ্লবী প্রভাংশু শেখর পাল।

বার্জ নিধনের দশ-বার দিন পরেই কলকাতায় প্রভাংশু সরকার কর্তৃক ধৃত হয়।

কিন্তু বহু চেষ্টা ও পীড়নেও প্রভাংশুশেখরের দ্বারা ডগ্‌লাস্ নিধন সম্পর্কে কোন স্বীকারোক্তি আদায় করতে না পেরে এবং কোন মামলাও তার বিরুদ্ধে আনতে সক্ষম না হয়ে শেষ পর্যন্ত তাকে বিনা বিচারেই কারাগারে তাদের অপূর্ব অর্ডিনান্স বলে বন্দী করে রাখল সরকার।

১৯২৮ সাল থেকেই নানাভাবে প্রচার কার্যের দ্বারা ভারতের মুষ্টিমেয় স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের রুশ জাগরণের ইতিকথা ও তাদের সুপরিকল্পনার অপূর্ব কর্মপন্থা এক নতুন আশার বাণী বহন করে আনে। একমাত্র রুশ ব্যতীত প্রায় সমগ্র ভূখণ্ড জুড়েই আবহমান কাল হতে যে সাম্রাজ্যবাদীদের নিষ্ঠুর পীড়ন ও অত্যাচার চলে আসছিল গত মহাযুদ্ধের পর লেনিনের নেতৃত্বে ও মনিষী কার্ল মার্কসের বুদ্ধিমত্তার আলোয় রুশের জনগণ এক নতুন দিনের স্বপ্ন দেখতে সুরু করে।

রুশের নাড়ীতে নাড়ীতে স্পন্দিত হতে সুরু করে এক নতুন স্পন্দন।

জারের পতন ও সেই সঙ্গে ক্রমে ক্রমে রুশের নব অভ্যুত্থান।

সাম্যের কল্যাণশ্রীতে সমগ্র রুশ দেশ যেন রঙিন সতেজ হয়ে উঠ্‌লো।

সে আলো ভারতের মাটিতেও এসে পড়ল।

মীরাট মামলার গোড়ার কথাটাই তাই।

সশঙ্ক তদানীন্তন ভারত সরকার তারই সঠিক সংবাদটুকু খুঁজে বের করবার জন্ম ১৯২৮য়ের সেপ্টেম্বর মিঃ ইটন নামক এক কর্মচারীর উপরে তদন্ত ভার দেয়।

১৯২৯য়ের পনেরই মার্চ ইটন্ এক রিপোর্ট দাখিল করল।

এবং যার ফলে ঐ বৎসরেই ভারতব্যাপী ব্যাপক খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় সুরু হয়ে গেল।

৩১ জনকে বিভিন্ন স্থান হতে গ্রেপ্তার করা হয়।

পূর্বেই বলেছি ১৯২৯—১২ই জুন মিরাট মামলার পত্তন হয়।

লক্ষ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সরকার মামলা পরিচালনা করে।

ওদিকে মামলা পরিচালনার জন্ম অভিযুক্তদের তরফে যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার চাহিদা মিটাবার জন্ম পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে একটি সেণ্ট্রাল ডিফেন্স্ ফণ্ড গঠিত হয়।

১৯৩০য়ে জানুয়ারী মাসে মীরাটের ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হোয়াইটের এজলাস থেকে মীরাটের সেসন জজ্ মিঃ আর, এম, ইয়র্কের এজলাসে মামলাটি স্থানান্তরিত করা হয়।

ভারতের বুক থেকে চিরতরে ইংরাজ শাসন বিলোপ—স্বাধীনতা ও জনগণের আত্মপ্রতিষ্ঠার অপরাধের অপরাধী ঐ ৩১ জন?

বিচার প্রহসন এই ভাবে দীর্ঘ দিন ধরে চলল।

মামলায় ৩০০রও অধিক সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়, কাগজপত্র ছিল সাত হাজার।

১৯৩২য়ের ১৬ই আগষ্ট এসেসারদের মতামতের উপরে—অবশেষে—১৯৩৩য়ের—১৬ই জানুয়ারী রায় দান পর্ব সমাপ্ত হলো।

দণ্ডাদেশ জারী হলো—মুজাফ্ফর আহমেদ—যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

ডাঙ্গে, স্প্রাট্, ঘাটে জোগলেকার ও নিম্বাকার প্রভৃতির—দ্বাদশ বৎসরের জন্ম দ্বীপান্তর।

দশ বৎসরের জন্ম দ্বীপান্তরের আদেশ হলো, ব্রাড্লি, মীরাজকর ও ওসমানির প্রতি।

সাত বৎসর দ্বীপান্তরাদেশ হলো—শ্যামসিং, যোশী, মাজিদ্ ও গোস্বামীর 'পরে।

অযোধ্যাপ্রসাদ, পি, সি, জোশী, অধিকারী ও দেশাইয়ের হলো পাঁচ বৎসর দ্বীপান্তর।

চক্রবর্তী, বসাক, হাচিনসন, মিত্র, বজাবিওলা ও সাইগলের প্রতি আদেশ হলো চার বৎসর কঠোর কারাদণ্ড।

তিন বৎসরের জন্য কঠোর কারাদণ্ডাদেশ হলো—শামসুল হুদা, আলভা, কাস্‌লে, গৌরীশঙ্কর ও কাদামের প্রতি।

নরেন ভট্টাচার্য ( মানবেন্দ্র রায় )ও ঐ মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল, কিন্তু ১৯১৫ সনের ফেব্রুয়ারী মাসে তার জাহাজে ভারত ত্যাগের জন্য কোন দণ্ডাদেশ তার প্রতি আরোপিত করা যায় নি। পরে মানবেন্দ্র রায়কে প্রত্যাবর্তন করার পর ১৯৩১য়ের ২১শে জুলাই ওয়াইনি হাউসে আকস্মিক ভাবে সরকার তাকে গ্রেপ্তার করে।

এবং পরে বিচারে তার প্রতি ১২ বৎসরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ হয়।

শ্বেতাঙ্গ সরকারের অভিনব অস্ত্র-অর্ডিনান্সের জোরে ওদিকে প্রকাশ্যে সর্বপ্রকার জাতীয় আন্দোলনই বন্ধ করবার পাশবিক চেষ্টা পুরোদমেই চলতে থাকে সর্বত্র সারা ভারত জুড়ে।

কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা, মহকুমা, তালুক, থানা ও গ্রামের কমিটি, জাতীয় বিদ্যালয় প্রভৃতি যাবতীয় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান ও কেন্দ্রকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করা হলো।

যেখানে যেখানে কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্র ছিল সমুদয় কেন্দ্রই সরকার জোর করে কুক্ষিগত করল। কংগ্রেসের টাকাকড়ি ফণ্ড্ সব সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হলো।

পাইকারী জরিমানা, পিটুনী ট্যাক্স ও শান্তি রক্ষার নির্লজ্জ অজুহাতে দেশের সর্বত্র পরোক্ষভাবে অব্যাহত পীড়ন ও অত্যাচার চালাবার জন্য যে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন তাদের যাবতীয় খরচ-খরচাদি হতভাগ্য দেশবাসীর বক্ষ-রক্ত শোষণ করে আদায়ের সুব্যবস্থা হলো। সরকার নির্লজ্জভাবে শান্তিরক্ষার অভিনয়ে নিরীহ আবালবৃদ্ধবণিতাকে দায়ী করবার ক্ষমতা হাতে তুলে নিল।

এমন কি কোন কোন স্থানে নির্দিষ্ট সময়ের পরে গৃহের বাইরে যেতে হলেও বিভিন্ন রঙের Identity card বা পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা ও বাহাদুর সরকার করলো।

শয়নে স্বপনে জাগরণে আতঙ্কগ্রস্ত সরকার যেন অত্যাচারী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মত বিষ্ণু-চক্রের ভীতি দেখছে তখন।

এত অত্যাচার এত পীড়ন, তথাপি জাতি এগিয়ে চলেছে। বিদ্রোহী বিপ্লবীর দল মরণপণে দানবের সঙ্গে সংগ্রামের জন্ম যেন ঘরে ঘরে প্রস্তুত হতে লাগল।

শত অত্যাচার—শত লাঞ্ছনা সহ্য করে, কালাপানির পারে ও ফাঁসীর মঞ্চে নির্ভীক কণ্ঠে বার বার তারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেল—

আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা দিবে কোন্ বলিদান ?

বলিদান !

বলিদানের শেষ ত' হয় নি আজও মুক্তির মন্দির সোপান তলে।

ছিন্নমস্তার রক্ত তৃষা ত' আজও মেটে নি।

রুধিরে রুধিরে মাটি লাল হয়ে গেল, সেই লাল মাটির বুকে বীজ শুধু ছড়িয়ে গেল, এখনো হয়নি অঙ্কুরোদ্গম ! তাইত ১৯৩৩কে পশ্চাতে পেলে এগিয়ে এলো নতুন আশার স্বপ্ন বহন করে নতুন প্রতিজ্ঞা নিয়ে,—১৯৩৪ সাল।

১৯৩৪ সাল।

সূর্য উঠ্‌লো লাল ! রক্তের মত লাল।

জানুয়ারী ১লা থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত নিয়মিত উঠেছিল কিন্তু উঠ্‌লো না ১৩ই জানুয়ারীর সকালে।

মেঘে মেঘে আকাশ ঢেকে রইলো।

মধ্যে মধ্যে মেঘাবৃত আকাশের বুকখানার এক প্রান্ত হতে অন্য প্রান্ত চিড়ে দিয়ে রুদ্রের ভয়াবহ চকিত ইসারা অগ্নিজ্যোতিতে জেগে উঠ্‌তে লাগল।

কেন !

কেন ১২ই জানুয়ারী এলো !

প্রয়োজন ছিল তাই এসেছিল।

সূর্য সেন—মাস্টারদা ও তারকেশ্বর দস্তিদারের বক্ষরক্তে ১২ই জানুয়ারীর রাত্রির ইতিহাস লাল হয়ে রইলো।

সূর্য সেন—মাস্টারদা।

কল্পনার তুলি দিয়ে হে মহান, হে বিপ্লবের অক্ষয় অনির্বাণ পাবকশিখা, তোমার মূর্তি গড়ে তোমাকে স্মরণ করি।

চট্টগ্রামের মাটিতেই এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে মাস্টারদার জন্ম।

রাজনৈতিক জীবন সুরু প্রকৃত পক্ষে ১৯১৬ সাল থেকে।

বহরমপুর কলেজ থেকে বি, এ পাশ করে মাস্টারদা যখন ফিরে এলেন চট্টগ্রামে সমস্ত বুকখানা জুড়ে তখন বিপ্লবের অগ্নিপ্রবাহ বহে চলেছে।

পরাধীনতার শৃংখল ছিঁড়ে ফেলে জাতিয় মুক্তির জন্য রক্ত-সংগ্রামের মৃত্যু-তিলক কপালে ধারণ করেছেন।

চট্টশ্বেরীর মন্দিরের দুয়ারে মাথা নত করে শপথ নিল বিপ্লবী: হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু!

বাইরের কর্মজীবনে স্কুলে গণিতের একজন নিরীহ শিক্ষক।

সাংসারী জীবনে বিবাহও তাকে করতে হলো।

কিন্তু বিপ্লবীর ব্রত আর সাংসারিকের ব্রত ত' এক নয়।

পরস্পরের মধ্যে যে কোন সংস্পর্শ নেই।

দেবীর চরণ স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ—প্রত্যয়ের পাপে লিপ্ত ত হতে পারে না, তাই সংসারী হয়েও সংসারী নন।

সহস্র বন্ধন মাঝেও বন্ধনহীন।

স্ত্রী থেকেও স্ত্রী নেই। মীনকেতুর প্রবেশাধিকার নেই।

স্ত্রী পুষ্পকুন্তলারও হয়ত কোন দুঃখ ছিল না।

আদর্শ স্বামীর আদর্শ স্ত্রীই ছিলেন তিনি।

অসহযোগ আন্দোলনে দীর্ঘকাল কারাবাসের পর মাস্টারদা যখন চট্টলায় আবার ফিরে এলেন, নতুন উপলব্ধি তার অন্তরে।

এবারে আর অসহযোগ নয়।

দাঁতের বদলে দাঁত। চোখের বদলে চোখ।

কণ্টকাকীর্ণ পথে পথে ও মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এবারে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প মনে।

অসহযোগ আন্দোলনের উগ্রতা তখন চৌরিচৌরার নির্বাপিত অগ্নির মধ্যেই যেন অকাল সমাধি পেয়েছে।

যে চৌরিচৌরার ঘটনার মধ্যে জেগেছিল ভয়ঙ্কর এক ঝটিকা-সঙ্কেত, দুর্নিবার

সেই অগ্নিযজ্ঞের সম্ভাবনা অকস্মাৎ মহাত্মাজীর নির্লিপ্ততায় যেন ফুৎকারে নির্বাপিত করা হলো।

যে বিপ্লবীর দল সেদিন নতুন আশায় মহাত্মাজীর অহিংস সংগ্রামের মধ্যে মৃত্যুপণ করে ঝাঁপ দিতে এগিয়ে এসেছিল, তারা হলো মর্মাহত।

বুটের লাথি খেয়ে তারা প্রেমের বাণী আওড়াতে পারল না।

বলতে পারল না তারা, মেরেছো কলসীর কানা তাই বলে কি প্রেম দেব না।

মহাত্মাকে পশ্চাতে ফেলে এগিয়ে গেল তাদের সংঘর্ষের পথে।

মাস্টারদা নবোদ্যমে তাঁর বৈপ্লবিক পরিকল্পনা নিয়ে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন।

চাই অর্থ পরিকল্পনাকে পূর্ণাঙ্গ সফল করতে হলে।

চট্টগ্রামের পরৈকোরা গ্রামে প্রথম লুণ্ঠনোৎসব পালন করা হলো।

পরৈকোরা গ্রামের সেই দুঃসাহসিক লুণ্ঠনের কথা লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

পুলিশ বহু চেষ্টা করেও কারোর বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনতে পারল না।

তারপর ১৯২৩ সনে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কোম্পানীর ১৭০০০৲ টাকা আবার চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা লুঠ করে নিল। কিন্তু টাকা লুঠ করেও বিপ্লবীরা সেটা কাজে লাগাতে পারল না, কারণ পুলিশ ও জনসাধারণ লুঠ করে ফিরবার পথে তাদের অনুসরণ করল।

নাগারখানা পাহাড়ে দুই দলে হলো সম্মুখ সংঘর্ষ।

প্রচণ্ড এক খণ্ড অগ্নি সংগ্রাম।

গুরুতরভাবে আহত হলেন মাষ্টারদা, অম্বিকা চক্রবর্তী ও রাজেন দাস।

ঐ অবস্থায় শত্রুহস্তে পড়ে নিপীড়িত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ন্তর নেই দেখে তিনজনেই তীব্র বিষ পটাশিয়াম সায়ানাইড ভক্ষণ করলেন।

কিন্তু যাদের জন্য পরিপূর্ণ গৌরব নিয়ে মৃত্যু অপেক্ষা করে আছে অদূর ভবিষ্যতে তাদের ওভাবে মৃত্যু হবে কেন। সকলেই অচেতন হয়ে পড়ে, কিন্তু কারোই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় না। কারণ পরে জানা যায় সেই বিষের রাসায়নিক ক্ষমতা নাকি অক্ষুণ্ণ ছিল না।

দেশের সৌভাগ্য! জাতির সৌভাগ্য!

যাহোক পুলিশ এসে পাহাড়ের উপরে অচেতন দেহগুলো আবিষ্কার করল এবং বয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

জ্ঞান ফিরে আসবার পর গ্রেপ্তার করে সকলকে নিয়ে সরকার মামলা রুজু করল।

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অক্লিষ্ট সওয়ালে সকলেই মুক্তি পায়।

কিন্তু সরকার ঐ মুক্তির ব্যাপারে সন্তুষ্ট না হ'য়ে ওদের মধ্যে দু'জনকে আরো অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে অর্ডিনান্স বলে বন্দী করে নিশ্চিন্ত হলো।

কেবল সূর্য সেনের পাত্তা পাওয়া গেল না—সরকারের মতলব আগে থাকতেই বুঝতে পেরে তিনি আত্মগোপন করলেন।

আত্মগোপন করে দুটি বৎসর সূর্য সেন বিপ্লবী কর্মজীবনের গোপন তৎপরতায় ব্যস্ত হ'য়ে ছিলেন। অবশেষে ১৯২৬ সনে সরকার সূর্য সেনকে আবার বন্দী করল।

বন্দী জীবনে বিভিন্ন জেলে জেলে নানা কর্মতৎপরতায় ভরে ছিল মাস্টারদার সময়।

ঐতিহাসিক চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ঐ সময়েই তার মনের মধ্যে স্থান পায়।

১৯২৮ সালে সূর্য সেনের স্ত্রী পুষ্পকুন্তলা দেবী বিশেষ পীড়িত হয়ে পড়েন।

একটি দিনের তরেও বিবাহিত জীবনে তাঁর আরো দশটি বিবাহিতা নারীর মত স্বামীকে আপনার করে তার কাছে পান নি।

বসন্তের পুষ্পোৎসব বিপ্লবের অগ্নি-স্পর্শে ঝলসে গিয়েছে।

মালা ঝরে গিয়েছে, ছিন্ন পাপড়ীর দীর্ঘশ্বাসে রাত্রির পর রাত্রি পুইয়ে গিয়েছে। নিশিদিন পাড়াপড়শীর কাছ হতে কত অভিযোগ লাঞ্ছনা নারীত্বকে তাঁর পীড়িত করে তুলেছে, বুকের মধ্যে তুষের আগুন নিয়ে পুষ্পকুন্তলা জ্বলে জ্বলে শেষ পর্যন্ত শয্যা নিলেন।

পীড়িতা স্ত্রীর সংকটাপন্ন শেষ অবস্থার কথা বিবেচনা করে সরকার বন্দী মাস্টারদাকে কয়েকদিনের ছুটি দিল।

সূর্য সেন এলেন গৃহে।

শয্যায় কে শুয়ে ঐ!

শয্যায় একেবারে লীন হয়ে গিয়েছে।

জ্বলে জ্বলে অগ্নি আজ নির্বাপিত-প্রায়।

তীরু প্রদীপ শিখার ন্যায় দু'টি কম্পিত সজল আঁখির দৃষ্টি তুলে পুষ্প তাকালেন স্বামীর মুখের দিকে।

নিষ্ঠুর বিপ্লবী! পাষাণে বেঁধেছো তুমি বুক?

স্নেহ প্রেম দয়া মায়া ভালবাসা তোমার অভিধানে নেই?

নির্মম কুলীশকঠোর!

সতী নারী স্বামীর কোলে মাথা রেখেই চোখ বুজলেন।

কিন্তু পাষাণের চোখে এক বিন্দু জলও ঝরল না।

ছুটি ফুরিয়ে গেল, সরকার বাহাদুর এবারে দয়াপরবশ হয়ে মাস্টারদাকে জেলে না রেখে তাঁর গ্রামের গৃহেই অন্তরীণ করে রাখল।

তারপর ১৯২৮ য়ের শেষাশেষি বিনা সর্তে সরকার যখন তাঁকে মুক্তি দিল মাস্টারদা আবার চট্টগ্রামে ফিরে এলেন।

একে একে চট্টগ্রামের কারামুক্ত বিপ্লবীরাও মাস্টারদার চারপাশে এসে দাঁড়াতে লাগল।

এবারে আর অসহযোগ নয়।

তরবারী মুখে ছিনিয়ে নিতে হবে জননী জন্মভূমি।

দেশকে যারা এতকাল জোর করে তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে শোষণে শোষণে জর্জরিত করে ফেলেছে, সেই অত্যাচারীর বক্ষরক্তে এবারে সমাপন হবে বিপ্লবীর মাতৃপূজা!

নেতৃত্বভার মাথায় তুলে নিয়ে মাস্টারদার যাত্রা সুরু হলো।

চট্টলার যুবক-কিশোরের দল ঘরে ঘরে তৈরী হতে লাগল মাস্টারদার নির্দেশে।

ঘরে ঘরে প্রস্তুতি চললো। দানবের সাথে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেবে প্রস্তুত হতে লাগল তারা।

পুরোভাগে তাদের বিপ্লবী-সূর্য—সূর্য সেন। মাস্টারদা।

স্থানীয় কংগ্রেস নির্বাচনের সময় ছুরিকাঘাতে শহীদ সুখেন্দু দস্তর মর্মান্তিক মৃত্যু—অন্যান্য কর্মীদের মনে নিদারুণ আক্রোশ জাগল।

রক্তের বদলে রক্ত চাই।

**Tooth for a tooth! Eye for an eye!**

কিন্তু মাস্টারদা শান্ত স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, সুখেন্দুর মৃত্যু আমি কারো চাইতে কম অনুভব করি নি।

কিন্তু আমরা কি শুধু দলাদলির আত্মঘাতী সংঘর্ষে নিজেদের শক্তিক্ষয়ই করবো? ভুল না ইংরেজ তাই চায়।

আসল সংগ্রাম এ নয়।

শক্তি ক্ষয় করবার এ ত সময় নয়।

আসছে সে শুভক্ষণ!

রক্তদানের শুভক্ষণ ত' এখনো আসেনি।

দিন আগত ঐ!

সেই মাহেন্দ্রক্ষণ এলো।

দীপ্ত সূর্যের মতই বিপ্লবীশ্রেষ্ঠ সূর্য সেনের দীপ্তিতে ১৮ই এপ্রিল চট্টলার আকাশ রক্তরাঙা হয়ে উঠ্‌লো, তারপর দীর্ঘদিন ধরে পলাতক অবস্থাতেই চললো ইংরাজের বিরুদ্ধে খণ্ড খণ্ড জীবনক্ষয়ী সংগ্রাম। এবং শেষ পর্যন্ত নেত্র সেনের বিশ্বাসঘাতকতায় চট্টগ্রামের বুক থেকে শেষ আশার অলোক বিন্দুটুকুও গেল নিভে।

বিশ্বাসঘাতকতার একটি বিষ ফুৎকারে নিভে গেল সেই চির-অম্লান অগ্নিশিখা।

গ্রেপ্তারের পর বীরসিংহকে অকথিত অত্যাচার করতে করতে এনে সুরক্ষিত কারাগারে পুরল শ্বেতাঙ্গ-তাঁবেদার ও পদলেহীর দল।

এবং সুরু হলো আবার তৃতীয় দফায় সরকারের তথাকথিত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার মামলা পর্ব ২৯৩৩য়ের ২৬শে জুন।

সূর্য সেন, তারকেশ্বর দস্তিদার ও কল্পনা দত্ত তিনজনের বিচার সুরু হলো।

ভীত ত্রস্ত সরকার সূর্য সেনের বিচার প্রকাশ্য আদালতে করবার সাহস পেল না। জেলখানার নিকটবর্তী গোয়েন্দা কার্যালয়ের একটি সুরক্ষিত গোপন কক্ষে বসলো বিচার প্রহসন।

বিচারের নামে যে স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল গঠিত হলো তার মধ্যে বিচারক রইল শ্বেতাঙ্গ মিঃ W. Massharpe. সরকারের উচ্ছিষ্টলোভী খঁয়ের খাঁ রজনী ঘোষ ও খন্দকার আলি তায়েক।

আলিপুর কোর্টের তদানীন্তন পাবলিক প্রসিকিউটার রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশচন্দ্র রায় চৌধুরী সরকার পক্ষে মামলা পরিচালিত করতে লাগল।

মাস্টারদাদের পক্ষে দাঁড়ালেন, কৌঁসলি, জে; ঘোষাল, বিনোদলাল সেন ও রজনী বিশ্বাস মহাশয়।

ফলাফল যে কি হবে তাত জানা ছিলই, তথাপি ঘটা করে সরকার তাদের পক্ষে ১২৫ জনকে দিয়ে সাক্ষী দেওয়াল।

সাক্ষীরা একের পর এক এসে বলে যেতে লাগল ১৯৩১—১৯শে মার্চ ইনেসপেক্টার শশঙ্ক ভট্টাচার্যকে নাকি তারকেশ্বরই হত্যা করবার চেষ্টা করেছিল।

অতএব আর কি!

চরম দণ্ডাদেশ হলো তারকেশ্বর দস্তিদারের প্রতি।

আর মাস্টারদা? তার অপরাধের কি অন্ত আছে!

এত বড় রক্ত-বিপ্লবের সে প্রধান হোতা!

রক্ত-যজ্ঞের প্রধান পুরোহিত।

তার প্রতি একমাত্র আদেশ হ'তে পারে চরম দণ্ড।

সরকারকে এমন ভাবে পর্য্যদুস্ত করেছে, এমন করে অপমানিত লাঞ্ছিত করেছে একথা কি তারা ভুলতে পারে!

কোন দিনই যে তারা ভুলতে পারবে না।

তাই আদেশ হলো মৃত্যুদণ্ডের।

আর কল্পনা দত্তের প্রতি আদেশ হলো, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। Transportation for life!

তারপর এলো সেই জাতির রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসের চিরস্মরণীয় সেই রাতটি!

১৯৩৪ সনের—১২ই জানুয়ারী।

সরকার পক্ষের দমনবিশারদ পাণ্ডারা ঐ দিনটিকে সবার কাছ থেকে গোপন করে রাখবার অনেক চেষ্টাই করেছিল, কিন্তু গোপন থাকল না। পারলে না গোপন করে রাখতে।

কেমন করে না জানি বুঝি বাতাসে বাতাসেই জনে জনে জেলের মধ্যে প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল তাদের পরমপ্রিয় নেতার চির বিদায়ের দিনটি।

অন্তরের বুক ঢালা প্রীতি ও শ্রদ্ধায় যাঁকে তারা আপনার করে পেয়েছিল, সে চলে যাবে অথচ তারা জানবে না—এও কি কখনো হয় না তাই কিছু সম্ভব!

রাত্রি বারটার ঘণ্টাধ্বনি সুরু হলো জেলখানার পেটা ঘড়িতে ঢং···ঢং !···ঢং ··

মৃত্যুপথযাত্রী মহাবিপ্লবী পরম নির্বিকার নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন লৌহ কারাগারের ছোট্ট নিভৃত সেলের মধ্যে।

ঝন্ ঝন্ শব্দে খুলে গেল লৌহদ্বার।

শ্বেতাঙ্গ রক্ষী ও জেল কর্তৃপক্ষের দল তাদের শেষ আক্রোশ মেটাতে নির্লজ্জের মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ঘুমন্ত মানুষটির উপরে।

এবং সুরু করে দিল কিল, চড়, লাথি—নির্মম প্রহার।

পাশের সেলের মধ্যেই ছিল মৃত্যুপথযাত্রী আর এক বিপ্লবী—তারকেশ্বর দস্তিদার।

ঐ অমানুষিক অত্যাচারের শব্দে তারও ঘুম ভেঙে গেল।

সে উচ্চকণ্ঠে চীৎকার সুরু করে দিল তীব্র প্রতিবাদে।

কিন্তু কার কাছেই বা প্রতিবাদ আর কার বিরুদ্ধেই বা সে প্রতিবাদ !

তারকেশ্বরের চীৎকারে বর্বর শ্বেতাঙ্গরা পাশের সেলে ঢুকে তারকেশ্বরের দেহের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে সুরু করে দেয় নির্মম প্রহার।

শ্বেতাঙ্গ পশুদের নির্মম নিষ্ঠুর প্রহারের ফলে শীঘ্রই মাস্টারদা ও তারকেশ্বর অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

চোখ, মুখ ও সর্বদেহ দিয়ে রক্ত ঝরতে থাকে।

ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত অচৈতন্য দু'জনকে টানতে টানতে এনে উন্মত্ত পশুর দল নিষ্ঠুর জিঘাংসায় ফাঁসীর দড়িতে ঝুলিয়ে দিল।

এমনি করেই লোকচক্ষুর অন্তরালে, গভীর রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে অনুষ্ঠিত হলো বর্বর পৈশাচিক ঘৃণ্যতম অত্যাচারের একটি ক্লেদাক্ত পর্ব।

একমাত্র জেলের বন্দীরা ব্যতীত কেউ জানলে না।

চট্টগ্রামের সমস্ত অধিবাসীরা নিশীথের নিশ্চিন্ত আরাম শয্যায় শুয়ে যখন সেই শান্ত মুহূর্তে অন্ধকারে গোপনে ভয়াবহ হত্যালীলা সমাপ্ত হলো তার—যে একদা তাদেরই সুখের জন্য তাদেরই হাতে তুলে দিতে স্বাধীনতা—হাসিমুখে সংসার আত্মীয় স্বজন সকল সুখের সম্ভাবনাকে অবহেলে পশ্চাতে ফেলে কণ্টক মৃত্যুক্ষত পথে যাত্রা সুরু করেছিল।

তার প্রতিজ্ঞা সে পালন করে গেল—হয় স্বাধীনতা নয় মৃত্যু !

কিন্তু দেশবাসী আজ কি করে সে কথা ভুলেছে !

কি করে তারা ভোলে নির্ভীক ঐ মরণজয়ী অমৃতের পুত্রদের ?

প্রভাত হলো।

রাত্রির অবসান হলো কিন্তু চট্টলার আকাশে সেদিন সত্যিই সূর্যোদয় হলো না।

সূর্যহীন চট্টলার আকাশ শোকে মুহ্যমান হয়ে রইলো।

কসাই শ্বেতাঙ্গ! বর্বর শ্বেতাঙ্গ কেবল পরম নিশ্চিন্তে সেদিন নিঃশ্বাস নিয়েছিল অগণিতজনের বুকভাঙা হাহাকারের মধ্যে!

মাস্টার দা! হে বিপ্লবী-সূর্য! সূর্য সেন!

তোমায় প্রণাম!

তোমার অতৃপ্ত আত্মার বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা আজ সমস্ত নিপীড়িত বঞ্চিত ভারতবাসীর বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসায় রূপান্তরিত হ'য়ে তোমাকে স্মরণ করবে কি!

জানাবে না কি তোমায় প্রণাম!

তারপর চট্টগ্রামের যুব-অভ্যুত্থান ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শেষ অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল ১৯৩৪য়ের ২রা জানুয়ারী চট্টগ্রামের ক্রিকেট খেলার মাঠে এক রক্তাক্ত অপরাহ্নে।

১২ই জানুয়ারীর মাত্র দশটি দিন আগে।

সংগঠনের যোগাযোগ সব বিচ্ছিন্ন, কারারুদ্ধ সব নেতারা।

বাইরে যারা তখনও ছিল, তাদের মধ্যে হিমাংশু চক্রবর্তী, নিত্য সেন, হরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী অন্তর্জালায় তারা যেন তখন নিজেদের আর ধরে রাখতে পারছে না।

বোমা ও গুলিভর্তি পিস্তল নিয়ে চারজনে ছুটে এলো খেলার মাঠে সেদিন।

এবং মাঠের মধ্যে উপস্থিত শ্বেতাঙ্গ দর্শকবৃন্দকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করল ও গুলি ছুঁড়তে সুরু করে দিল।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, উত্তেজনার মধ্যে বোমা নিক্ষেপ করায় ও গুলি ছোঁড়ায় কেউই হতাহত হয়নি।

ইতিমধ্যে চার দিক থেকে পুলিশ, মিলিটারীরা ও যারা সেখানে উপস্থিত ছিল তারা প্রতিআক্রমণ চালায়।

হিমাংশু চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরী দু'জনে ধৃত হলো।

বিচারে দু'জনার প্রতিই ফাঁসীর হুকুম হয়।

চট্টগ্রাম বিপ্লবের উপরে কালো যবনিকা নেমে এলো।

শুধু যে অমূল্য মৃত্যুহীন প্রাণগুলি রক্ত দিয়ে তাদের শেষ লিপিখানি লিখে রেখে গেল কালো যবনিকার অন্তরালে তা হয়ে রইলো চিরস্মরণীয়।

সে মুছে ত ফেলবার নয়।

ভুলবারও নয়।

তাইত প্রশ্ন আজো জেগে রইলো, জেগে রইলো সেই বিক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা—

ফাঁসির মঞ্চে গেয়ে গেল যারা জীবনের জয়গান
আসি অলক্ষ্যে দাঁড়ায়েছে তারা, দিবে কোন বলিদান ?

প্রশ্ন আজো তাই শুনি।

হে ভারতবাসী কি দিয়েছো তার প্রতিদানে ?

কি দিলে !

তারা যে অন্ধকার দুর্যোগের মধ্যে, ঝঞ্ঝাসঙ্কুল পথে পথে দুঃসহ বজ্রানলে আপন বক্ষের পাঁজর জ্বালিয়ে নিজেরা জ্বলে গেল—তার প্রতিদান কি নেই !

না তারা ভেবেছিল,

মোরা আপনি মরে মরার দেশে আনব বরাভয়,
মোরা ফাঁসি পরে আনবো হাসি মৃত্যুজয়ের ফল
মোদের অস্থি দিয়েই জ্বলবে দেশে
আবার বজ্রানল।

এগিয়ে গিয়েছে তারা জ্যোতির্ময়ের দূত, অমৃতের পুত্র,—কণ্ঠে নিয়ে তাদের কবির সেই গান—

চলরে নও জোয়ান, শোনরে পাতিয়া কান,
মৃত্যু-তোরণ দুয়ারে দুয়ারে জীবনের আহ্বান
ভাঙ্‌রে ভাঙ্‌ আগল, চলরে চলরে চল্।

—ছয়—

বহুকাল ধরে পদদলিত ভারতবাসী তাদের স্কুল কলেজে পাঠ্যপুস্তক হিসাবে যে ইতিহাস মুখস্ত করে এসেছে তারা তার মধ্যে পড়েছে—ভারতবর্ষের দুইটি অংশ।

বৃটিশ ভারত।

ভারতীয় ভারত।

ব্যাপারটা প্রণিধানসাপেক্ষ।

বৃটিশ ভারত কথাটার মানে তবুও কিছুটা বোঝা যায়, কিন্তু 'ভারতীয় ভারত' কথাটার আসল তাৎপর্য যে কি ভাবতে গেলে মস্তিষ্ক সত্যিই গুলিয়ে যায়।

কাশ্মীরের মহারাজাকে Son of the Soil এই দেশেরই ছেলে বলে 'ভারতীয় ভারতে'র সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে যদি আবার বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাই প্রভৃতি কীর্তিধ্বজ মীরজাফরদের Son of the Soil বলা হয় কেউ হয়ত ক্ষমা করবে না।

বস্তুত ঐখানেই বেশীর ভাগ ভারতবাসীর 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে অজ্ঞতা।

ভারতীয় ভারতের হর্তাকর্তা বিধাতা বা মুকুটমণি অর্থাৎ রাজা মহারাজার দল তাদের কথা বাদ দিলে এবং তাদের রাজত্বে (?) যে সব গণ-আন্দোলন হয়েছে ভারতের স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী ইতিহাসে তারও মূল্য ত কম নয়।

অথচ তারা দেশের ঐ স্বাধীনতার সংগ্রামকে যদি সুচক্ষে দেখত জনবল ও অর্থবল দিয়ে ১৮৫৭র সংগ্রামে সংগ্রামীদের পাশে এসে যদি দাঁড়াত তাহ'লে পরবর্তী পৌণে একশত বৎসরের কলঙ্কিত রক্তাক্ত অধ্যায়টি হয়ত ভারতে রচিত হতো না।

শ্বেতাঙ্গদের উক্তি থেকেই ঐ ব্যাপারের সুস্পষ্টপ্রমাণ ইতিহাসের বুকে লিখিত হয়ে আছে। ১৮৬০ সনে ৩০শে এপ্রিল ক্যানিং লিখেছিল, "স্যার জন ম্যালকম বহু পূর্বেই বলে গেছেন যে, 'যদি আমরা সমস্ত ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলাতে বিভক্ত করতাম, তাহলে আমাদের সাম্রাজ্য ৫০ বৎসরও টিকত না। কিন্তু আমরা যদি কতগুলো দেশীয় রাজ্যের সৃষ্টি করি, যাদের রাজনৈতিক কোন ক্ষমতা নেই, আমাদের সাম্রাজ্যেরই যারা কেবল হাতিয়ার,—তাহ'লে আমাদের নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্ব যতদিন অব্যহত থাকবে ততদিন ভারতেও আমরা টিকতে পারবো।

এই অভিমতের যথার্থতা সম্বন্ধে আমার মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। বরং সাম্প্রতিক ঘটনার ফলে এই সত্য সম্পর্কে আমাদের অধিকতর অবহিত হতে হবে।"

সিপাহী অভ্যুত্থানের যে তিক্ত অভিজ্ঞতা শ্বেতাঙ্গ কর্তৃপক্ষের হয়েছিল শ্বেতাঙ্গ ক্যানিংয়ের ঐ মহা মূল্যবান উক্তিটি তা থেকেই জন্মলাভ করেছিল।

এবং সুচতুর শ্বেতাঙ্গরা ভারতের মাটিতে তাদের সত্বাকে কায়েমী করবার জন্য ও নির্বিবাদে ভারতকে শোষণের জন্য যে বহুবিধ চাতুরী ও বর্বর নীতির বাঁধন এঁটেছিল; দেশীয় রাজন্যবর্গকে কয়েক মুষ্টি ঘৃত তণ্ডুল তাদের সামনে ফেলে দিয়ে ও G. B. E, G. C. I. E, G. C. S. I, K. C. S. I প্রভৃতি ইংরাজী বর্ণমালার হার তৈরী করে তাদের গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে তাদের কুক্ষিগত করে রাখাটাও তার মধ্যে বিশিষ্ট ও অন্যতম! ফলে যা হবার তাই হলো।

হতভাগ্য পদাশ্রিত ঘৃত-তণ্ডুল-ভুক্ত তথাকথিত দেশীয় স্বাধীন (?) রাজন্যবর্গ প্রজাদের রক্ত শুষে অর্থ ব্যয় করে নিশ্চিন্ত অখণ্ড অবসর আলস্যে, বিলাসে ও কামচর্চায়, ঘোড়দৌড় ও খেলাধূলায় বৎসরের পর বৎসর কাটিয়ে মেদবাহুল্যে হাঁসফাঁস করে একদিন হঠাৎ মারা যেত!

এতে তারাও সুখী (?) ছিল শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও নিশ্চিন্ত ছিল।

১৯৩০য়ে মে মাসে অধ্যাপক উইলিয়ামস্‌য়ের মন্তব্যটি ওদের সম্পর্কে প্রণিধানযোগ্য।

দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা ব্রিটিশ সরকারের অত্যন্ত বশংবদ। এদের অনেকরই অস্তিত্ব বৃটিশ আদালতে এবং বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর উপরে নির্ভর করে। আঠার শতকের শেষাংশে ও উনিশ শতকের প্রথমাংশের সংগ্রামে যদি বৃটিশ শক্তি তাদের সাহায্য না করত, তাহলে এদের অনেকেরই অস্তিত্ব আজ পর্যন্ত টিকত না। এই সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যগুলি সারা ভারতে ছড়িয়ে থেকে বাধার সৃষ্টি করেছে; বৃটিশ সরকারের রক্ষাকবচ এরা। শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত এই সকল দেশীয় রাজ্য ভারতময় ছড়িয়ে থাকায় ভারতবর্ষ থেকে বৃটিশকে কোন ব্যাপক বিদ্রোহ করে হটিয়ে দেওয়া কষ্টকর হবে।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ উইলিয়ামস্‌ যে কঠোর সত্য কথাটি শেষ পর্যন্ত বলতে দ্বিধা করেছেন, ১৮৫৩ সালে মনিষী কার্ল মার্কস স্পষ্টই সে কথাটা বলে গিয়েছেন।

The Native Princes are the stronghold of the present abominable English System and the greatest obstacle to Indian progress.

ভারতীয় ভারত আর বৃটিশ ভারত ভারতকে কেটেই নিজেদের সার্থসিদ্ধির উদ্দেশে করা হয়েছিল—ভারতবর্ষের রাজনীতির পথে স্থায়ী বাধা দানের জন্য ১৮৫৭র সেপাহী আন্দোলনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে ও ঐ সময় বিশ্বাসহন্তা নিজাম প্রভৃতির সাহায্য দানের কথা ভেবে। এর ফলে চিরদিনের জন্য গালভরা ইংরাজী কথার মালা গলায় ঝুলিয়ে ও চোব্যচোষ্যলেহ্যপেয় খেয়ে মেদবাহুল্যে ডগমগ হয়ে শ্বেতাঙ্গের রক্ষিতার দল তাদের উপপতির পদ সেবা করেছে!

এবং ঐ ভাবেই ভারতীয় ভারতকে শ্বেতাঙ্গ সরকার বৃটিশ ভারতবাসীর কাছে বিদেশী করে রেখেছে।

তথাপি এতে করেও সেখানকার জনগণের মধ্যে মুক্তির আকাঙ্খাকে চেপে রাখা যায় নি।

শোষণের জগদ্দল পাথরকে তারা অনিবার্য বলে মেনে নেয় নি।

মেনে নেয়নি তারা চির দাসত্বকেই ভাগ্যের দুর্লঙ্ঘ আদেশ বলে।

যদিচ ১৮৫৭র অগ্নি-বিপ্লবে দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে বেশীর ভাগই ঘৃণ্যতম

ভূমিকা গ্রহণ করে দেশের ও জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল তথাপি দেশীয় রাজ্যের কিয়দংশ সেদিনকার সেই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে বিদ্রোহীদের পাশে এসেও দাঁড়িয়েছিল। এবং ১৮৫৭র রক্ত বিদ্রোহের পাতায় তাঁতিয়া টোপি, টিকেন্দ্রজিৎ ও ঝান্সীর রাণী প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যের নেতারা তাদেরই সাক্ষ্য দেবে চিরকাল।

তাদের আমরা ভুলিনি।

ভুলতে পারি না।

উনিশ শতক সাম্রাজ্যবাদের মহালগ্ন বা চরম বিকাশ মুহূর্ত।

কিন্তু ভাঙ্গণ ধরতেও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে দেরী হয়নি সেদিন কারণ বিংশ শতকের আরম্ভ থেকেই জগৎব্যাপী ধনতান্ত্রিক সভ্যতার যে নিষ্ঠুর অভিশাপ অর্থাৎ আভ্যন্তরিক বিরোধিতা, তারই স্পষ্ট বিকাশ দেখা দিতে সুরু করলো।

যার ভয়াবহ স্বাক্ষর রক্তাক্ষরে লিখিত হয়েছে ১৯১৪ সনের প্রথম মহাযুদ্ধের মাত্র কুড়ি বৎসরের ব্যবধানেই ১৯৩৯য়ের দ্বিতীয় জগৎব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের যুদ্ধনামক নৃশংস বর্বরতা ও বিভীষিকায়।

কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতার আপাতঃ বিরোধিতাই তো সব নয়—ও পথের প্রতিশ্রুতি একমাত্র জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেই।

১৯০৮ সালে ত্রিবাঙ্কুরে হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে হিন্দু প্রজারাই যখন বিদ্রোহ ঘোষণা করে—দেশীয় রাজ্যের জনগণ তখনও ঐক্য ও সুসংবদ্ধ হতে শেখেনি।

তাই ১৯০৮ সালের বিদ্রোহী নেতা ভেলু থাম্পি সশস্ত্র কৃষাণের অভিযান চালিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজপ্রাসাদ অধিকার করেও ধরে রাখতে পারলে না।

তাদের ব্রিটিশ শক্তি দমন করে এবং শহীদ ভেলু থাম্পিকে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল।

ইতিহাসে দেখা যায় ব্রিটিশ ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস গ্রহণ করেছে ১৮৮৫ খৃঃ থেকে এবং স্টেট্ কংগ্রেসের জন্ম ১৯২৯ সালে।

১৯২৯ সালে স্টেট্ কংগ্রেস গঠনের অব্যবহিত পরেই এলো ১৯৩০ সাল।

এলো আইন অমান্য আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আসমুদ্র হিমাচল ব্যাপী ভারতের গণ অভ্যুত্থান মহাত্মার আহ্বানে।

সে ঝড়ের ঝাপটা গিয়ে দেশীয় রাজ্যের মধ্যেও জাগাল চঞ্চলতা।

এবং টেরী গাড়োয়াল থেকে সুরু করে সুদূর দাক্ষিণাত্যের কোন কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজারাও ঐ আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে।

কিন্তু ১৯৩০য়ের আন্দোলন সর্বভারতীয় হলেও প্রকৃতপক্ষে দেশীয় রাজ্যের নয়। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যের নিজস্ব অভাব অভিযোগের উপরে ঐ আন্দোলন গড়ে ওঠেনি সেদিন।

কারণ সত্যিকারের রাজনৈতিক চেতনা বলতে যা বুঝায় দেশীয় রাজ্যের জনগণের মধ্যে তখনও সেটা জাগেনি।

কিন্তু সে অবশ্যম্ভাবী চেতনাকেও বেশীদিন দেশীয় রাজ্যের শাসকেরা চাপা দিয়ে রাখতে পারলে না। কারণ যে ভাবে তারা তাদের শোষণকে অব্যাহত রাখতে গিয়ে নিজেদের অধীনে রাজা, মহারাজা ও তালুকদার সৃষ্টি করতে সুরু করেছিল সঙ্কট তাতেই অত্যাসন্ন হয়ে এলো ক্রমে করালমূর্তিতে।

শুধু রাজা মহারাজা সৃষ্টিই নয়, রাজ্যের রাজস্বের সর্বাপেক্ষা বড় অংশ যে ভাবে নিজেদের বিলাস ব্যসনে ব্যয় করার জন্য তারা যে অত্যাচার সুরু করলো তাতেই দেখা দিল অসন্তোষের আগুণ!

এলো চেতনা!

এবং পীড়নে পীড়নে প্রজাদের অবস্থা যতই শোচনীয় হয়ে উঠ্‌তে লাগল ততই জনগণের মধ্যে অসন্তোষের বহ্নি ব্যাপক হয়ে দেখা দিতে লাগল।

একদিকে অত্যাচার, শোষণ ও নিজেদের দুঃসহ অবস্থা, অন্যদিকে ব্রিটিশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অগ্নিতপ্ত হাওয়া বিদ্রোহের বীজ রোপণ করতে সুরু করলো তথাকথিত ভারতীয় জনগণের মনে।

ইতিপূর্বে বিংশ শতকের প্রারম্ভে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে দেওয়ানের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা বিদ্রোহ জানায়।

স্টেট্ কংগ্রেস সক্রিয় হয়ে উঠ্‌ল।

আন্দোলনকে কণ্ঠ টিপে মারবার জন্য শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত দমন নীতির প্রয়োগ সুরু হলো।

লাঠি চার্জ আর গুলি বর্ষণ!

রক্তে লাল হয়ে উঠ্‌লো ত্রিবাঙ্কুরের মাটি।

শেষ পর্যন্ত সরকার সমস্ত "অপরাধী"কে ক্ষমা করতে রাজী হলো।

দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে

গেলেন। এবং তারই নির্দেশে নেতারা তাদের প্রস্তাবগুলি নিয়ে তদানীন্তন দেওয়ান স্যার সি, পি, রামস্বামী আয়ারের কাছে দাখিল করল।

কিন্তু সরকারের চিরদিনের শঠতা যাবে কোথায়!

দায়িত্বশীল সরকারের বিরুদ্ধে জনসাধারণ পেল বর্বর নিষ্ঠুর দমননীতি।

আন্দোলনকারীদের মধ্যে দু'জন ফাঁসির মঞ্চে দিল প্রাণ—শত শত ব্যক্তির দীর্ঘ দিনের জন্য হলো সশ্রম কারাদণ্ডাদেশ।

বহু বীর যোদ্ধার সম্পত্তি কুৎসিত ভাবে সরকার বাজেয়াপ্ত করে নিল।

১৯৩৫ সনের শাসনতন্ত্রে ভারতের বিভিন্ন অংশকে নিয়ে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়।

বোধ হয় ব্রিটিশ সরকারের তরফ থেকে 'ব্রিটিশ ভারত' এবং 'ভারতীয় ভারত' সম্পর্কে ঐক্যমূলক ধারণা ঐ প্রথম।

অবশ্য বলাই বাহুল্য যে কোন সদভিপ্রায়ের বশবর্তী হ'য়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় ভারত তথা দেশীয় রাজ্যগুলিকে এক সংগে যুক্ত করতে চায়নি।

কারণ সকলেই তো জানেন সরকারের কুখ্যাত মণ্টেগু চেম্‌স্‌ফোর্ড শাসন সংস্কারে সর্বপ্রথমে দেশীয় রাজ্যগুলির Paramountcy গৌণভাবেই স্বীকার করা হয়েছিল।

এবং ১৯২১ সালের ঐ প্রস্তাব যখন গৃহীত হয় তখন শ্বেতাঙ্গ শোষিত ভারতে "উদারনীতিক" রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরে নেমে এল যবনিকা এবং ভারত দাঁড়িয়েছে এসে নতুন যুগের এক সন্ধিক্ষণের মুখে তখন।

ভারতের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাসের পাতায় সে এক রক্তরাঙা ইংগীত।

১৯৩৮ সনে ত্রিবাঙ্কুরের জনসাধারণ যখন স্বাধিকারের জন্য লড়াই করছে, ঠিক সেই সময়েই হায়দ্রাবাদে বিরাট 'ওম্‌' আন্দোলন হয়েছে সুরু।

হায়দ্রাবাদের 'ওম্‌' বা প্রজা আন্দোলনের পশ্চাতে অবশ্য বেশী ছিল সাম্প্রদায়িক যুক্তি।

বিচিত্র হায়দ্রাবাদের ইতিহাস।

জনসংখ্যা—১৯,৬৩৬,১৫৭। রাজস্ব বাৎসরিক আদায় হয়, ১৫৮২,৪৩ লক্ষ টাকা।

মুঘল শাসনের ভাঙনের মুখে চারিদিকে যখন বিশৃংখলা ও স্বৈরাচার চলেছে সেই সময় প্রথম আসফ ঝাঁ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। হায়দ্রাবাদের এবং ভারতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব বিস্তারের প্রথম যুগ থেকেই আসফ ঝাঁ শ্বেতাঙ্গ পদাশ্রয়ী হ'য়ে তাদের কৃপালাভ করে ধন্য হয় এবং নিজেকে কায়েমী করে।

পরে লর্ড ওয়েলেসলির মিষ্টভাষী নীতি "Subsidiary alliance" গ্রহণ করে পরম নিশ্চিন্তে এবং নিরাপদেই রাজত্ব করে আসতে থাকে।

ঐ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের কিছুকাল পরেই স্টেট্ কংগ্রেস হায়দ্রাবাদের রাজনীতিতে এসে মাথা গলাল।

কিন্তু চির ধূর্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার সংগে সংগে এক নিষেধাজ্ঞা জারী করে দিল।

এবং ১৯২৬ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর ঐ নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকে।

এদিকে আবার ১৯৩৮'য়ে তালচের প্রভৃতি উড়িষ্যার কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে।

ঐ সব আন্দোলনে নেতৃত্ব গ্রহণ করে বাজী রাউৎ, বৈষ্ণব পট্টনায়ক প্রভৃতি ব্যক্তিরা।

১৯৩০ সাল থেকেই বলতে গেলে কাশ্মীরে প্রজা আন্দোলনের জন্ম।

হায়দ্রাবাদের কুখ্যাত নিজামের মতই দেশের শত্রু জাতির শত্রু গুলাব সিং ও তার প্রভুদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করে শ্বেতাঙ্গদের পাঞ্জাব অধিকারে সহায়তা করে।

এবং সেই দেশদ্রোহীতার পুরস্কার স্বরূপই ৭৫,০০০০০৲ টাকার বিনিময়ে শ্বেতাঙ্গরা গুলাব সিংকে কাশ্মীর বিক্রয় করে।

১৯৩০ সালেই শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে ডোগরা ব্রিটিশ কায়েমী শয়তানী প্রথম আঘাত পেল।

এবং কাশ্মীরের সমস্ত শাসনতান্ত্রিক যন্ত্রই সে আঘাতে দুলে উঠ্‌লো।

যুদ্ধপূর্ব দেশীয় রাজ্যগুলির রাজনীতিকে পর্যালোচনা করলে সহজেই বোঝা যায় যুক্তিবাদী নেতৃত্বের অভাব, রাজন্যবর্গ কর্তৃক সাম্প্রদায়িক সুযোগ গ্রহণ এবং তারই পাশে পাশে ও সঙ্গে সঙ্গে অসীম বিপত্তি ও বহুবিধ দুর্দশার মধ্যেও হতভাগ্য নিপীড়িত প্রজাবৃন্দের ক্লান্তিহীন একনিষ্ঠ সংগ্রাম।

এবং সকল কিছুরই পশ্চাতে রয়েছে বরাবর শ্বেতাঙ্গ সরকারের কূট-সাম্প্রদায়িক ভেদনীতি Divide and Rule!

১৯৩৮ সন থেকেই প্রজা আন্দোলন তার যথার্থ পথ খুঁজে পাবার চেষ্টা করে।

১৯৪২য়ের ভারতব্যাপী 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ঢেউ দেশীয় রাজ্যেও গিয়ে আঘাত হানে।

এবং অত্যাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কাশ্মীরেও 'কাশ্মীর ছাড়' আন্দোলন দেখা দেয়।

যুদ্ধ শেষের সঙ্গে সঙ্গে গণ-আন্দোলনও দাবাগ্নির মতই লেলিহ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল। সুরু হলো ভায়ালা, আলেপ্পীতে জনগণের মুক্তির জন্য অমর সংগ্রাম।

ত্রিবাঙ্কুরের কৃষক মজুরের দলও নবোদ্যমে সংগ্রামের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল।

সংগ্রাম সুরু হলো হায়দ্রাবাদে এবং আগুণ দেখা দিল কোচীনেও।

কাশ্মীরও সেই সঙ্গে রুখে দাঁড়াল।

১৯৪৬য়ে ট্রেড ইউনিয়ানের প্রাথমিক আন্দোলনকে সরকার হরন করায় এগিয়ে এলো সাম্যবাদী নেতারা—আন্দোলনের পুরোভাগে।

বেআইনী!

শ্বেতাঙ্গ সরকার বেআইনী বলে ঘোষণা করল এবং সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠ্‌লো সরকারের হাতের অগ্নিনালিকা।

সহস্র সহস্র শ্রমিকের বুকের রক্তে মাটি রাঙা হলো।

অগণিত শ্রমিক কারাগারে হলো নিক্ষিপ্ত।

অন্ধ্র সম্মেলনের নেতা ও সংগঠক কোমারিয়াকে শ্বেতাঙ্গ সরকার নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলো।

কৃষান মজুরের দল তাদের প্রিয় নেতার মৃতদেহ শোভাযাত্রা করে সহরে নিয়ে গেল।

আন্দোলনের অগ্নিশিখা আকাশে ছড়িয়ে যেতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপা কুত্তার মত সরকারের চামুণ্ডারা সংগ্রামীদের উপরে দানবীয় জিঘাংসায় ঝাঁপিয়ে পড়ল ধারালো নখর বিস্তার করে।

চললো অবাধে পৈশাচিক অত্যাচার।

গুলি বর্ষণ! লাঠি চার্জ—লুণ্ঠন ও নারী ধর্ষণ!

হায়দ্রাবাদে পরউচ্ছিষ্ট লোভী দেশদ্রোহী নিজামকে কেন্দ্র করে স্বৈরাচার ও অত্যাচারের যে দানবীয় তাণ্ডব নৃত্য বহেছিল সেদিন, ভারতের মুক্তি ইতিহাসের পাতায় তা চিরদিন স্বর্ণাক্ষরেই লেখা থাকবে।

শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার কাশ্মীরের আন্দোলন এবং তার গ্রেপ্তারের পরে সেখানকার প্রধান মন্ত্রী ঘৃণিতচরিত্র রামচন্দ্র কাকের পাশবিক দমন নীতি—সে ভুলবার নয়।

ডোগরারাজ কাশ্মীর কো ছোড় দো।

বায়নামা অমৃতসর তোড় দো।

কাশ্মীরের সে ডাক দিগ দিগন্তে ছড়িয়ে গেল।

অত্যাচারও চলতে লাগল পুরো মাত্রাতেই ঐ সঙ্গে সঙ্গে।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে গোয়ালিয়র, আলোয়ার, যশলমীর, বিকানীর, রামপুর, কাশ্মীর, রতলম, ভরতপুর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর, জয়পুর, মাড়োয়ার, বেওয়া ও ইন্দোরের মাটি পঞ্চ সহস্রাধিক শহীদের বুকের রক্তে লাল হয়ে গেল।

ঐ সঙ্গে স্মরণ করি আজ তেলেঙ্গানার সেই দ্বাদশ বীর সৈনিককে।

দুঃখজয়ী দ্বাদশ মুক্তি যজ্ঞের হোমানলে আত্মসমর্পিত বীর তেলেঙ্গানা সন্তান—যাদের মাথার উপরে নেমে এসেছিল চরমদণ্ড।

কণ্ঠকে যাদের বেষ্টন করবার জন্য দ্বাদশটি ফাঁসির রজ্জু অপেক্ষমান হয়েছিল দীর্ঘদিন। সুপ্রীম কোর্ট বা আদালতে পর্যন্ত যাদের প্রাণদণ্ডাদেশ বহাল রেখেছিল তারপর তাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্রপ্রসাদ মৃত্যুর বদলে দিয়েছেন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দ্বাদশ সেই বীর সৈনিককে প্রণাম জানাই।

দ্বাদশ ঐ তেলেঙ্গানা বীরের মধ্যে আটজন মাত্র কুড়ি বৎসরের সামান্য কম বেশী বয়েসে এবং সর্বজ্যেষ্ঠ যে তাদের মধ্যে তার মাত্র ঊনত্রিশ বৎসর বয়স।

হিন্দু, মুশলিম ও ক্রিশ্চান দ্বাদশ জন।

কৃষাণ, মজদুর, ছাত্র, ছুতোর, মিস্ত্রী ও দর্জি প্রভৃতি দ্বাদশটি অশিক্ষিত তেলেঙ্গানা সন্তান যাদের নাম আজ তেলেঙ্গানা কৃষাণ আন্দোলনের পুরোপৃষ্ঠায় জ্বল জ্বল করে রক্তাক্ষরে ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতাঙ্গের লৌহমুষ্টি যখন ভারতের বুক থেকে শিথিল হয়ে আসছে ক্রমে—৪২য়ের রক্তক্ষয়ী পরিপ্রেক্ষিতে চারিদিক কৃষক ও মজদুর আন্দোলন, নৌবিদ্রোহ ও সেনা বিদ্রোহ, কাশ্মীর ত্রিবাঙ্কুর ও হায়দারাবাদে গণবিদ্রোহ—এই দ্বাদশ তেলেঙ্গাণা ঐ হায়দরাবাদের কিষাণ বিদ্রোহের বহুজনার মধ্যে এসে দাঁড়াল।

ব্রিটিশ পদলেহী নিজাম।

শোষণে শোষণে জীর্ণ রক্তশূন্য হায়দরাবাদের কিষাণের দল মাথা উঁচু করে দাঁড়াল চিরাচরিত জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে।

কাশীম রাজভী ও তার রাজাকরদের উৎকট স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে।

এবং কাশ্মীরের মত হায়দরাবাদেও জমির বা মাটির প্রশ্নটাই আন্দোলনের মূল কথা!

ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিকের নালিশ।

অত্যাচারীর বিরুদ্ধে শোষিতের নালিশ।

বাঁচতে চায় তারা। ন্যায্য অধিকারে দেশের মাটিতে বেঁচে থাকতে চায়।

চায় মুক্তি! চায় স্বাধীনতা!

জমির মালিক মূলত দেশমুখ ও জায়গীরদারদের দল।

শুধু কি তারা জমিরই মালিক, যারা ঐ জমিতে দেহের স্বেদ দিয়ে সোনার ফসল ফলায় তাদেরও মালিক।

দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা!

হায়দরাবাদের একটি অংশ তেলেঙ্গাণা।

তেলেঙ্গাণার একটি জিলা নালগোণ্ডা।

নালগোণ্ডার গাঁনিগাঁও তালুকেই তেলেঙ্গাণা কাহিনীর সুরু।

গানগাঁওয়ের জমিদার বিষ্ণু রেড্ডী তার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দের কাছ থেকে ছলে বলে কৌশলে ৮০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করে গড়ে তোলে এক বাংলো।

অধীনস্থ কৃষাণদের কাছ থেকে ঐ বাংলোর সমস্ত কাঠ সংগৃহীত ত হলোই তাদেরই গরুর গাড়ীতে করে তাদের বাধ্য করা হলো বহে এনে দিতেও।

বিনিময়ে কাঠ বাবদ বা পরিশ্রম বাবদ তাদের একটি কপর্দকও মিলল না।

শতাধিক দুঃস্থ মজুরকে বিনাবেতনে খাটিয়ে জোর করে বাংলোটি গঠন করা হলো।

একশত সৈনিক নিয়ে বিষ্ণু রেড্ডীর এক সেনাবাহিনী তাদের সামনে খাড়া রেখে ঐ বাংলোর মধ্যেই বসাল বিচারালয় এবং মজুর কৃষাণদের আবেদন নিবেদন শোনবার বিচার করবার অজুহাতে প্রায় লক্ষাধিক মুদ্রা বিষ্ণু রেড্ডী হতভাগ্যদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে নিল।

তার উপরে প্রজাদের উপরে নানাবিধ ট্যাক্স ও জরিমানার তো কথাই নেই।

মেয়ের বিবাহ, পিতার শ্রাদ্ধ, নতুন মটোর গাড়ী ক্রয় সব অবাধে সংগৃহীত হ'তে লাগল প্রজাদের কাছ থেকে জোর জুলুম করে ট্যাক্স আদায়ের অর্থের দ্বারা।

অত্যাচারে অত্যাচারে শোষিত জর্জরিত প্রজারা আর সহ্য করতে পারলে না এবারে তারা সংঘবদ্ধ হ'ল।

অত্যাচারী জমিদার বিষ্ণুরেড্ডীর বিরুদ্ধে মাথা তুলে মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াল। উভয় দলের প্রথম সংঘর্ষে বন্দাগীসাহেব নামে এক কৃষাণ ভাই বুকের রক্তে বিদ্রোহের রক্তরাঙা পতাকাকে উড্ডীন করে দিয়ে গেল।

নির্দোষ নিরীহ এক কৃষাণের রক্তে গানগাঁওয়ের মাটি রাঙা হয়ে উঠলো।

আগেকার দিন হলে হয়ত বন্দাগীসাহেবের মৃত্যুর ব্যাপারটা ধামা চাপাই পড়ে যেত এবারে কিন্তু তা হলো না।

অন্ধ্র মহাসভা নামে জন প্রতিষ্ঠান বিষ্ণু রেড্ডীর ঐ ঘৃণিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এলো।

তারা এসে কৃষাণ ভাইদের ডেকে বললে, সব এক সাথে দাঁড়াও। শুধু বিষ্ণু রেড্ডীরই এ অত্যাচার নয়, সমস্ত জমিদারের চিরদিনের এ অত্যাচার আর আমরা সইবো না।

কৃষাণদের এক শোভাযাত্রা জমিদারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিয়ে অন্ধ্র মহাসভা কার্যালয়ের দিকে এগিয়ে চলল—ওদিকে বিষ্ণু রেড্ডীর ভাড়াটে গুণ্ডার দল লাঠিসোটা বন্দুক নিয়ে শ্রমিক কৃষাণদের পথ রোধ করে দাঁড়াল।

দুই দল মুখোমুখী হতেই সুরু হলো গুলিবর্ষণ!

অন্ধ্র মহাসভার অন্যতম কর্মী কুমারায়া বন্দুকের গুলিতে প্রাণ দিল।

আগুণের মতই সে হত্যা-সংবাদ শ্রমিক ও কৃষাণদের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। রক্ত! হত্যা!—হাজারে হাজারে তারা হাতের কাছে যে যা অস্ত্র পেলে তাই নিয়েই ছুটে এলো।

বন্যার মুখে কুটোর মতই রেড্ডীর ভাড়াটে গুণ্ডারা হাতের অস্ত্র সস্ত্র ঐখানেই ফেলে যে যেদিকে পারল প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাল।

বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে নিজাম সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গানগাঁওয়ে প্রেরণ করল কিন্তু প্রজাবৃন্দ তাদের বর্জন করায় বাধ্য হয়েই তাদের হটে যেতে হলো।

প্রাণ ভয়ে ভীত বিষ্ণু রেড্ডী হায়দারবাদের দিকে পালিয়ে গেল।

তেলেঙ্গাণা বিদ্রোহের এই সূত্রপাত। পরবর্তীকালে প্রায় বিংশ সহস্র গাঁ

নিয়ে ন্যূনাধিক পঞ্চ লক্ষ কৃষাণের মুক্তি অভিযানের অঙ্কুর ঐভাবেই রক্ত সিক্ত মাটিতে প্রথম রোপিত হলো।

তেলেঙ্গাণা থেকে বিদ্রোহের আগুণ দিকে দিকে ছড়িয়ে গেল!

আমরা কৃষাণ! জমি আমাদের।

বুকের রক্ত ঢেলে যারা জমি চাষ করে ফসল ফলায় জমি সত্যিকারের তাদেরই, জমির মালিক জমিদাররা নয়; কৃষাণরাই ত সত্যিকারের জমির মালিক।

Land to the tiller!

পুঁজিবাদী ধনিকের প্রতি হৃত সর্বস্ব শ্রমিকের এ বিদ্রোহ জাতির মুক্তির রক্তক্ষয়ী ইতিবৃত্তের পাতায় এই কথাটাই স্মরণ করিয়ে দেয় যারা ঐ অগণিত জনগণের কল্যাণের অভিভাবকত্বের ছলে বহু কাল ধরে দেশে দেশে চরম বিশ্বাসঘাতকাতরাই পরিচয় দিয়েছে! যারা নিজেদের পুঁজিকে ভরিয়ে তুলবার জন্য মাত্র জমির মালেকানা সত্বে লক্ষ লক্ষ অসহায় শ্রমিক জনগণের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যকে আহুতিরূপে গ্রহণ করেছে তারা দেশের ও জাতির শত্রু তো বটেই মানবতারও শত্রু! আগামী দিনের স্বাধীন ভারতের শত্রু।

বিস্তৃত বিদ্রোহের অনলকে নির্বাপিত করবার জন্য নিজামের এবং রাজাকরদের দানবীয় পশুশক্তি নিয়ে বিদ্রোহীদের উপরে সিংহ বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ ও অগ্নিদাহ চারিদিকে পৈশাচিক বর্বরতায় সুরু হ'য়ে গেল।

তথাপি মৃত্যুপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেলঙ্গাণারা হটে গেল না।

সম্মুখ যুদ্ধে তারা দৃঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। জমির মালিক সত্যিকারের তারাই! চিরকালের ভোগ দখলকারী রাজাকর বা দেশমুখের দল নয়।

এলো ১৯৪৭ সাল!

গ্রামে গ্রামে তখন বিদ্রোহের অনল ব্যাপ্ত হয়ে চলেছে।

এমন সময় তেলেঙ্গানার বিদ্রোহীরা শুনতে পেল, ব্রিটিশ প্রভুরা সত্য সত্যই নাকি এতদিনে ভারত ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করে হিন্দুস্থান ও পাকিস্তানে—১৫ই আগষ্টে।

যদিও তাতে করে হায়দারাবাদের জনগণের কোন পরিবর্তনই আসছে না কারণ তখনও থাকছে সেই নিজাম ও অত্যাচারী রাজাকরের দল দেশে।

কিন্তু অত্যাচারিত অশিক্ষিত কৃষাণের দল ভাবলে এলো বুঝি সত্যিকারের তাদের মুক্তির দিন আরো অনেকের মতই!

কিন্তু কুখ্যাত শ্বেতাঙ্গ শাসকদলের ভারত ত্যাগের পূর্বে শেষ কূটনৈতিকচালে প্রলুব্ধ হ'য়ে নিজাম তখন হিন্দুস্থান ভারতের সঙ্গে হাত মিলাতে স্বীকৃত হলো না। সে তার হায়দারাবাদের পৃথক সত্বা নিয়েই দূরে থাকতে চাইল।

হায়দারাবাদের নিজামীয় পুলিশ ও রাজাকরদের সম্মিলিত বর্বর প্রতিরোধের বিরুদ্ধে জনগণ রুখে দাঁড়াল!

বন্যার মুখে কুটোর মতই নিজাম ও রাজাকরদের সম্মিলিত বর্বর ও পৈশাচিক প্রতিরোধ জনগণের দুর্ধর্ষ সংগ্রামের মুখে ভেসে গেল।

বিজয়লক্ষ্মী জনগণের গলাতেই বিজয়মাল্য দুলিয়ে দিলেন।

তেলেঙ্গানা ইতিহাসের পাতায় সে এক সুবর্ণখচিত পর্ব!

নতুন করে তারা গড়ে তুলল তাদের দেশকে।

তাদের শাসনপদ্ধতি তাদের সৈন্যবাহিনী রচনা করলো এক নতুন ইতিহাস।

সামন্ততান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ ছয় মাসের সশস্ত্র সংগ্রামে তেলেঙ্গানাদেরও কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি।

৪০৯ জন কৃষাণ ভাই ও ১৭ জন কৃষাণী ভগ্নীকে তাদের ঐ মুক্তি যজ্ঞে আহুতি দিতে হয়েছে।

৭০৬ জন পুরুষ ও ৪১ জন স্ত্রীলোক আহত হয়েছে, এ ছাড়া বহু টাকা মূল্যের ঘর-বাড়ী ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

কিন্তু বিনিময়ে তারা পঞ্চ সহস্রাধিক গ্রাম হ'তে নিষ্ঠুর বর্বর চিরাচরিত সামন্ততান্ত্রিকতাকে লোপ করেছে, নিজামের করালা লৌহ মুষ্ঠি হতে ছিনিয়ে নিয়েছে।

মুক্ত স্বাধীন তেলেঙ্গাণা।

সফল হয়েছে তাাদের এতদিনের স্বপ্ন!

নিজেদের মধ্যে তারা জমি বণ্টন করে নিয়েছে, নিজেদের পঞ্চায়েত, বিচার বিভাগ, দেশরক্ষা বিভাগ, শিক্ষা বিভাগ, শাসন বিভাগ সব কিছুই তারা নতুন করে গড়ে তুলেছে।

১৩ হাজার বর্গমাইল ধরে বিস্তৃত ভূখণ্ডে চল্লিশ লক্ষের অধিক লোক নিয়ে গড়ে উঠেছে এক চির সুখের রাজ্য।

এক স্বাধীন ভূখণ্ড।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম রত কংগ্রেসও দীর্ঘকাল ধরে ঐ স্বপ্নই দেখেছিল

এবং দেশের অগণিত, কৃষাণদের বহুবার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুও ঐ কথাই বলেছেন।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তেলেঙ্গণার সুখের স্বপ্ন বুঝি মরিচীকার মতই মিলিয়ে গেল, চিরদিনের অত্যাচারী ধনিক শাসকের দল কৃষাণদের ঐ সাফল্য দেখে দেশের সর্বত্র আশঙ্কা ও ভয়ে যেন মরিয়া হয়েই রুখে দাঁড়াল।

হায়দারাবাদের দিকে দিকে গ্রামে গ্রামে চলেছে তখন কৃষাণদের অভিযান।

সমস্ত বাধা ও আশঙ্কাকে অতিক্রমে করে তারা তাদের পুরুষ ও পুরুষানুক্রমের স্বেদসিক্ত প্রিয় মাটিকে বুকের পাজর ভাঙা প্রীতি দিয়ে সিক্ত মাটিকে আপনাদের করায়ত্ব করে চলেছে।

**Land to the tiller !**

জমির মালিক তারাই যারা চালায় জমিতে লাঙল।

ফলায় রৌদ্র জল বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে দেহ ভাঙ্গা পরিশ্রমে সোনার ফসল যারা জমিতে, মাটিতে।

নিজাম কূটচক্রী জমিদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে কিষাণদের সঙ্গে সন্ধি করলে।

সন্ধি-পত্র স্বাক্ষরিত হলো।

নিজাম কিছুটা সময় পেল সংগ্রামের বিরতির মধ্যে কিন্তু তার দুরভিসন্ধি পূর্ণ হলো না।

সে চেয়েছিল ঐ ফাঁকে কিষাণদের শেষ করে ফেলবে কিন্তু সক্ষম হলো না।

এবারে সে স্মরণাপন্ন হলো ভারত সরকারের।

এগিয়ে এলো এবারে ভারত সরকারের বিরাট সশস্ত্র বাহিনী।

এগিয়ে চলুক ভারত সরকারের সশস্ত্র বাহিনী পায়ে পায়ে।

স্বপ্নের শবের উপর দিয়ে শক্তি ও লোভের অভিযান চলুক এই ফাঁকে আরো কয়েকটা বৎসরের ভারতের ইতিহাসের পূর্ব সংগ্রামের পৃষ্ঠাগুলোতে একবার দৃষ্টি দিয়ে যাই।

১৯৩৪—৭ই জানুয়ারী চট্টগ্রামে ক্রিকেট খেলার ময়দানে বিপ্লবীদের সংঘর্ষে লেবঙ্গে তদানীন্তন বাংলার গভর্নর স্যার জন এণ্ডারসনকে হত্যা করবার জন্য

বিপ্লবী ভবানী ভট্টাচার্য, উজ্জ্বলা মজুমদার, মনোরঞ্জন ব্যানার্জী, রবীন ব্যানার্জী, মধু ব্যানার্জী ও সুকুমার ঘোষ দার্জিলিং যায়।

দার্জিলিংয়ের লেবঙ্গ ঘোড়দৌড়ের ময়দানে গভর্নরকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে কিন্তু গভর্নরের সৌভাগ্য সে অক্ষতই থেকে যায়।

সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার সুরু করে সরকারী চেলা চামুণ্ডারা।

অনেকেই ধৃত হয়।

সুরু হয় বিচার।

বিচারে ভবানী ভট্টাচার্যের প্রতি ফাঁসির আদেশ হয় এবং মনোরঞ্জন, সুকুমার, উজ্জ্বলা ও মধু বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজনের প্রতি আদেশ হয় বিভিন্ন মেয়াদে কারাদণ্ড।

ঐ বৎসরেই—১৯৩৪য়েই চট্টগ্রামের বাঘুয়াতে ডাকাতির অভিযোগে এক মামলা সরকার রুজু করে বাঘুয়া ষড়যন্ত্র মামলা নাম দিয়ে।

মোক্ষদা ও প্রিয়দা চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজনের বিভিন্ন মেয়াদে বিচারে কারাদণ্ডাদেশ হয়।

তার পরই ১৯৩৫ সাল।

সুদক্ষ সরকার বাহাদুর দেশের বিভিন্ন স্থান হতে নানা বয়েসী ২০।২২ জন যুবককে ধৃত করে 'টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলা' নাম দিয়ে এক মামলার পত্তন করে।

দীর্ঘ দিন ধরে বিচার প্রহসন চালিয়ে পূর্ণানন্দ দাশগুপ্তকে যাজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ও অন্যান্য কয়েকজনকে চার হ'তে চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ দেওয়া হলো।

১৯৩৫য়ে হীরালাল চক্রবর্তীকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা করার জন্য অমূল্য রায়কে নিয়ে যে বিচার প্রহসন হয় তাহাতে তার প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হয়।

ঐ বৎসরেই জুন মাসে ফরিদপুরের কোটালীপাড়া—মদনপুর গ্রামের গোয়েন্দা পুলিশ কালিপদ ভট্টাচার্যকে ছোরার সাহায্যে আক্রমণ করবার অভিযোগে আশু ভরদ্বাজ ও অমূল্য চৌধুরীর প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়।

আরো কিছুকাল পরে ১৯৩৭ সনে ফেব্রুয়ারী মাসে আবার চট্টগ্রামে একজন গুপ্তচরকে হত্যার প্রচেষ্টায় অমূল্য আচার্যের প্রতি দশ বৎসর কারাদণ্ডাদেশ হয়।

এবং প্রকৃত পক্ষে সাগর পারের দেশগুলিতেও ঐ সময় থেকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের গোপন তোড়জোড় চারিদিকে দ্রুত অগ্রসর হতে থাকে ও শোনা যেতে থাকে হুমকি।

১৯৩৫য়ে ভারতের দ্বৈতশাসনের অবসান, প্রাদেশিক শাসন—স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা সমন্বিত একটি যুক্তরাষ্ট্র স্থাপনের ভিত্তিতে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টে একটি নতুন ভারত-শাসন আইন পাশ হয়।

নতুন ভারত-শাসন আইনটি প্রকৃত পক্ষে কিছুই নয়, শ্বেতাঙ্গ সরকারের চিরাচরিত আর একটি ভড়ং মাত্র।

তারপর ১৯৩৭—১লা এপ্রিল যখন শ্বেতাঙ্গদের রচিত ঐ সব শাসনতন্ত্র ভারতে প্রবর্তিত হলো, ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস প্রথমে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারলেও ইতিমধ্যেই মুসলীম লীগ দল প্রদেশে প্রদেশে অস্থায়ী মন্ত্রীমণ্ডল গঠনে শ্বেতাঙ্গ সরকারকে সাহায্য করে মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করতে সুরু করে দিল।

পণ্ডিত নেহেরু শ্বেতাঙ্গের ঐ নতুন শাসন-তন্ত্রকে "দাসত্বের নূতন সনদ" নামে ব্যাখ্যা করলেন।

এবং সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও কয়েক মাস যাবৎ দূরে দূরেই সরে রইলো কংগ্রেস, মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজী হলো না। অবশেষে ভারতের তদানীন্তন বড় লাট লর্ড লিনলিথগো যখন এক ফতোয়া জারী করে কংগ্রেস নেতাদের আশ্বাস দিলেন যে, প্রদেশের দৈনন্দিন শাসন-কার্য পরিচালনায় প্রদেশের ছোটলাট বাহাদুররা মন্ত্রীদের কার্যে হস্তক্ষেপ করবেন না তখন জুলাই মাসে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ প্রদেশের মন্ত্রীত্ব গ্রহণে সম্মত হলো এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ, সংযুক্ত প্রদেশ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ ও ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করলো তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছামত।

কিছুদিন পরে অন্যান্য দলের সঙ্গে সিন্ধু ও আসাম প্রদেশেও কংগ্রেস দল যৌথ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে।

•

প্রথম মহাসমরের পরে ভার্সাই সন্ধিক্রমে জয়ী দেশগুলি পরাজিত জার্মানীর উপরে যে অন্যায় ও অবিচার করে এবং যে ভাবে একাধিক শক্তি সম্মিলিত

ভাবে পরাজিত জার্মানীর স্কন্ধে বিগত যুদ্ধের সকল দোষারোপ চাপিয়ে দিয়ে সমস্ত জার্মান জাতিকে কোনঠাসা করে পঙ্গু করবার প্রয়াস পেয়েছিল তার ফল ফলতে খুব বেশী দেরী হলো না।

হিটলার নতুন করে জার্মানীকে গড়ে তুলে তার দেশের প্রতি অন্যায় ও অবিচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে তলে তলে সংগোপনে যে বিপুল প্রস্তুতি করেছিল হঠাৎ সেকথা একদিন আশপাশের দেশগুলো জানতে পেরে চমকে উঠ্‌লো যখন, তখন সে অবশ্যম্ভাবী এক প্রলয়ের আশু আক্রোশ হতে কারোই আর বাঁচবার উপায় নেই। এবং তা সত্বেও শ্বেতাঙ্গরা—ব্রিটিশ সুরুকরে দিল প্রকাশ্যে জার্মানীকে তোষণ ও গোপনে যুদ্ধ প্রস্তুতি।

১৯৩৮য়ের সম্পাদিত মিউনিক চুক্তি নব জার্মানীর সাম্রাজ্য লিপ্সাকে নিবৃত্ত করতে পারল না।

বিনা রক্তপাতে জার্মানী চেকোশ্লাভাকিয়া ও অষ্ট্রিয়া গ্রাস করেও শান্ত হলো না।

ব্রিটিশের যুদ্ধ এড়াবার সকল প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে ১৯৩৯য়ে ৩রা সেপটেম্বর ইউরোপে সর্বগ্রাসী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দামামা বেজে উঠ্‌লো।

এবং জার্মানীর প্রতি যুদ্ধ ঘোষণার মাত্র ৪৮ ঘণ্টা সময়ের মধ্যেই ভারতে শ্বেতাঙ্গ ভারত সরকার প্রবর্তন করলো তাদের কুখ্যাত বর্বর ভারতরক্ষা আইন।

যে আইনের গ্রাসে পড়ে ভারতবাসীর রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এমন কি দৈনন্দিন জীবন পর্যন্ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো।

ইউরোপের দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতের বিন্দুমাত্র স্বার্থ না থাকা সত্বেও ভারতীয় কোন নেতার সঙ্গে কোন পরামর্শ না করে, বা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রপরিষদের কোন মত না নিয়েই ভারতের শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং ভারবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তাদের জন্মভূমি ভারতকে যুদ্ধে লিপ্ত করে।

১৯৩৯ য়ের ১৫ই সেপটেম্বর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একটি অধিবেশনে স্থিরীকৃত হলো ভারত যুদ্ধে যোগদান করবে কিনা, একমাত্র তা ভারতের জনগনই স্থির করবে এবং ভারতে বা অন্য কোথাও সাম্রাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করবার জন্য পরিচালিত কোন যুদ্ধে কংগ্রেস কোন প্রকার সহযোগিতাই তাদের পক্ষ থেকে দান করবে না।

নেতারা অতঃপর স্পষ্টাক্ষরেই তদানীন্তন ভারত সরকারের কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিল : to declare in unequivocal terms what their war aims are in regard to Democracy and Imperialism and the new order that is envisaged !

এবং পূর্ববর্তী ১০ই অক্টোবরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কংগ্রেস নেতারা শুধু যে ব্রিটিশ গর্ভমেণ্টকে তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্যই ব্যাখ্যা করতে বললে তা নয় তার সঙ্গে দাবী জানালো—ভারতকে স্বাধীনতা দিতে হবে। India must be declared an independent nation, and present application must be given to this status to the largest possible extent !

বড়লাট বাহাদুর লর্ড লিনলিথগো সাহেব নেতাদের ঐ প্রশ্নের জবাবে এক বিবৃতি দিল ১৯৩৯—১৭ই অক্টোবর : ঘাবড়াও মাত্ মেরে বাচ্চে ! সব মিল যায়গা ! মুঠী ভর যায়গা।

At the end of the war they will be very willing to enter into consultation with representatives of the seveval communities and interest in India, and with the Indian Princes, with a view to securing their aid and co-operation in the framing of such modifications !

অহো !

কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।

কানের ভিতর দিয়ে একেবারে মরমে পশিল গো !

কেন ভাবছ বাছারা। আগে যুদ্ধ শেষ হোক তারপর স্বতোঃপ্রণোদিত হয়েই ভারতবাসীর প্রতি অন্তরের তাদের চিরদিনের সদইচ্ছার দ্বারা চালিত হয়েই তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করবে।

আলোচনা !

অনেক আলোচনা অনেক বৈঠকইত হয়েছে ইতিপূর্বে। হয়েছেত অনেক সাক্ষাৎকার ! অনেক শ্বেতাঙ্গ মহাত্মাই ত পূর্বে অনেক কথা বলেছেন সরকারের মুখপাত্র হিসাবে।

জানতে আর বাকী নেই কিছু !

তিক্ত অভিজ্ঞতা ছিল বলেই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতারা সর্ববাদি সম্মতিক্রমে

২২শে অক্টোবর শ্বেতাঙ্গদের জানিয়ে দিল—অক্ষম তারা এবারে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টকে কোনপ্রকার সাহায্য দান করতে।

এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গেই তারা প্রদেশের মন্ত্রীমণ্ডলীকে নির্দেশ দিল—বর্জন করো মন্ত্রীত্ব।

১৯৪০—১৭ই জুলাই ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের নিকটে এক প্রস্তাব পেশ করলো, অবিলম্বে তারা যদি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা Complete Independence ঘোষণা করে কেন্দ্রে একটি অস্থায়ী জাতীয় সরকার গঠন করতে দেয় তাহ'লে বিনিময়ে তারা ব্রিটিশকে যুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্য দানে প্রস্তুত আছে, অন্যথায় পাদমেকং ন গচ্ছামি।

লর্ড লিনলিথগো প্রত্যাখ্যান করলো সে প্রস্তাব। এবং ৮ই আগস্ট পেশ করলো আর একটী পাল্টা প্রস্তাব—বলাই বাহুল্য কংগ্রেসও সে প্রস্তাবকে পাল্টা প্রত্যাখ্যান জানাল।

অতঃপর সেপটেম্বর মাসে জাতীয় প্রতিষ্ঠান সীমাবদ্ধভাবে মহাত্মার নেতৃত্বে পুণরায় সত্যাগ্রহ সুরু করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো।

ইউরোপে ঐ সময় যুদ্ধের অবস্থাও সংকটজনক।

কংগ্রেস তাদের পরিকল্পনা মত একটি নির্দিষ্ট স্থানে নির্বাচিত সত্যাগ্রহীদের নিয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রচার কার্য চালাতে সুরু করলে।

শ্বেতাঙ্গ সরকার ক্ষেপে উঠ্‌লো এবং তাদের চিরাচরিত দমননীতির প্রয়োগ করে জহরলাল ও কয়েক সহস্র সত্যাগ্রহীকে অবিলম্বে কারারুদ্ধ করলো।

লোভীর নিষ্ঠুর লোভ, বঞ্চিতের নিত্য চিত্ত ক্ষোভ
জাতি অভিমান,
মানবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার বহু অসম্মান—
বিধাতার বক্ষ আজি বিদরিয়া
ঝটিকার দীর্ঘশ্বাসে জলে স্থলে বেড়ায় ফিরিয়া।

১৯৪১—১১ই ডিসেম্বর জাপান অকস্মাৎ পার্লহারবার আক্রমণ করে এ্যংলো আমেরিকার বিরুদ্ধে ঘোষণা জানাল যুদ্ধং দেহি!

১৮ই হংকংয়ের কৌলং অধিকার করে নেয় জাপান—২৫শে হংকং আত্মসমর্পণ করে জাপানের কাছে।

১৯৪২—১৫ই ফেব্রুয়ারী জাপানের হাতে ব্রিটিশের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি সিংগাপুরের পতন ও ৭ই মার্চ রেংগুনের পতন হয়।

ঐ সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের উপরেও যুদ্ধের কৃষ্ণছায়া ঘনিয়ে এলো।

এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের একটির পর একটি দেশ ব্রিটিশের হস্তচ্যুত হতে থাকায় ভারতবর্ষ ব্রিটিশের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হলো।

ব্রিটিশ দেখল এবং উপলব্ধিও করলে, অপরিমেয় লোক বল, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ভারতের কিন্তু ভারতবাসী যদি না স্বেচ্ছায় আন্তরিক ভাবে তাদের এই যুদ্ধের সময় সাহায্য করে তবে কেবলমাত্র ভাড়াটিয়া সৈন্যদের নিয়ে সামগ্রিক যুদ্ধ জয়ের কোন আশাই নেই। ভারতীয় নেতারা রীতিমত বেঁকে বসেছেন।

অতএব শ্বেতাঙ্গ প্রভুরা আর এক চাল চালল।

পার্লামেন্টের এক জরুরী অধিবেশনে স্থিরীকৃত হ'য়ে তাদের পক্ষ হতে এক প্রস্তাব নিয়ে ক্রীপস্ এলো ভারতে।

ঐ প্রস্তাবগুলোরই নাম সুবিখ্যাত ক্রীপস্ প্রস্তাব।

ভারতের তদানীন্তন নেতারা দেখলো ব্রিটিশ শক্তির ভারতে অবস্থানের জন্য যুদ্ধের গতি যে ভাবে ভয়াবহ আকার ক্রমশঃ ধারণ করছে এতে করে বৈদেশিক শক্তি কর্তৃক ভারত আক্রমণের সঙ্কট অত্যাসন্ন।

গান্ধীজি বিশেষ ভাবেই চিন্তিত হ'য়ে উঠ্লেন।

এবং এক সপ্তাহ কাল আলোচনার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪২—১৪ই জুলাই স্থির সিদ্ধান্তে পৌছালেন অবিলম্বে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হওয়ার প্রয়োজন এবং যাকে কার্যকরী করতে হলে ব্রিটিশকে অবিলম্বে 'ভারত-ছাড়' বলা ছাড়া আর অন্য কোন পথই নেই!

৮ই আগষ্ট রাত্রি দশঘটিকার সময় নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতি প্রস্তাব গ্রহণ করলো: ভারত ছাড়ো—Quit India!

## —সাত—

১৯৪২

৪২
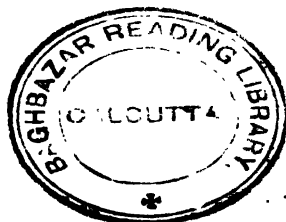
বিয়াল্লিশ।

১৮৫৭, ১৯২০-২১, ১৯৩০ তারপরে এলো ১৯৪২।

ভারতের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে ৪২ যেন একটা জ্বলন্ত অগ্নিশিখা।

ইংরাজের কূটনৈতিক চাতুরীই সাম্রাজ্য বিস্তারে, শাসনে ও রক্ষণে এক মহান অস্ত্র।

ভারতের জনগণ যখনই মুক্তির জন্য কোন আন্দোলন করেছে—জনগণের সেই জাগরণ ও কর্ম প্রচেষ্টাকে, চেতনার সেই উন্মেষকে অন্য দিকে ফিরিয়ে-দেবার জন্য চতুর ইংরাজ দরদের ভাণ দেখিয়ে ও মীমাংসার মিথ্যা অজুহাতে রাজকীয় কমিশন বা বেসরকারী ডেপুটেশন ভারতে পাঠিয়েছে। তারা এসে তদন্ত করে ও সমসাময়িক ভারতের নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে সাড়ম্বরে আলোচনা করে, বিরাট রিপোর্ট প্রণয়ন করে কালক্ষেপ করেছে। অবশেষে

ধূর্ত শ্বেতাঙ্গ সরকার কোন অজুহাত সৃষ্টি করে বা তাদের চিরাচরিত মোক্ষম অস্ত্র সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের ধুয়া তুলে, ভারতবাসী স্বাধীনতা পেলেও তারা আত্মরক্ষায় অসমর্থ এই সব আবোল তাবোল কারণ দেখিয়ে আসল প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়েছে কিংবা ঐ চিরাচরিত "Divide and Rule" নীতির আশ্রয় নিয়ে ভারতে আবার নতুন করে বিভেদ সৃষ্টির পরিকল্পনা রচনা করেছে।

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না কোন দিনই।

ওদেরও তা হয়নি।

ফলে বরাবরই দেখা গেছে শ্বেতাঙ্গের কূটনীতিরই শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারত ধূর্ত শ্বেতাঙ্গের দেওয়া স্বায়ত্বশাসনের প্রতিশ্রুতিতে প্রলুব্ধ হ'য়ে অগণিত লোক, প্রচুর অর্থ, দ্রব্যসম্ভার ও যুদ্ধের সরঞ্জাম দিয়ে ব্রিটিশ শক্তিকে জয়লাভে সাহায্য করে এবং যুদ্ধ অবসানে প্রতিদানে সে পেয়েছিল—রাউলাট আইন, পাঞ্জাবের সামরিক আইন ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস পাশবিক হত্যাকাণ্ড।

১৯৪২য়ে যখন দেশের তদানীন্তন নেতারা সেই কারণে শ্বেতাঙ্গের দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই দিতে চাইল না, মার্চ মাসের মাঝামাঝি ক্রীপস্ এলো ভারতে।

ক্রীপস্ বিলাতের বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ও উদার মতাবলম্বী একজন রাজনীতিক।

২৩শে মার্চের পার্লামেণ্টের ঘোষণানুযায়ী ক্রীপস্ নিয়ে এলো ভারতবাসীর কাছে এক প্রস্তাব। বহু অর্থহীন গালভরা বাক্যবিন্যাসে সে প্রস্তাবটি গঠিত।

রাষ্ট্রসংঘ, শাসনতন্ত্র, প্রাদেশিক স্বাধীনতা, সন্ধিচুক্তি, শাসনতন্ত্র রচনাকারী প্রতিষ্ঠানের গঠন-প্রণালী, ভারতরক্ষা বিধান প্রভৃতি বহুবিধ আবোল তাবোল কথাই সে প্রস্তাবের মধ্যে ছিল কেবল ছিল, না আসল ও সত্যিকারের কথাটি কোথায়ও সে প্রস্তাবের মধ্যে—অর্থাৎ যা ভারতবাসী চাইছিল সে সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি।

সবই মহাত্মারা অকাতরে ভারতবাসীকে দেবেন কেবল আরো কিছুকাল মানে যুদ্ধাবসান পর্যন্ত তাদের যা একটু সামান্য দেরী করতে হবে।

যুদ্ধাবসান পর্যন্ত তাদের চলতি শাসনতন্ত্র পরিবর্তন করা যাবে না। সমস্ত দল সম্মিলিতভাবে দাবী করলেও ভারতরক্ষার ভার ভারতীয়দের হাতে দেওয়া যাবে না।

কারণ দেখাতেও তারা পশ্চাদপদ হয়নি—কারণ শাসনতন্ত্রের পরিবর্তন হলে ভারতের সমস্ত আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় নাকি বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হবে এবং তার ফলও হবে মারাত্মক।

অতএব ভারতরক্ষার ভার ইউরোপীয় জঙ্গীলাটের উপরেই ন্যস্ত থাকবে।

এবং প্রত্যেকে প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে এবং প্রস্তাবিত রাষ্ট্রসংঘে যোগদান তাদের সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন।

সর্বশেষে শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রস্তাবগুলো পূর্ণাঙ্গ ও অবিভাজ্য, ওতে কেউ কিছু যোগ দিতে পারবে না বা কেউ ওর অঙ্গচ্ছেদ করতে পারবে না।

দেশের নেতারা দেখলেন ক্রীপস্ প্রস্তাবে ভারতে নিরপেক্ষভাবে একাধিক সার্বভৌম রাষ্ট্রসংঘ গঠনের অবাধ স্বাধীনতা দেওয়ার মানেই শ্বেতাঙ্গের সেই চিরাচরিত নীতি 'Divide & Rule'য়ের আর একটি চাল।

নতুন করে আবার রাষ্ট্র ভেদের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থা।

ফলে পরনির্ভরশীল রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকবে এবং স্বাধীনতা পেলেও খণ্ডিত ভারত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না।

এবং শুধু তাই নয়, ঐ প্রস্তাবের দ্বারা সাম্প্রদায়িক রাজ প্রতিষ্ঠারও ব্যবস্থা ছিল।

শেষ পর্যন্ত যুদ্ধশেষ কত কালের মধ্যে হবে, দুই কি পাঁচ বৎসরের মধ্যে বা দীর্ঘতর সময়ে ঐ প্রতিশ্রুতি পালিত হবে তাও প্রস্তাবে সুস্পষ্ট করে কিছুই বলা হয় নি।

অতএব প্রত্যাখান জানান হলো ক্রীপস আনীত প্রস্তাবকে।

প্রত্যাখ্যান করা হলো তার—তথা শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রস্তাবকে।

তারপরও কিছুদিন ধরে মৌলানা আজাদ ও ক্রীপস্‌য়ের মধ্যে পত্র বিনিময় চললো।

কিন্তু কোন ফলই হলো না।

মৌলানা আজাদ তার শেষ চিঠিতে স্পষ্টই জানালেন,...দুর্ভাগ্য বশতঃ এই গুরুতর সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতেও ব্রিটিশ সরকার যখন এই ধ্বংসাত্মক নীতি পরিহার করতে পারছেন না তখন আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে বাধ্য হচ্ছি যে, আমাদের আসন্ন বিপদ ও আক্রমণ হ'তে ভারতকে ফলপ্রদ ভাবে রক্ষা করা অপেক্ষা যতদিন সম্ভব ভারতে মতানৈক্য ও ভেদ সৃষ্টি করে সম্রাজ্য কায়েম রাখাই ব্রিটিশ বেশী জরুরী মনে করে।

মহাত্মাজী বললেন, প্রস্তাবটি Post dated chequeয়ের সমান এবং হাস্যকর।

জহরলাল বললেন, আমরা ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের নিকট আর ধর্ণা দেব না। আমরা স্থৈর্য ও জ্ঞানানুযায়ী বিপদ ও সমস্যার সম্মুখীন হবো।

১৯৩৯য়ে ত্রিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে বিপ্লবী সুভাষ সর্বপ্রথম সেখানকার অধিবেশনে 'ভারত ছাড়' প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীগণের বিরোধিতায় সেই প্রস্তাব সেদিন অনুমোদিত হয় নি।

অবশেষে বহু তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনার পর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতার কণ্ঠে সুভাষের তিন বৎসর পূর্বে উচ্চারিত প্রস্তাবটিই ধ্বনিত হয়ে উঠ্‌লো নতুন করে।

১৯৪২য়ের আটই আগষ্ট।

বোম্বাই নগরীর মধ্যস্থিত বর্ষাবিধৌত গোয়ালীয়র ট্যাঙ্ক প্রান্তরে কংগ্রেসের ছাউনী পড়েছে।

ভারতের স্বাধীনতার সংগ্রামীরা নায়কদের নির্দেশের প্রতীক্ষায় রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দণ্ডায়মান। নেতারা মন্ত্রণাকক্ষে সমবেত।

সংগ্রামের পন্থা নিরূপণের পর নেতারা সমবেত সংগ্রামীদের সম্মুখে তাঁদের পরিকল্পনা ব্যক্ত করে মহাত্মা বললেন, সংগ্রাম সুরু করবার পূর্বে তিনি আপোষের শেষ চেষ্টা হিসাবে শ্বেতাঙ্গ সরকারের প্রতিনিধির নিকটে পত্র লিখে তাদের অভিমত জানতে চান।

সকলেই একবাক্যে মহাত্মার প্রস্তাব সমর্থন করলেন।

গভীর নিশীথে নেতারা স্ব স্ব শিবিরাভিমুখে রাত্রির মত বিশ্রামের নিমিত্ত চলে গেলেন।

বিক্ষুব্ধ ভারতের মর্মবাণী যেন দূরাগত সমুদ্রগর্জনের মধ্যে শোনা যায়।

মনে পড়ে প্রায় ষাট বৎসর পূর্বে এই বোম্বাই নগরীতেই ভারতের এই জাতীয় মহাসভা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘ ষাট বৎসর ধরে ভারতের অন্যান্য মুক্তি সংগ্রামীদের সঙ্গে এরাও পুরোভাগে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন।

লাঞ্ছনায় পীড়নে মৃত্যুকে করেছে বরণ, কারাগারে কাটিয়েছে কত রাত্রি দিন।

১

মহাত্মা গান্ধীর বিঘোষিত শেষ পত্র প্রাপ্তি পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ শাসক-শক্তির ধৈর্য অটুট রইলো না। ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানেই তারা ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল এবং চলেছিল তলে তলে গোপন প্রস্তুতি।

৯ই আগষ্টের সূর্যোদয়ের পূর্বেই পাঁচ ঘটিকায় বোম্বাইয়ে—মাহাত্মা গান্ধী ও ওয়ার্কিং কমিটির সমস্ত সভ্যদের এবং নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির বহু সভ্যকে শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারত রক্ষা আইনের নাগপাশে বেঁধে ফেললে।

নিয়মিত ভাবেই ঐ দিন—৯ই আগষ্ট ভোর চারটের সময় মহাত্মা তাঁর প্রার্থনা শেষ হতেই শুনলেন, দ্বারে সশস্ত্র পুলিশ অপেক্ষমান।

তাঁকে, এবং মহাদেব দেশাই ও মীরা বেনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য ওয়ারেণ্ট হাতে দ্বারে অপেক্ষা করছে বোম্বাইয়ের পুলিশ কমিশনার।

একখানা গীতা হাতে মহাত্মাজী মীরা বেনকে সঙ্গে নিয়ে পুলিশ কমিশনারের হেপাজতে তাদের আনীত গাড়ীর মধ্যে গিয়ে উঠে বসলেন। সমস্ত সংবাদপত্রের উপরে জারী করা হলো সুকঠোর নিষেধাজ্ঞা।

জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতাদের শুধু যে গ্রপ্তার করা হলো তা নয় সমস্ত প্রকার প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করলে ইংরাজ সরকার।

রক্ত রাঙা প্রজ্বলিত বিয়াল্লিশ।

বিয়াল্লিশ!

ভারত ছাড়!

Quit India!

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে। করব না হয় মরব। Do or die.

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের মৃত্যুপণে আবদ্ধ রক্তস্নাত অগ্নিশুদ্ধ একটি পরিচ্ছেদ।

যে পরিচ্ছেদের পাতায় পাতায়—

ভক্তদেহের রক্তলহরী মুক্ত হইল কি রে।<br>
লক্ষ বক্ষ চিরে<br>
ঝাঁকে ঝাঁকে প্রাণ পক্ষী-সমান ছুটে যেন নিজ নীড়ে॥<br>
বীরগণ জননীরে<br>
রক্ততিলক ললাটে পরাল পঞ্চনদীর তীরে॥

যেন মহাউল্লাসে মৃত্যুপণ সে এক অভিনব অভিযান—

পড়ি গেল কাড়াকাড়ি—
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

সংগ্রামের পুরোভাগে এগিয়ে এলো শ্বেতাঙ্গের শ্যেন চক্ষুতে ধূলি নিক্ষেপ করে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের চারজন নেতা। তিনজন পুরুষ ও একজন নারী।

জয়প্রকাশ নারায়ণ, অচ্যুত পট্টবর্দ্ধন ও রামমনোহর লোহিয়া আর শ্রীমতী অরুণা আসফ আলী।

তাদের বিপুল মনস্বিতা ও বিপুল সংগঠনের শক্তি নিয়োজিত করলে তারা ভারতের ঐ অভূতপূর্ব আন্দোলনকে বিপ্লবে পরিণত করতে।

শ্বেতাঙ্গ সরকারও তার চিরাচরিত পাশবিক দমননীতি নিয়ে সংগ্রামে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ জনসাধারণের উপরে হিংস্র রক্তলোভী ব্যাঘ্রের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো।

লাঠি, বেয়োনেট, গোলা-গুলি চালিয়ে ভারতের মাটিকে রক্তরাঙা করে তুলল।

শিশু বালক কিশোর যুবা প্রৌঢ় বৃদ্ধ সকলের উপরেই চলতে লাগল লাঠি ও গোলা-গুলি। আর অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষিপ্ত ক্রুদ্ধ শ্বেতাঙ্গ সরকারের নিষ্ঠুর বর্বর দমন নীতিকে তুচ্ছ করে বিপ্লবীরা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে লাগল।

প্রচারপত্র ও পুস্তিকা দলে দলে গোপনে বিলি হ'তে লাগল।

রোজকার সংবাদ জনসাধারণকে জানিয়ে দেবার জন্য বিপ্লবীরা স্থাপন করলে তাদের নিজস্ব গোপন "স্বাধীন ভারত বেতার কেন্দ্র"—একটি কলকাতায় ও অন্যটি বোম্বাই মহানগরীতে।

বেতার কেন্দ্রকে পরিচালিত করবার জন্য নিজস্ব ট্রান্স্‌মিটার; ট্রান্সমিটিং ষ্টেশন ও রেকর্ডিং ষ্টেশন স্থাপিত হলো।

'স্বাধীন ভারত বেতার কেন্দ্র' হ'তে দিকে দিকে ভারতের অন্ত-প্রত্যন্তে যখন বিপ্লবের বাণী আকাশ পথে রক্তরাঙা পথের ইংগীত ছড়িয়ে চলেছে এমন সময় আগষ্ট বিপ্লবীদের কানে ভেসে এলো অপূর্ব অগ্নিস্রাবী এক তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর—

**In spite of British propaganda, it should be clear to all right thinking Indians that in this wide world India has but one enemy, who has exploited her for one hundred years, the enemy**

who sucks the life-blood of Mother India,—British Imperialism···Azad Hind !

আজাদ হিন্দ্ !

স্তম্ভিত বিস্মিত নির্বাক বিপ্লবীরা শুনতে লাগল :

To fight and win India's liberty, and then build up in India, with full freedom to determine her own future—with no interference !

Free India will have a social order based on the eternal principles of Justice, Equality and Fraternity !

কার কণ্ঠস্বর !

কোথা হতে ভেসে আসছে ঐ সিংহনাদ !

প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে পরিব্যাপ্ত প্রচণ্ড অগ্নিশিখাকে অতিক্রম করে ভেসে এলো একার কণ্ঠস্বর ।

বাংলার ঘর-ছাড়া অশান্ত বিপ্লবী চিরপ্রিয় যে সুভাষ ১৯৩১ সনের ২৬শে জানুয়ারী তার কলকাতার এলগিন রোডস্থিত বাসভবন হ'তে স্কন্ধে ছুটো মামলার অভিযোগ নিয়ে জামীনে অবস্থানকালে অকস্মাৎ পরাধীনতার বেদনা বুকে নিয়ে শ্বেতাঙ্গদের সতর্ক প্রহরীদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে অদৃশ্য হয়েছিল ।

যার খোঁজ তখন পর্যন্ত সরকার হাজার চেষ্টা করেও পায় নি ।

এ সেই সুভাষের কণ্ঠস্বর ।

নতুন উষার অভ্যুদয়ের সূচনা !

১৯৪২য়ে যখন ভারতে আগষ্ট সংগ্রামের প্রস্তুতি চলেছে ।

সেই সময় সুদূর প্রাচ্যে ১৫ই জুন ব্যংককে বৃহত্তর এশিয়ার এক অধিবেশন হয় । এবং সে অধিবেশনে একশত ডেলিগেট উপস্থিন হন ।

তারা এসেছিলেন জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোচায়না, বোর্ণিয়ো, মাঞ্চুকু, হংকং, মালয় ও জাপান থেকে ।

মালয় ও সিংগাপুরের পতনের পর ব্রিটিশ বাহিনীর যে সব ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক জাপানীদের হাতে বন্দী হয়ে তখন যুদ্ধবন্দী হিসাবে জাপানীদের বন্দী শিবিরে ছিল তাদের মধ্যেও অনেক ঐ অধিবেশনে উপস্থিত হয় ।

সেই অধিবেশনেই ইনডিয়ান ইন্‌ডিপেন্‌ডেন্স লীগকে মেনে নেওয়া হয় যার উদ্দেশ্য ছিল : Unity, Faith and Sacrifice !

সেখানকার সকল ভারতীয় মিলিত হবে একটি মাত্র সংঘের অধীনে।

সেখানে হিন্দু নেই, মুসলিম নেই, ক্রিস্তান নেই !

নেই জাতিভেদ বা ধর্মের কোন প্রশ্ন !

সকলেই এক ভারতমাতার সন্তান !

ভারত আমার জননী আমার !

সকলের এক ধর্ম ! সকলের এক প্রতিজ্ঞা—ভারতের স্বাধীনতা ! India's Liberty !

এবং ঐ অধিবেশনেই স্থির হয় ঐ লীগের অধীনে তৈরী হবে অপূর্ব এক বিরাট মুক্তি ফৌজ যার নাম হবে আজাদ হিন্দ ফৌজ !

স্বাধীন ভারতের জাতীয় বাহিনীর মত সেই ফৌজের পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং জাপানের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাদের ঐ জাতীয় বাহিনীর কোন পার্থক্য থাকবে না।

ঐ ফৌজ—আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতের স্বাধীনতা ও জাতীয় সম্মান রক্ষার জন্য মৃত্যুপণে বিদেশীর বিরুদ্ধে করবে সংগ্রাম।

লীগের কার্যকরী সমিতিতে থাকবে একজন প্রেসিডেন্ট এবং চারজন মেম্বার।

এবং ঐ চারজনের মধ্যে দুইজন থাকবে আজাদ হিন্দ ফৌজের লোক।

শ্রীযুক্ত রাসবিহারী বোস প্রেসিডেন্ট্ নিযুক্ত হন এবং প্রতিনিধি নিযুক্ত হন এন্, রাঘবন্, কে, পি, কে, মেনন, ক্যাপ্টেন্ মোহন সিং এবং কর্ণেল জি, কিউ, গিলানী।

ঐ পরিকল্পনানুযায়ী ব্রিটেনের অধীনস্থ যে সব ভারতীয় অফিসার ও সৈনিক মালয় ও সিংগাপুরের পতনের পর জাপানীদের হাতে বন্দী হয় তাদের নিয়েই রাসবিহারী বোসের নেতৃত্বে ক্যাঃ মোহন সিং গড়ে তুলল আজাদ হিন্দ ফৌজ।

কিন্তু পরে যখন কোন কারণবশতঃ সে বাহিনীকে ভালভাবে কার্যকরী করা গেল না তখন রাসবিহারীর ইচ্ছাতেই বার্লিনে অবস্থিত পলাতক সুভাষকে নিয়ে আসা হলো।

১৯৪৩এর ২রা জুলাই সুভাষ [illegible] চৌকিও হ'তে সাইকন

( সিংগাপুর ) এসে উপস্থিত হলেন। ৫ই জুলাই সাইননের টাউন হলের সামনে বিরাট এক জনতা তাকে অভিনন্দন জানাল নতুন নামে, নেতাজী !

নেতাজী জিন্দাবাদ !

আজাদ হিন্দ্ !

কিন্তু তারও আগে ভারতের পোড়া মাটিতে ফিরে তাকাই আর একবার !

৪২য়ের সেই অগ্নিক্ষরা দিনগুলিকে স্মরণ করি আর এক বার।

বিয়াল্লিশের প্রচণ্ড অগ্নিদাহ তখন জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে শহরে শহরে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠেছে।

১৪ই আগষ্ট থেকে কলকাতা মহানগরীতে আগুন জ্বলতে সুরু হয়।

রাস্তায় রাস্তায় সুরু হয় মহানগরীর মধ্যে মিলিটারী ও পুলিশ লরীর বহ্ন্যুৎসব। দিকে দিকে চলতে থাকে বিপ্লবীগণ কর্তৃক সরকারী ভবনে ভবনে হানা।

কলকাতা মহানগরী জুড়ে বিপ্লবের আগুন যেন লেলিহ শিখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে যায়। পার্শীবাগান, বিডন ষ্ট্রীট, আহিরীটোলা প্রভৃতি পোষ্ট আফিস ও গড়িয়াহাটা, সার্কুলার রোড, বৌবাজার প্রভৃতিঅঞ্চলের আবগারীর দোকান বিপ্লবীরা আগুন জেলে পুড়িয়ে দিল। রেল ষ্টেশন, ট্রাম গাড়ী, ট্রেন তারা আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিতে লাগল।

দল বেঁধে যুবা-কিশোরের দল শোভাযাত্রা করে নেমে এলো রাজপথে : করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

পুলিশ ও মিলিটারীর গুলিতে ও লাঠির আঘাতে কত প্রাণ কত জনাই দিল !

রাজপথে বিপ্লবের চিহ্ন আঁকা পড়লো রক্তের আখরে।

কলকাতা শহরে প্রথম শহীদ হলো দিলীপ ঘোষ।

শুধু কলকাতাতেই নয় বিয়াল্লিশের বহ্নিংদিক হতে দিগন্তে ভারতের অন্ত-প্রত্যন্তে দাউ দাউ করে শত শিখায় যেন ছড়িয়ে যেতে লাগল।

কলকাতা, মেদিনীপুর, বোম্বাইয়ে সাতারা, যুক্তপ্রদেশে বালিয়া এবং বিহারের ভাগলপুরে বিপ্লবীদের সে অভিযান স্বাধীনতার সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় অগ্নির অক্ষরেই যেন লেখা হয়ে গেল।

সম্পূর্ণভাবেই ঐ সব জায়গায় বহুকালের বিদেশী শাসন লোপ পেল—জনগণের জাতীয় সরকার হলো প্রতিষ্ঠিত।

মেদিনীপুর।
বিয়াল্লিশের মেদিনীপুর।
ওই তো মেদিনীপুর।
পাঁজরে পাঁজরে হোমাগ্নি জ্বলে, স্বপ্ন—স্বপ্ন নয়।
নাচে ঝড়ো হাওয়া—আকাশে বজ্র হাঁকে,
সেই তো সত্য ; সেই তো পথের সাথী।

বিয়াল্লিশের স্বাধীনতার সংগ্রামের অগ্নিদগ্ধ রক্তাক্ত ঐতিহাসিক কর্মক্ষেত্র—বিপ্লবীদের স্বপ্নভূমি মেদিনীপুর।

অগ্নি-আন্দোলন, সত্যাগ্রহ বা অসহযোগ আন্দোলনই হক স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐ মেদিনীপুরবাসীরা যে অপরিসীম ধৈর্য, দৃঢ়তা, কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছে ও সরকারী বর্বর নৃশংস অত্যাচার ও লাঞ্ছনা বারবার সহ্য করেছে তার বুঝি সত্যিই তুলনা নেই।

প্লাবন ঝড় ও দুর্ভিক্ষের কঠোর ক্লেশে জর্জরিত হয়েও বিয়াল্লিশের অগ্নিযুগে মেদিনীপুরবাসী স্বাধীনতার জন্য মুক্তির জন্য যে ভাবে মৃত্যুপণে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল বিদ্রোহী ভারতের সে এক সত্যিই অভিনব পর্ব।

একদিকে দুর্ধর্ষ অস্ত্র ও লোকবলে বলীয়ান শ্বেতাঙ্গ সরকার ও তার চেলা-চামুণ্ডার দল, অন্যদিকে নিরস্ত্র উৎপীড়িত অসহায় জনসাধারণ।

সে সংগ্রামের তুলনা বুঝি নেই!

মেদিনীপুরের মধ্যে, বিশেষ করে তমলুক ও কাঁথি মহকুমায়, বিপ্লব এমন ব্যাপক ভাবে আকার নিয়েছিল যা ভাবতেও বিস্ময় লাগে।

তমলুক—তাম্রলিপ্ত।

সুতাহাটা, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, তমলুক, ময়না ও পাঁশকুড়া তমলুক মহকুমার ছয়টি থানা।

৭৬টি ইউনিয়ান—১২৪৫টি গ্রাম এবং সাড়ে সাত লক্ষ লোকের বাস।

যুদ্ধের ত্রাসে সশঙ্কিত ইংরাজ সরকার মেদনীপুর জেলাকেই বিপজ্জনক এলাকা বলে ঘোষণা করে।

পাছে জাপানী ফৌজ অতর্কিতে সমুদ্র পথে মেদিনীপুরে এসে অধিকার করে সেখানকার মোটর যান, নৌকা ও দ্বিচক্রযান গুলি অধিকার করে তাদের

কাজে লাগায় এই ভয়ে বাহাদুর সরকার আইন করে, জোর জবরদস্তি করে তমলুক মহকুমার, নন্দীগ্রাম ও ময়না থানার সকল শ্রেণীর নৌকা, পাঁশকুড়া ও তমলুক থানার অধিকংশ অঞ্চলে হ'তে সাইকেল সরিয়ে ফেলবার কঠোর আদেশ দেয়।

কিন্তু ঐ আদেশ পালন করা কার্যত সম্ভব না হওয়ায় সরকার বাহাদুর জোর করে অধিকাংশ নৌকাকে পুড়িয়ে ফেলে ও ধ্বংস করে।

ফলে অসংখ্য লোককে জীবিকার একমাত্র উপায় হতে নিষ্ঠুর ভাবে বঞ্চিত করা হয়। স্বাভাবিক ভাবে ঐ সরকারী অত্যাচারের ফলে জনসাধারণের মনে একটা আতঙ্ক জাগে। আত্মরক্ষা, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা প্রতিরোধের জন্য দেশবাসী সুতাহাটা ও মহিষাদল থানায় দুইটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে—সেই বাহিনীই বিদ্যুৎবাহিনী নামে খ্যাত।

বিদ্যুৎবাহিনী স্বেচ্ছাসেবক ও স্বেচ্ছাসেবিকা নিয়ে গঠিত হয়।

একটি ভগিনী সেনা শিবিরও স্থাপিত হয়।

১৯৪১য়ে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কায় মহকুমা থেকে ধান ও চালের রপ্তানী বন্ধ করবার জন্য তমলুকের নেতারা যখন জেলার সরকারী কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাল—কর্তৃপক্ষ তাদের সে অনুরোধে কর্ণপাত ত করলই না বরং উল্টে রপ্তানীর ব্যাপারে অধিকতর উৎসাহ দিতে সুরু করল।

এবং প্রতিবাদ করবার অপরাধে (?) কয়েকজন কংগ্রেসকর্মীকে দণ্ড দিল।

বাংলার তদানীন্তন লাটবাহাদুর স্যার জন হার্বার্টের জঘন্য শয়তানী বঞ্চনা-নীতির ফলে বিয়াল্লিশ সালে একমাত্র বাংলাদেশ থেকেই চার কোটি টাকা মূল্যের চাল গোপন সুড়ঙ্গ পথে চোরাকারবারীদের মারফৎ উধাও হয়ে গেল।

ফলে ১৯৪২—৮ই সেপ্‌টেম্বর প্রায় আড়াই হাজার গ্রামবাসী স্বতঃপ্রণোদিত হ'য়ে মেদিনীপুরের চালের কল থেকে চাল রপ্তানীতে বাধা দেওয়ায় পুলিশ বেপরোয়াভাবে চালাল গুলি নিরস্ত্র অসহায় গ্রামবাসীদের উপরে।

তিনজন গ্রামবাসী গুলিতে প্রাণ দিল।

এরই কিছুদিন আগে 'ভারত ছাড়ো' বাণী ঘোষিত হয়েছিল।

তমলুকের অধিবাসীরাও এবারে ইংরাজের ক্রমবর্দ্ধমান অত্যাচারে জর্জরিত হ'য়ে ঘোষণা জানাল : ভারত ছাড়ো !

**Quit India !**

শ্বেতাঙ্গ শক্তি বন্দুক নিয়ে এগিয়ে এলো : সাবধান।

জনগণ সদম্ভে ঘোষণা করলে, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

ঘোষণা করলে তারা যুদ্ধ সরকারের বিরুদ্ধে।

সর্বত্র হরতাল। প্রত্যেক থানা স্বাধীন বলে ঘোষিত হলো। সরকারী কার্যালয়কে করা হলো বয়কট। চৌকিদারী ট্যাক্স আদায় বন্ধ করা হল। চৌকিদার ও দফাদারদের উর্দি পুড়িয়ে ফেলা সুরু হল।

সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে সরকারী নৃশংস দানবীয় পীড়ন ও অত্যাচার।

গোলা-গুলি ও অগ্নিতে চারিদিক ভয়াবহ আকার ধারণ করে।

২৯শে সেপ্টেম্বর বিপ্লবীদের এক সভায় স্থির হলো যুগপৎ স্থানীয় সরকারী কার্যালয়গুলোকে আক্রমণ করা হবে।

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রায় লক্ষাধিক হিন্দু-মুসলমান বিপ্লবী গুরুত্বপূর্ণ তমলুক, মহিষাদল ও নরঘাটের বহু রাস্তা গাছ ফেলে বন্ধ করে দিল।

পুল ভেঙ্গে, টেলিগ্রাফের তার ছিঁড়ে, পোষ্ট উপড়ে ফেলল ও বহু সরকারী অফিস ধ্বংস করা হলো আগুন দিয়ে।

বেলা তিন ঘটিকা।

ভাদ্রের প্রখর সূর্যতাপে আকাশ তখনও ঝলসে যাচ্ছে।

এমন সময় বিরাট চারটি শোভাযাত্রা চারিদিক থেকে সহরের দিকে অগ্রসর হলো।

পূর্ব হতেই কর্তৃপক্ষ শোভাযাত্রাকে বাধা দেবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে সশস্ত্র গোরা ও গুর্খা সৈন্য মোতায়েন করে সহরের সব কয়টি রাস্তা আগলে বসেছিল।

তৎসত্ত্বেও পশ্চিম দিক হতে আট হাজার বিপ্লবী এক শোভাযাত্রা করে সৈন্যদের বেপরোয়া লাঠিচালনা ও গুলিবর্ষণকে উপেক্ষা করে অগ্রসর হয়ে চলল থানার দিকে—আহত হলো অনেকে, রক্তে মাটি ভিজে গেল। রক্তাক্ত অবস্থায় বিপ্লবী রামচন্দ্র বেরা অচৈতন্য হ'য়ে ধরাশায়ী হলো।

... জ্ঞান যখন ফিরে এল রামচন্দ্র চেয়ে দেখলো শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ হয়ে গিয়েছে। তখন সে অতি কষ্টে রক্তাক্ত গুলিবিদ্ধ দেহটা টানতে টানতে গড়িয়ে গড়িয়ে কোনমতে থানার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে চিৎকার করে উঠ্‌লো, ভাই সব! আমি এখানে, থানা দখল হয়েছে।

কথাটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই রামচন্দ্রের নশ্বর আত্মা বায়ুতে মিলিয়ে গেল।

তিয়াত্তর বৎসর বয়স্কা বৃদ্ধা বিপ্লবী নায়িকা মাতঙ্গিনী হাজরা বিরাট এক শোভাযাত্রা নিয়ে উত্তর দিক হতে সহরে প্রবেশ করেন।

সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যরা গুলি বর্ষণ সুরু করে দলটির উপরে।

মাতঙ্গিনী হাজরার দুইটি হাতই গুলিবিদ্ধ হয়, তথাপি বিপ্লবের মহানায়িকা এগিয়ে চললেন জাতীয় পতাকা হাতে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

সৈন্যদের মধ্যে যারা ভারতীয় ছিল তাদের দিকে তাকিয়ে মাতঙ্গিনী বলেন, ভাই সব, তোমরা বিদেশীর চাকরী ছেড়ে দাও। দেশ তোমাদের, এগিয়ে এসো সংগ্রামে—দাও বুকের রক্ত।

দুম্! অগ্নিঝলক!

একটি গুলি এসে মাতঙ্গিনীর কপাল বিদ্ধ করল।

মাতঙ্গিনী হাজরা মরেনি।

বিয়াল্লিশের সংগ্রামের পাতায় তার অগ্নিস্মৃতি চিরদিন বেঁচে থাকবে। অবিনশ্বর তিনি!

দক্ষিণদিক হ'তে যে দলটি অগ্রসর হয় তাদের মধ্যেও সৈন্যদের গুলির মুখে বহুলোক আহত হয় এবং ১৭ ও ২২ বৎসরের দুইটি বিপ্লবী যুবক প্রাণ দেয়।

এইভাবে চারিদিক থেকে প্রায় বিশ সহস্রাধিক নিরস্ত্র সংগ্রামী নারী পুরুষ যুবা বৃদ্ধ বালক কিশোর বীরের মতই স্বাধীনতার দুর্জয় সংগ্রামে সেদিন অত্যাচারীর সমস্ত অত্যাচারকে তুচ্ছ করে মৃত্যুপথে এগিয়ে গিয়েছিল। মহিষাদল ও সুতাহাটা থানায়ও একই দিনে বিপ্লবীদের অভিযান চলে।

মহিষাদলের অভিযানে দশজন বিপ্লবী ও বহু নিরীহ দর্শক নিহত ও ৪৩ জন গুরুতরভাবে আহত হয় পুলিশের গুলিতে। সুতাহাটা থানা, খাসমহল অফিস, রেজেষ্ট্রী অফিস ও ইউনিয়ন বোর্ড সব কিছুই বিপ্লবীরা আগুন জেলে পুড়িয়ে দেয়। নন্দীগ্রাম থানাও আক্রান্ত হয় বিপ্লবীদের দ্বারা। সেখানকার সমস্ত সরকারী কেন্দ্রগুলিও ভস্মীভূত করা হয়।

সমস্ত মহকুমা যেন বিপ্লবের আগুনে লাল হয়ে ওঠে।

প্রকৃতির বুকেও বুঝি জাগে ঝড়ের তাণ্ডব ঐ সঙ্গে।

এলো সোঁ সোঁ করে মত্ত প্রভঞ্জন! আর এলো মৃত্যুভয়ঙ্কর দুর্বার জলোচ্ছ্বাস—১৬ অক্টোবর।

কাঁথি ও তমলুকের হলো অবর্ণনীয় ক্ষতি।

অত্যাচারীর অত্যাচার আর প্রকৃতির তাণ্ডব দু'য়ে মিলে যেন ঘটালো এক নিষ্ঠুর বিপর্যয়।

প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে ঘর বাড়ী সব ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গিয়েছে।

চারিদিকে মানুষ ও পশুর মৃতদেহ।

আর থৈ থৈ করছে জল।

সরকার মানুষের এই দুর্ভাগ্যকে, এই চরম ভাগ্যবিপর্যয়কে প্রতিহিংসার অস্ত্ররূপে গ্রহণ করলে।

নিজেরা ত' পীড়িতদের কোন সাহায্য করলই না, বাইরের থেকে কোন সাহায্যও পৌঁছতে দিল না।

অবশেষে বিপ্লবীরাই বিপ্লবাত্মক কার্য বন্ধ করে নিজেদের দেশবাসীর দুর্ভাগ্যের ভার নিজেদের স্কন্ধে তুলে নিল।

১৯৪২—১৭ই ডিসেম্বর তাম্রলিপ্তে বিপ্লবীদের দ্বারা জাতীয় নিজস্ব সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় দীর্ঘ প্রায় পৌণে দুইশত বৎসরের অধীনতাপাশকে ছিন্ন করে পদদলিত করে।

২৬শে জানুয়ারী ১৯৪৩—সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম, মহিষাদল ও তমলুকের প্রতিটি থানায় বিপ্লবীরা একটি করে জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠা করে।

বিদ্যুৎবাহিনীই হয় জাতীয় বাহিনী।

প্রথমে বিদ্যুৎবাহিনীতে সমর বিভাগ, গোয়েন্দা বিভাগ ও এম্বুলেন্স বিভাগ গঠন করা হয় পরে আরো দু'টি বিভাগের সৃষ্টি হয়,—গরিলা বিভাগ ও ভগ্নি বিভাগ।

সেদিন তাম্রলিপ্তের অধিবাসী বিদেশী সরকারকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে আজো তারা মরে যায়নি। শতবর্ষের অত্যাচারে লাঞ্ছনায় ও শোষণেও তাদের শক্তি নিঃশেষিত হ'য়ে যায়নি।

তারা বুঝেছিল ভারত ভারতই!

ভারতবাসীর একমাত্র পরিচয় ভারতবাসীই।

এই ভারতের মাটিতেই তারা কি জানে না কত আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, চীন শক, হুন, মুঘোল, পাঠান এসেছে গিয়েছে, যাদের জয়গান উন্মাদ কলরবে আবার একদিন থেমে গিয়েছে। এমনি করে শ্বেতাঙ্গকেও এই ভারত হ'তে বিদায় নিতে হবে।

১৮৫৭ হ'তে সুরু করে যে হোমানল আজও জ্বলেছে এ যে তারই প্রস্তুতি।

তাই ত' ভারতবাসী জানত—এ রজনী পোহাবে, মুছে যাবে ললাট হ'তে একদিন দুঃখের এ রক্তশিখা !

বিদ্রোহী ভারত আবার একদিন নতুন করে মহামানবের সাগরতীরে জন্ম নেবে।

তারপর সুরু হলো সরকারের বীভৎস পাশবিক দমননীতি, সুরু হলো বেপরোয়া গুলিবর্ষণ, অগ্ন্যুৎসব, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ।

কোন সভ্যদেশের ইতিহাসে যার নজির মিলবে না।

মহিষাদল, নন্দীগ্রাম ও তমলুকে গুলি চালনার ফলে ৪৪ জন নিহত হয়, ৭৩ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোক হতে ১২ বৎসর বয়স্ক বালক পর্যন্ত ৯৯ জন আহত হয়। ১২৪টি গৃহ ভস্মীভূত করা হয়। ১০৪৪টি গৃহ লুণ্ঠিত হয়। ১ লক্ষ ৯০ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। ৭৪টি নারীকে সৈন্যরা ধর্ষণ করে। সে বীভৎস অত্যাচারের ফিরিস্তি সঠিক ভাবে দিতে যাওয়া দুঃসাধ্য প্রচেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তমলুক জাতীয় সরকারের পর পর নেতার আসন গ্রহণ করে, সতীশচন্দ্র সামন্ত, অজয় মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র সাহু ও বরদা কুইতি প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কাঁথি মহকুমায় শ্বেতাঙ্গ সরকারের বর্বর অত্যাচারের বিবরণী যা জানা যায়—গুলিমুখে নিহত ৩০ জন ও আহত ১৭৫ জন, ২২৮ জন নারীকে ধর্ষিত করেছে বর্বর সৈন্যেরা। ৯৬৫টি বাসগৃহ আগুন জ্বেলে ভস্মে পরিণত করেছে। ২০৫৯টি গৃহ লুণ্ঠন করেছে। ৩০০০০ টাকা পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়েছে। এ ছাড়াও অত্যাচারের তালিকায় অনেক কিছুই ছিল।

বিপ্লবের আগুন বালুরঘাট দিনাজপুরে ছড়িয়ে গেল।

১৩ই সেপ্টেম্বর আত্রাই নদীর পশ্চিম তীরে বালুরঘাট সহর থেকে মাইল তিনেক দূরে মধ্য রাত্রিতে ১০০টির অধিক বিপ্লবীদল সমবেত হয় কণ্ঠে নিয়ে সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা, করেঙ্গে য়্যা মরেঙ্গে। Quit India !

ভারত ছাড়।

সত্যাগ্রহী নেতা বিপ্লবী সরোজরঞ্জন সকলকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

১৪ই সেপ্টেম্বর ভোরে বিপ্লবীরা নদী পার হয়ে সহরের দিকে অগ্রসর হলো। Do or die ! করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

জনতা আদালত, ট্রেজারী, রেজিষ্ট্রী অফিস ও ডাকঘর প্রভৃতি সরকারী ভবনে হানা দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। টেলিগ্রাফ বিকল করে দেয়।

বেলা এগারটার সময় বিপ্লবীরা আবার প্রত্যাবর্তন করে।

২৪ ঘণ্টার জন্ম উক্ত অঞ্চল হতে বিদেশী শাসনকে দূর করা হয়।

উড়তে থাকে সগৌরবে তেরাঙ্গা পতাকা স্বাধীনতার প্রতীক বিজয় গৌরবে।

১৫ই থেকেই সরকারের সৈন্ত আমদানী হয় ও নৃশংস বেপরোয়া দমননীতি চলতে থাকে। পুলিশ ৬৬বার গুলি চালায়।

তিনব্যক্তি নিহত হয়, তাদের মধ্যে একজনের বয়স ছিল সত্তর বৎসর। বহু ব্যক্তি আহত হয়।

৭৫ হাজার টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়। বহু গৃহ ধ্বংস করা হয় এবং প্রচুর খাদ্যশস্য ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সরকার লুণ্ঠন করে।

বাংলাদেশে—বর্ধমান, বোলপুর, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, ময়মনসিং, সরকারী নৃশংস বর্বর নীতি নিষ্ঠুর নির্যাতন, হত্যা, লুণ্ঠন ও ধর্ষণ নির্বিবাদে চালিয়ে যায়।

সাতারা—৪২য়ের অগ্নিযজ্ঞের তীর্থভূমি।

সাতারা জেলা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ও দাক্ষিণাত্য মালভূমির পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। একদা ঐ সাতারাতেই মহারাষ্ট্রীয় কুলগৌরব ছত্রপতি শিবাজী রাজত্ব করতেন।

স্বাধীনতার জন্ম যে বীর বারংবার বিদেশীর বিরুদ্ধে আজীবন অস্ত্রমুখে নিজের ক্ষাত্রধর্মের পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন তাঁরই সহস্র স্মৃতিবিজড়িত ঐ সাতারা।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে সাতারা শ্বেতাঙ্গের পদানত হয়।

১৯৩১য়ের জুলাই মাসে বন-আইন অমান্ত আন্দোলনে সাতারার বিলাসী গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ বনের একটি বড় গাছ কেটে জাতীয় পতাকা উড়িয়ে ছিল এবং সরকার সেই সময় সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা ক্ষুদ্র বিলাসী গ্রামকে চারিদিক থেকে অবরোধ করে গুলি চালিয়েছিল। দুইটি কিশোরের রক্তে সেদিন রঞ্জিত হলো ধরণী।

৪২য়ের অগ্নিপ্রস্তুতির মুহূর্তে সাতারার অধিবাসীরাও মৃত্যুপণে এগিয়ে এলো।

মোরকা বাহিনী—কৃষাণ বাহিনী ২৯শে আগষ্ট কারাদগ্রামে মামলতদারের কাছারিতে হানা দিয়ে জাতীয় পতাকা উড়াল।

দ্বিতীয় মোরচা বাহিনী পাটানে ও তৃতীয় মোরচা বাহিনী তাসগাঁয়ে কাছারিতে হানা দেয়।

ভাডুজায় সরকারী পুলিশ বাহিনী সহস্রাধিক নিরস্ত্র অসহায় নরনারীর উপর নির্মমভাবে গুলিবর্ষণ করে। বিপ্লবী নেতা পরশুরাম বাজে পর পর তিনটি গুলি বিদ্ধ হওয়ায় স্বাধীনতার বেদীমূলে প্রাণ দেয়।

পুলিশের বর্বর নির্যাতনে বিপ্লবীদের কর্মপ্রচেষ্টা বা সংগ্রামলিপ্সা এতটুকুও প্রশমিত হয় না, তারা অতঃপর গোপনে গোপনে সংগ্রাম চালাতে সুরু করে।

১৯৪২ থেকে ১৯৭৫ সুদীর্ঘ তিনবৎসরকাল সাফল্যের সঙ্গে আন্দোলন চলেছিল। ঐ উপলক্ষে বিপ্লবীরা ডাকবাংলো, রেলষ্টেশন, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন প্রভৃতি ধ্বংস করে।

নেতাদের মধ্যে ছিল সেদিন নানা পাতিল, পাতু মাষ্টার, কিষাণ বীর, আপ্পা মাষ্টার, শ্রীনাথলাল ও ডাঃ উত্তম রাও। নানা পাতিলই ছিল সর্বময় কর্তা।

আপ্পা মাষ্টার মেদিনীপুরের বিদ্যুৎ বাহিনীর মত তুফান সেনা বাহিনী গঠন করেছিল।

তারপর আসাম।

আসামের অধিবাসীরাও সেদিন বিয়াল্লিশের ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

১৫ই আগষ্ট পুলিশ গোয়ালপাড়ায় একটি ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপরে বেপরোয়াভাবে গুলি চালায়। ফলে নয়জন আহত হয়।

২৪শে ফেব্রুয়ারী জোড়হাট জেলের মধ্যে আবদ্ধ অসহায় রাজনৈতিক বন্দীদের উপর সরকার বেপরোয়া লাঠি চালায় যার ফলে ১৮১জন বন্দী গুরুতর রূপে আহত হয়েছিল।

জনসাধারণ সেই বর্বরোচিত সংবাদে অত্যন্ত তিক্ত ও উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

পুরুষ-নারী বালক-বালিকার এক বিরাট দল দরং জিলার গোপুর, বেহালি ও ঢেকিয়া থানা আক্রমণ করে। প্রত্যেক জায়গাতেই সরকার প্রবল ভাবে গুলিবর্ষণ করে কিন্তু বিপ্লবীরা মৃত্যুভয়ে এতটুকুও কম্পিত হয় নি, অবিশ্রাম গুলিবর্ষণের মধ্যেই এগিয়ে গিয়ে জাতীয় পতাকা থানায় উত্তোলন করে।

বন্দেমাতরম।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

গোপুর থানার সম্মুখে।

২০শে সেপ্‌টেম্বর।

নর-নারী ও বালক-বালিকার দল দৃঢ় সংযত পদবিক্ষেপে এগিয়ে আসছে।

ইংরাজ ভারত ছাড়ো!

Quit India!

অগ্রবর্তিনী এক তরুণী কনকলতা।

রাইফেলধারী চীৎকার করে বললে, 'সাবধান এগিয়ো না আর। আর এগুলেই গুলি করা হবে।'

'তোমরা গুলি করতে পার, আমি আমার কর্তব্য পালন করবোই।'

হাতের দৃঢ়মুষ্টিতে ধরা জাতীয় পতাকা নিয়ে এগিয়ে আসে তবু কনকলতা, নির্ভীক স্থির অকম্পিত।

Fire!

চালাও গুলি!

দুম্! দুম্ দুড়ুম!

গর্জে উঠ্‌লো ব্রিটিশের অগ্নিনালিকা মৃত্যুরোষে।

লুটিয়ে পড়লো রক্তাক্ত কনকলতার সোনার দেহ মাটিতে। ধরিত্রী বক্ষ পেতে নিলেন শহীদ নারীর দেহখানি সযতনে।

এবারে এগিয়ে এলো মুকুন্দ কাওতি, তুলে নিল কনকলতার হাত হতে জাতীয় পতাকা, করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

দুম্—দুম্!—

লুটিয়ে পড়লো মুকুন্দ কাওতির প্রাণহীন দেহ।

এবারে দলবদ্ধভাবে অবিশ্রাম গুলিবর্ষণের মধ্যেও সকলে গিয়ে উড়িয়ে দিল জাতীয় পতাকা থানাভবনের শীর্ষে।

২০শে সেপ্‌টেম্বরই বিশ হাজার নরনারী ঢেকিয়াজুলি থানায় আক্রমণ

চালায়—এখানেও সরকারী বাহিনীর নৃশংস গুলিবর্ষণের মুখে কুড়িজন সংগ্রামী হাসিমুখে দৃঢ়চিত্তে মৃত্যুকে বরণ করে।

তা সত্ত্বেও থানায় উড়িয়েছিল সেদিন তারা জাতীয় পতাকা।

ক্ষিপ্ত সরকার সংগ্রামীদের দমনকল্পে নিষ্ঠুর দানবীয় অত্যাচার চালায় সর্বত্র।

নিরীহ নরনারীশিশু কেউই সে অত্যাচার হ'তে বাদ যায় না।

জরিমানা, ধর্ষন লুণ্ঠন, গৃহদাহ, লাঠি-চালনা ও গুলিবর্ষণ নির্বিবাদে সর্বত্র চলে সরকার বাহিনীর।

সরকারী নির্যাতনে সংগ্রামীদের প্রচেষ্টা গুপ্তপথে চলতে সুরু করে।

এবং দীর্ঘ চারমাস আসামে সরকারী প্রতিপত্তি ও শাসন লুপ্ত হয়েছিল।

বিয়াল্লিশের বহ্নি উড়িষ্যাতেও লেলিহান হ'য়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল।

এবং সেখানেও সরকারী নির্যাতন ও অত্যাচার নির্মমভাবে দেখা দিয়েছিল।

কোরাপুট জেলের মধ্যে যে নিষ্ঠুর অত্যাচার সরকার চালিয়েছিল সভ্যজগতে কোথায়ও তার নিদর্শন মিলবে না।

রুদ্র বিয়াল্লিশ!

দিক্ হতে দিগন্তে রুদ্রের প্রতি পাদবিক্ষেপে জ্বলছে আগুন।

> দগ্ধ তাম্র দিগন্তের কোন্ ছিদ্র হতে ছুটে আসে।
> কি ভীষণ অদৃশ্য নৃত্যে মাতি উঠে মধ্যাহ্ন আকাশে
> *　　　　*　　　　*
> মত্তশ্রমে শ্বাসিছে হুতাশ।
> রহিরহি দহিদহি উগ্রবেগে উঠিছে ঘুরিয়া,
> আবর্তিয়া তৃণপর্ণ, ঘূর্ণচ্ছন্দে শূন্যে আলোড়িয়া
> চূর্ণ রেণু রাশ
> মত্তশ্রমে শ্বাসিছে হুতাশ॥

উদ্বেলিত সমগ্র ভারতের আত্মা।

অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত দেশ।

মুক্তি-সংগ্রামের রক্তে লাল বিয়াল্লিশ।

মহাত্মার চম্পারণ সত্যাগ্রহের লীলাভূমি বিহার। বিয়াল্লিশের বহ্নিশিখা বিহারেরও একপ্রান্ত হ'তে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত দাবানল জ্বেলে দিল।

গুলি-গোলায় কামানে বন্দুকে ভেসে গেল বিহার-ভূমি।

রক্তে রাঙা হয়ে গেল বিহারের মাটি।

চম্পারণ, কাটিহার, রাঁচি, পাটনা, সীতামারি, বাঁকিপুর, বিদপুর, ভাগলপুর, সাহাবাদ, লাহেরিয়াসরাই সর্বত্রই দেখতে দেখতে বিপ্লবের হোমাগ্নি ছড়িয়ে পড়ে।

বিপ্লবীর দল পাটনার পরিষদ ভবনে জাতীয় পতাকা উড্ডীন করতে গিয়ে পুলিশের গুলিতে সাতজন প্রাণ দেয়।

ক্ষিপ্ত জনসাধারণ অতঃপর দুর্বার ও দুর্মদ হয়ে ওঠে।

টেলিগ্রাফ টেলিফোন সব ধ্বংস করে ফেলে।

বাঁকীপুর জেলের সামনে বিপ্লবীদল ও পুলিশদলের মধ্যে কয়েক ঘণ্টাব্যাপী হয় সম্মুখ যুদ্ধ।

রক্তে পাটনা সহর লাল হয়ে যায়।

শেষ পর্যন্ত এলো মিলিটারী।

চললো বেপরোয়া গুলি—হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠন।

বিহারের বহুস্থানে শ্বেতাঙ্গ শাসন লোপ পায়, জনগণই প্রতিষ্ঠিত করে তাদের গণরাজ।

প্রায় ছয় শতাধিক লোক বিহারের মুক্তি-সংগ্রামে গুলিতে প্রাণ দেয়।

পরে বহু বিপ্লবীর ফাঁসিও হয়। বহু টাকার পাইকারী জরিমানা আদায় করা হয়।

যুক্তপ্রদেশেও জ্বলে ওঠে বিপ্লবের লেলিহান অগ্নিশিখা।

এলাহাবাদ, আলিগড়, কাশী ও লক্ষ্ণৌ সর্বত্র নির্মম হত্যানুষ্ঠান ও গোলাগুলি চলে বিপ্লবীদের দমনকল্পে।

মাদ্রাজও নিশ্চুপ থাকেনি সেই আন্দোলনের মুহূর্তে।

১৭ই আগষ্ট মাদ্রাজ ষ্টেশনে ও সরকারী ভবনে বিপ্লবীরা আগুন ধরিয়ে দেয়।

১৩ই বাংগালোরে পুলিশের গুলিতে ৭ জন নিহত ও ৭০ জন হয় আহত।

মাদ্রাজের লবণগোলা ও নীলগিরিতেও চলে অভিযান।

মধ্যপ্রদেশ ও দিল্লীতেও ছড়িয়ে যায় বিপ্লবের আগুণ।

●

অথ অস্তি ও চিমুর কাহিনী।

মধ্যপ্রদেশের ওয়ার্ধা জেলায় অস্তি ও চন্দা জেলায় চিমুর গ্রাম।

৪২য়ের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অস্তি ও চিমুরের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন।

১৬ই আগষ্ট অস্তি ও চিমুর থানা বিপ্লবীরা আক্রমণ করে এবং শ্বেতাঙ্গের পদাশ্রিত দারোগা ও কনেষ্টবলদের নির্মমভাবে হত্যা করে তারা তাদের অগ্রগমনে বাধা দেওয়ায়।

১৯শে আগষ্ট চন্দার ডেপুটি কমিশনার সেই সংবাদ পেয়ে ২০০ ব্রিটিশ সৈন্য, ৫০ জন ভারতীয় সৈন্য ও ৫০ জন সশস্ত্র পুলিশ সহ চিমুরে এসে আবির্ভূত হয়। তারপর সুরু করে তারা পাশবিক অত্যাচার।

বেপরোয়া গুলি চালনা, লুণ্ঠন, হত্যা, গৃহ ভূমিসাৎ, নারী-ধর্ষণ ও গ্রেপ্তার চালাতে থাকে ২৬শে আগষ্ট পর্যন্ত।

অতঃপর যখন তারা চিমুর ত্যাগ করে চলে যায় চিমুরে স্ত্রীলোক ও শিশু ছাড়া একটি পুরুষও ছিল না।

বোম্বাই কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক পরমধার্মিক ঋষিতুল্য জে, পি, ভানসালি চিমুরের নারকীয় অত্যাচারের প্রতিকারার্থ দিল্লীস্থিত তদানীন্তন বড়লাট বাহাদুরের মন্ত্রিসভার সদস্য মিঃ এম্. এস আণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেও কোন সাহায্য বা প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি না পেয়ে অনশন সুরু করেন মিঃ আণের বাড়ীতেই!

অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করে দিল্লী জেলে নিয়ে গিয়ে জোর ক'রে খাঁওয়ান হয় এবং ৭ই নভেম্বর তাকে মুক্তি দেওয়া হয়।

পুনরায় ১১ই তিনি অনশন সুরু করেন চিমুরে গিয়ে এবং এবারে তাঁকে বলপূর্বক সেবাগ্রামে ধরে আনা হয়।

কিন্তু লৌহকঠিন প্রকৃতির লোক ভানসালি; ১৯শে আবার তিনি পদব্রজে অনশন অবস্থায় একান্ত দুর্বল দেহেই কোনক্রমে চিমুরে গিয়ে পৌছান। সরকার আবার তাঁকে ধরে ষ্ট্রেচারে করে সেবাগ্রামে প্রেরণ করে। দুই পক্ষকাল পরে ভানসালি চিমুর অভিমুখে যাত্রা করেন, তাঁর কণ্ঠে সেই এক বাণী:

যাহাতে এই মুনিঋষির দেশে কোন নারীর মর্যাদা হানি না হয় সেই উদ্দেশ্যে আমি মৃত্যুবরণ করিতেছি।

অতঃপর সরকারের প্রতিশ্রুতি আদায় করে ১২ই জানুয়ারী দীর্ঘ ৬১ দিবস পরে তিনি অনশন ভঙ্গ করেন।

অষ্টি ও চিমুরের মামলায় শ্বেতাঙ্গের বিচারে তাদের নিম্ন আদালতে ২০ জনার প্রতি ফাঁসি ও ২৫ জনার প্রতি দণ্ডাদেশ হয় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের।

উচ্চ আদালতে ১৫ জনার ফাঁসির হুকুম বহাল থাকে, পরে অবশ্য মহাত্মার আবেদনে শ্বেতাঙ্গ সরকার ফাঁসির হুকুম মকুব করে।

৪২য়ের অন্দোলনকে, মুক্তি-সংগ্রামকে নির্বাপিত করবার জন্য শ্বেতাঙ্গ সরকার যে জঘন্য রুচির পরিচয় দিয়েছে, যে পাশবিক অত্যাচারের স্রোত বহিয়েছে, যে বেপরোয়া ও ব্যাপক গোলাগুলি বর্ষণ, হত্যা, লুণ্ঠন, নারীধর্ষণ, শিশুহত্যা, গৃহদাহ, পাইকারী জরিমানা করেছে এবং কারাদণ্ড ও ফাঁসি দিয়েছে তার নজির একমাত্র হয়ত ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদের নথিপত্রেই মিলবে।

নেতৃহীন অবস্থায় ভারতের জনগণ যে দৃঢ়তা, সংবদ্ধতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছে, যে ভাবে নির্ভীকচিত্তে অকুণ্ঠ তারা একের পর এক মৃত্যুকে বরণ করেছে, বুকের রক্তে মাটি লাল করে দিয়ে গিয়েছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্যে হাজারে হাজারে লাখে লাখে ঝাঁপিয়ে পড়ে, বিদ্রোহী ভারতের ইতিবৃত্তের পাতায় তা চিরদিনের ও চিরকালের জন্যই লেখা হয়ে গিয়েছে।

শত শত কম্বুকণ্ঠে সেই নিনাদ : করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে !

Do or die !

ইংরাজ ভারত ছোড় দো !

Quit India !

—আট—

আজাদ হিন্দ্ !

জয় হিন্দ্ !

ভারতের মাটিতে যখন জলছে বিপ্লবের হোমাগ্নি-শিখা দাউ দাউ করে রক্তাক্ত ভয়াল—

প্রশান্ত মহাসাগরের তীর্থে পূর্ব এশিয়ায় তখন ঘরছাড়া বিপ্লবী সুভাষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠ্ছে : Friends ! let the slogan of the three million Indians in "East Asia" be "Total Mobilisation For a Total war".

ভেসে আসছে ঘরছাড়া বিপ্লবীর অগ্নিক্ষরা বাণী ! আজীবন লালিত স্বপ্নের ডাক !

It is not mere arms that decide the issue of a War ; it is the Spirit of the Army that wins a war ; we have develop that Spirit and with that unbreakable Spirit, we must win this war of India's liberation.

* * *

What we want is a Blood Bath and then we are sure to free India. We must have the blindest faith in our ultimate Victory.

রক্ত। রক্তস্নানে আসবে সেই আমাদের চিরআকাঙ্খিত স্বাধীনতা! প্রশমিত হবে আমাদের পৌণে দুইশত বৎসরের পরাধীনতার মর্মন্তুদ জ্বালা!

আমাদের কোটি কোটি জনগণের স্বপ্ন!

আমাদের স্বাধীন ভারত! হামারা হিন্দুস্থান!

We can take blood, only if we are prepared to give blood. The blood of our heroes in this war will wash away our sins of the past. The blood of our heroes will be the price of our liberty. Therefore, I call for a blood bath!

রক্তস্নানে শুচি হও! প্রতিজ্ঞা গ্রহণ কর।

আজকে নয়, যে প্রদীপ-শিখাগুলি তোমরা তোমাদের প্রতিজ্ঞা ও রক্ত দিয়ে জ্বালাবে অদূর ভবিষ্যতে একদিন সেই শিখাগুলিই হাজার হাজার লাখো লাখো হয়ে জ্বলে উঠে চিরতিমির রাত্রির ঘটাবে অবসান!

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই.
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আজাদ হিন্দ ফৌজের মহানায়ক, চিরঅশান্ত, চিরবিপ্লবী সুভাষচন্দ্র সমগ্র ভারতের নেতাজী—১৯৪০য়ের ১৩ই ডিসেম্বর মোটর যোগে কলকাতা থেকে বর্ধমান ষ্টেশনে পৌছে পাঞ্জাব মেলের এক সেকেণ্ড ক্লাশ কামরায় উঠে বসেন।

ঘরের বাঁধন তাঁকে ধরে রাখতে পারে নি, স্বাধীনতার অগ্রদূতের বুক ভরে জনবধি যে স্বাধীনতার অগ্নিদাহ চলছিল তাই তাকে শেষ পর্যন্ত ঘর ছাড়া করলে। নতুন পথের সন্ধানে সে এগিয়ে চললো।

দীর্ঘ শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত পেশোয়ারী বেশভূষায় সুভাষকে সেদিন বাঙ্গালী বলে কারও চিনবারও উপায় ছিল না।

পেশোয়ারে পৌছে সুভাষ টোঙ্গায় চেপে পাঁচ মাইল যান, সেখান থেকে হাঁটা পথে কাবুল।

কাবুলে পৌঁছে সুভাষ রুশের সাহায্যলাভের আশায় রুশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। কিন্তু রুশ-জার্মান চুক্তি তখন প্রায় ভাঙ্গনের মুখে, রুশ সরকার ইংরেজকে চটাতে সাহস করলে না।

সুভাষ রুশের কাছ হতে কোন সাহায্য পেলেন না।

অবশেষে এক জার্মাণের সাহায্য বার্লিনে সংবাদ প্রেরণ করে বিমাণযোগে রাশিয়ার উপর দিয়ে উড়ে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে গিয়ে উপনীত হলেন।

সেখানে—জার্মানীতে সুভাষচন্দ্র যুদ্ধবন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর ইউরোপীয় কমাণ্ড গঠন করেন।

১৯৪৩য়ের ২রা জুন সুভাষ সিংগাপুরে (সাইননে) যে উড়োজাহাজে করে এসে নামলেন।

এশিয়ার মুক্তি-সংগ্রামের নব দূত।

৫ই জুন সাইননের টাউন হলের সামনে বিরাট জনতা সুভাষকে জানাল অভিনন্দন: নেতাজী! আজাদ হিন্দ ফৌজের সমস্ত সেনানী শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান।

সেদিন তার কণ্ঠে ধ্বনিত হলো: হে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক, তোমাদের অভিনন্দন জানাই!

আজকের এই দিনটি জীবনের আমার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন। আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর গৌরব অনুভব করা উচিত যে ভারতীয় জাতীয় বাহিনীর হলো নতুন করে অভ্যুদয়। বন্ধুগণ, সৈনিকগণ, যাত্রীগণ, আজ একমাত্র সমর-নিনাদে গগন বিকম্পিত করে ধ্বনিত হোক—দিল্লী চলো, দিল্লীর লালকিল্লায় জাতীয় পতাকা উড়াও আর সেখানে সাম্রাজ্যবাদের সমাধিক্ষেত্র রচনা কর।

এই আমাদের মৃত্যুপণ। আমাদের মুক্তির সংগ্রাম। Battle for freedom! It does not matter who among us will live to see India free. It is enough that India shall be free and that we shall give our all to make her free!

একথা নিশ্চিত যে আমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যে পর্যন্ত না পুরাতন লালকিল্লা আমাদের অধিকৃত হয়, যে পর্যন্ত না লালকিল্লার শিখরে আমরা আমাদের জাতীয় পতাকা উড়াতে পারি, যে পর্যন্ত না সাম্রাজ্যবাদ শ্মশানে পরিণত করতে পারি, আমাদের কর্তব্য শেষ হবে না। আমরা কখনো যুদ্ধে

বিরত হবো না, পিছিয়ে আসবো না। যেদিন আমরা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ দিল্লী অভিযান সুরু করবো, যেদিন দিল্লীর সরকারী ভবনে আমাদের জাতীয় পতাকা উড়াতে সমর্থ হবো, যেদিন সেই সুপ্রাচীন লালকিল্লার অভ্যন্তরে আমাদের স্বাধীনতার সৈনিকেরা বিজয় উৎসবে উল্লসিত হয়ে উঠ্‌বে—কেবল মাত্র সেই দিনই আমাদের অভিযান সম্পূর্ণ হবে।

আমার বন্ধু, ভাই ও সহকর্মীর দল—ভারতের জাতীয় গৌরব, জাতীয় সম্মান, জাতীয় প্রতিষ্ঠা আপনাদেরই হাতে ন্যস্ত, তাই আপনারা এমনভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন যেন আপনাদের ভবিষ্যৎ বংশধরেরা আপনাদের স্মরণ করতে গিয়ে গৌরববোধ করতে পারে যে কতবড় স্বার্থত্যাগী, স্বাধীনতাকামী বীরপুরুষদের বংশধর তারা। আপনাদের সুখে দুঃখে জয়-পরাজয়ের আনন্দে আপনাদের পাশে পাশেই আমি আছি এবং থাকবোও। দুর্যোগের ঘনান্ধকারেই হোক, বিজয়ের গৌরবেই হোক আপনাদের সহকর্মী হিসাবে আমাকে আপনারা সর্বদাই পাশে পাশে পাবেন। কিন্তু আপাততঃ আমার দেবার মত আপনাদের কিছুই নেই। এমন কিছু আমাদের নেই যা দিয়ে আপনাদের মনে এতটুকু আনন্দও দিতে পারি।

আমাদের পথ দুর্গম, অর্ধাশন বা অনশনেই হয়ত অনেকদিন আমাদের কাটাতে হবে। হয়ত এমন অবস্থা আমাদের আসবে যে আমরা ক্ষুধায় এক মুঠি অন্ন পাবো না, তৃষ্ণায় এক ফোঁটা জল পাবো না। কষ্টের হয়ত আমাদের অবধি থাকবে না। কখন কোথায় আমাদের যেতে হবে নিশ্চয়তা নেই কেউ বলতে পারে না কখন মৃত্যু এসে সামনে দাঁড়াবে, তবু আমাদের গৌরব যে ভারতের মুক্তি বাহিনীর আমরা সৈনিক।

We are soldiers !

Comrades ! you have voluntarily accepted a misson that is the noblest the human mind can conceive of. For the fulfilment of such a mission, no sacrifice is too great, not even the Sacrifice of one's life. You are to day the custodians of India's hopes and aspirations. So conduct yourself that our country men may bless you and posterity may be proud of you.

আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনানীদের অন্তরে সেদিন যেন স্বাধীনতার লাগি

প্রতিজ্ঞার মৃত্যুপণের বিদ্যুৎ সঞ্চারিত হয়ে গেল। ৮ই জুলাই সুভাষ সমগ্র জগতের সামনে বজ্রকণ্ঠে আজাদ হিন্দ নামে এক অপূর্ব ফৌজের সংগঠনের কথা ঘোষণা করলেন।

৯ই জুলাই সাইননে পঞ্চাশ হাজার ভারতীয়ের উপস্থিতিতে এক বিরাট সভা হয়, সেদিন তিনি জানালেন সেই অগণিত জনগণের সামনে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সকলের ধন জন ও সম্পদ অর্পণের সামগ্রিক দাবী। ২৫শে আগষ্ট ব্যক্ত হলো তাঁর ভাষণে বৃটিশ শক্তিকে আক্রমণের অভিপ্রায়।

Comrades, Officers and Friends,—

There in the distance beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills and dales lies the promised Land, the sacred Land from which we sprang—the Land to which we shall now return. Hark, India is calling...Blood is calling to Blood. Rise, we have no time to loose. Take up your arms··· we shall make our way through the enemy's ranks or if God wills, we shall die a martyr's death. And in our last step we shall kiss the road that will bring our Army to Delhi. The road to Delhi, the road to Freedom.

১৯৪০ সালে ২১শে অক্টোবর ঝান্সীর সেই বিপ্লবী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের জন্মদিবসে রাণী ঝান্সী রেজিমেণ্টের গোড়াপত্তন হলো সিঙ্গাপুরে।

নেতৃত্ব দেওয়া হলো মদ্রদেশীয় প্রবাসী মেয়ে ডাঃ লক্ষ্মী স্বামীনাথনের উপর।

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী।

দলে দলে স্বেচ্ছাসেবিকারা এসে যোগ দিতে লাগল রেজিমেণ্টে।

ক্রমে আরো বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবিকা সংগ্রহের কেন্দ্র ও শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়।

ড্রিল, অস্ত্রচালনা, রণকৌশল, মানচিত্র পর্যবেক্ষণ ও সাধারণ বিষয়ে বক্তৃতা ঐ সব স্থানে দেওয়া হতো।

ঝান্সীর রাণী রেজিমেণ্ট গঠনের উদ্দেশ্য ছিল দেশের তরুণীদের এমন ভাবে

গড়ে তোলা যাতে করে তারা ভাই ও স্বামীদের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করতে পারে।

সামরিক শিক্ষা ছাড়াও তারা সেবা-শুশ্রূষা, জন-কল্যাণ, সমাজ-সেবা প্রভৃতি বিষয়ও শিক্ষা লাভ করত। আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের সামরিক শিক্ষাদানের জন্য সুদক্ষ সামরিক বিশেষজ্ঞদের অধীনে সামরিক শিক্ষাকেন্দ্রও খোলা হয়।

১৯৪৩—২১শে অক্টোবর সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিনিধিদের সামনে অস্থায়ী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হলো—

রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমরসচিব, পররাষ্ট্রসচিব এবং আজাদ হিন্দ সৈন্যবাহিনীর প্রধান সেনাপতি—শ্রীসুভাষচন্দ্র, নেতাজি!

প্রচার সচিব—মিঃ এস, এ, আয়ার। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী—মহিলা দপ্তর। অর্থসচিব—লেঃ কঃ এ, সি, চ্যাটার্জী।

রাসবিহারী বসু—প্রধান উপদেষ্টা।

সেক্রেটারী—আনন্দ মোহন সহায়। উপদেষ্টাবৃন্দ—দেবনাথ দাস, ডি, এম, খান প্রভৃতি এবং সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধিবৃন্দ নিযুক্ত হলো: লেঃ কঃ আজিজ আহমদ, লেঃ কঃ এন, এস্ ভগৎ, কঃ জে, কে, ভোঁসলা, লেঃ কঃ গুলজারা সিং, লেঃ কঃ এম, জেড্, কিয়ানী, লেঃ কঃ এ, পি, লোকনাথন, লেঃ কঃ আইসান কাদির ও লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ।

মূলত আজাদ হিন্দ ফৌজ ও সরকার সব কিছুই গড়ে উঠেছিল প্রবাসী ভারতীয়দেরই অর্থে, সাহায্যে, সহানুভূতিতে ও পরিশ্রমে।

আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩ সালের ২৩শে অক্টোবর ব্রিটিশ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

ঐ বৎসরেই শেষের দিকে আজাদ হিন্দ সরকারের হেড্ কোয়ার্টার সাইনন থেকে বর্মাতে স্থানান্তরিত করা হয়।

এবং ঐ বৎসরেই ডিসেম্বর মাসে নেতাজি সুভাষও রেঙ্গুনে চলে আসেন।

আজাদ হিন্দ সরকারের নিজস্ব প্রচারকার্যের জন্য প্রথম দিকে সাইননে একটি বেতার কেন্দ্র ছিল পরে বর্মায় হেড কোয়ার্টার স্থানান্তরিত হবার পর ইন্দোবর্মা ফ্রন্টিয়ারে আরো একটি বেতার কেন্দ্র স্থাপিত হয়।

১৯৪৩য়ের ৫ই ও ৬ই নভেম্বর বৃহত্তর পূর্ব এশিয়ার স্বাধীন জাতিদের প্রতিনিধিদের টোকিওতে এক সম্মেলন হয়।

আজাদ হিন্দ সরকারের পক্ষ থেকে নেতাজি সুভাষও সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এবং ঐ বৈঠকেই জাপানের তদানীন্তন প্রধান মন্ত্রী তোজো আজাদ হিন্দ সরকারকে মেনে নেয় এবং তাদের হাতে ব্রিটিশ কবলমুক্ত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের শাসন ও কর্তৃত্বভার তুলে দেয়।

আজাদ হিন্দের পক্ষ হ'তে নেতাজি সুভাষ কর্ণেল লোকনাথনকে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের কমিশনার নিযুক্ত করেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বীপ দুটির নতুন নামাকরণ করা হলো শহীদ ও স্বরাজ দ্বীপ। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় সে একটি স্বর্ণাঙ্কিত দিন।

১৯৪৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কর্ণেল লোকনাথন তাঁর কাজ সুরু করেন ঐ দ্বীপপুঞ্জের শাসনকর্তা হিসাবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের হিংসানলে বাংলায়, সোনার বাঙলায় এসেছে তখন পঞ্চাশের মন্বন্তর। ধান চাল পেটিতে পেটিতে গাঁটরীতে গাঁটরীতে বস্তায় বস্তায় ভরে রাতের অন্ধকারে গোপনে গোপনে খাল বিল নদী পথে নৌকায় চাপিয়ে, ট্রেনের ওয়াগনে ওয়াগনে ঠেসে বাংলার সমস্ত গ্রামগুলো থেকে চোরা-কারবারীদের সাহায্যে সরকারের গুদামে নিয়ে তোলা হয়েছে যুদ্ধের জঠরানল নির্বাপিত করতে।

সহরবাসী মুনাফাখোর চোরকারবারীদের সিন্দুক রজত মুদ্রায় ভরে উঠেছে আর ওদিকে বাংলার গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে ঘনিয়ে এসেছে ক্ষুধার করাল ছায়া।

দুর্ভিক্ষ!

মন্বন্তর!

ম্যায় ভুখা হুঁ! শ্বেতাঙ্গ সরকার ঘোষণা করেছে: যুদ্ধের দরুণ সাহায্য অসম্ভব।

ক্ষুধার অন্ন নেই, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র নেই—হাহাকারে হাহাকারে বাংলার আকাশ বাতাস বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

দলে দলে ক্ষুধার জ্বালায় সব গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে ছোটে।

কিন্তু অন্ন কোথায় সহরে!

মৃত্যু আসে এগিয়ে।

কালো হাত বিষাক্ত নখর বিস্তার করে ঝাপটে ধরে।

মৃত্যু!

ভয়াবহ মৃত্যু।

চিরশস্যশ্যামলা বাংলার সবুজ ওড়নায় বুভুক্ষার অগ্নিপরশ; বাংলার নীলাকাশে মৃত্যুবিষের ধোঁয়া।

পথে পথে ভয়াবহ বুভুক্ষার ও মৃত্যুর মিছিল।

মৃতদেহগুলো নিয়ে টানা-হিঁচড়া করে শৃগাল সারমেয় শকুনী গৃধিনী।

পূর্ব এশিয়ার তীরে অস্ত্র শানাচ্ছে নেতাজির অধীনস্থ মুক্তি ফৌজ, জাতীয় বাহিনীর সেনানীরা।

গেয়ে চলেছে, সৈনিক! মুক্তি-সংগ্রামের সৈনিক আমরা। দাসত্বের আটা ঘি পাওয়ার চাইতে হাজার হাজার গুণে শ্রেয় খাদ্য মুক্তির দুর্বাদলও—

কদম্ কদম্ বাঢ়ায়ে যা,<br>
খুসী কি গীত গায়ে যা<br>
ই'য়ে জিন্দিগী হ্যায় কৌম কি<br>
কৌম পর লুটায়ে যা—

আর ওদিকে উচ্ছিষ্টলোভী একদল ভারতীয় সৈনিক শ্বেতাঙ্গের সাম্রাজ্য-লিপ্সার আগুনে সামান্য আটা রুটি ও বেশী তংকার লোভে নিজেদের আত্মহত্যা করে চলেছে নির্বিবাদে। তাদের কানে পৌঁছায় নি সে অগ্নিক্ষরা নেতাজীর বাণী।

I rememer having read years ago a book written by an English man called Meridith Conrade, referring to India he remarked in that book that once the Indian people are united, it would be impossible to the British to continue this domination over India. And in the cours of his remarks, he said that an Empire which rose in a day will vanish in Night!

শুনতে পায়নি কি হতভাগ্যের দল।

পশে নি কি তাদের কানে সেই অগ্নিগর্ভ ডাক :

What we want is a Blood Bath and then we are sure to free India !

Give me Blood ! I will give you Freedom !

১৯৪৪য়ের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী আজাদ হিন্দ ফৌজের ভারতরক্ষী বৃটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সুরু হলো প্রথম অভিযান।

এই আক্রমণ সুরু হয় আরাকান অঞ্চলে।

এবং ঐ আরাকান যুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য মেজর মিশ্রকে সর্বাধিনায়ক নেতাজি সর্দার-ই-জঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন।

২৭শে মার্চ নেতাজি এক বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন—আজাদ হিন্দ ফৌজ দুইদিন পূর্বে সীমান্ত অতিক্রম পূর্বক ভারতভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে—

পরে আবার ৪ঠা জুলাই নেতাজি এক বেতার ভাষণে বলেন : India's last war of independence began on the 4th February 1944, in the Arakan region of Burma. It was on the historic day units of Azad Hind Fauj went into action against the forces of our enemy. The Arakan fight—though it may not be a big episode in history—has for us a special significance and for two reasons. Firstly, it was in this Arakans that our offensive aganist the enemy began. Secondly, it was in the Arakan fight that our troops recived their first "Baptism of Fire."

"জয় হিন্দ্ !

কূটচক্রী শ্বেতাঙ্গ সরকার সেদিনকার সুভাষের সেই স্বাধীনতার নবোদ্যমকে ও আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক চির স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী সুভাষকে দেশের শত্রু কুইসলিং প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে সুভাষের নামে ও কার্যকলাপে কলঙ্ক-কালিমা লেপনের অনেক চেষ্টাই করেছিল। চেষ্টার ত্রুটি করেনি সুভাষকে ও তাঁর কার্যকলাপকে ভারতবাসীর কাছে হেয় ও ঘৃণ্য প্রতিপন্ন করতে। সেই

সময়কার ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নেতারাও সুভাষকে ও তাঁর কর্মপদ্ধতি ও প্রয়াসকে সুচক্ষে দেখতে পারেনি।

দুর্ভাগ্য।

হায় রে দুর্ভাগা দেশ!

১৯৪৪ সনের ৬ই জুলাই নেতাজীর মহাত্মাকে সম্বোধন করে সুদূর পূর্ব-এশিয়া থেকে বেতার-ভাষণ হয়ত তারই জবাব।

Mahatmaji,

...I am taking the liberty of addressing a few words to you with a view to acquainting you with the plans and the activities of Patriotic Indians outside India.

...There are Indians outside India and also at home, who are convinced that Indian Independence will be won only through the historic method of struggle. These men and women honestly feel that the British Government will never surrender to persuasion or moral Pressure or non-violent resistence. Nevertheless, for Indians outside India, differences in method are like domestic defferences.

...For the world-public, we Indian nationalists are all one having but one goal, one desire and one endeavour in life...There is no Indian, whether at home or abroad, who would not be happy if India's Freedom could be won through the method that you have advocated all your life and without shedding human blood. But things being what they are, I am convinced that if we do desire freedom we must be prepared to wade through blood.

আমি জানি এবং আমার কানেও আসে যে আমার বিরুদ্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা ও কুৎসিত প্রচারকার্য চালন হচ্ছে আমারই দেশে আমাকে হেয় ও বিশ্বাসঘাতক প্রতিপন্ন করবার জন্য। কিন্তু এও আমি জানি, আমার দেশবাসী যাঁরা আমাকে বেশ ভাল করেই চেনেন তাঁদের মনকে কেউই আমার বিরুদ্ধে বিষিয়ে দিতে পারবে না।

One who has stood for national self-respect and honour all his life and has suffered considerbly in vindicating it, would be the last person in this world to give into any other foreign power. Having received the highest honour possible for an Indian at the hands of my own Countrymen, what is there for me to recieve from a foreign power !

একমাত্র অন্যের হাতে ক্রীড়নক হতে পারে সেই যার নিজের আত্মসম্মান বলে কোন বোধ নেই বা যে নিজের উন্নতির জন্য পরমুখাপেক্ষী, অন্যের পদাশ্রয়ী।

Not even my worst enemy can ever dare to say that I am capable of selling national honour and self-respect. And not even my worst enemy can dare to assert that I was no body in my own Country and that I needed foreign help to secure a position for myself...Can it be possible that I have been deceived by Axis Powers ? I believe that it will be Universally admitted that the cleverst and the most cunning politicians are to be found amongst Britishers. One who has worked with and faught British politicians all his life, can not be deceived by any other politician in the world. If British Politicians have failed to coax or coeree me, no other Politician can succeed in doing so. And if the British Government, at whose hands I have suffered long imprisonment, persecution and physical assault, has been unable to demoralise me, no other power can hope to do so...

মহাত্মাজি! আজাদ হিন্দ্ প্রভিন্স্যাল গভর্নমেণ্ট সম্পর্কে আপনাকে কিছু আমি বলতে চাই। যে মুহূর্তে আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ থেকে আমাদের শত্রুরা বিতাড়িত হবে, দেশে আবার ফিরে প্রতিষ্ঠিত হবে শান্তি ও শৃঙ্খলা, আজাদ হিন্দ সরকারের কাজও শেষ হবে সেই মুহূর্তে।

It will then be for the Indian People themselves to determine the form of Government that they choose and also

to decide as to who should take chargc of the Government. I can assure you, Mahatmaji, that I and all those whe are working with me, regard themselves as the servants of the Indian people.

আমাদের কাজের জন্য আমাদের দুঃখ কষ্ট লাঞ্ছনা মৃত্যু ও ত্যাগের জন্য যদি কিছু থাকে, একটি মাত্র পুরস্কারই আমরা আশা করি—আমাদের দেশের মুক্তি, চল্লিশ কোটি নর-নারীর স্বাধীনতা। মুক্তি !

হে আমাদের জাতির পিতা !

In this holy war for India's liberation we ask for your blessings and good wishes !

জয় হিন্দ্‌ !

১৯৪৪ সনের বসন্ত সমাগমে নেতাজির নেতৃত্বে ভারতীয় মুক্তিফৌজ বাহিনী আজাদ হিন্দ ফৌজের ইম্ফল অভিযানের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং সৈন্যদলকে নতুনভাবে সংগঠিত করে নবোদ্যমে ভারতভূমি অধিকারের জন্য অগ্রসর হয়।

এতকাল তারা বিদেশের বেতনভোগী হ'য়ে নিজেদের জন্মভূমির শৃঙ্খলকে দৃঢ় করবার জন্যই বিদেশী প্রভুর আজ্ঞায় অস্ত্রধারণ করেছে, মৃত্যুকেও বরণ করে নিয়েছে, কিন্তু আজ তারা চলেচে সেই বিদেশী শত্রুকেই জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত করতে।

সোনার মাটিতে প্রোথিত করতে জাতীয় পতাকা !

Union Jackয়ের বদলে আজ তারা দিল্লীর লালকেল্লায় উড্ডীন দেখতে চায় নিজেদের তেরঙ্গা জাতীয় পতাকা।

তাই তাদের কণ্ঠে আজ তূর্যনিনাদ।

চলো চলো, দিল্লী চলো !

চলো দিল্লী চলে হাম !

কদম কদম বাঢ়ায়ে যা, খুসীকি গীত গায়ে যা।

দেশ হামারা হিন্দুস্থান।

বন্দেমাতরম্‌।

জয়হিন্দ্‌।

চলেছে হাজারে হাজারে সৈন্য দেশের জন্য আজ কোরবানী হতে।

দুর্ধর্ষ সৈন্যের দল মুক্তিফৌজের সেনানীরা ও জাপবাহিনী ব্রহ্ম সীমান্ত অতিক্রম করে আসামের পূর্ব সীমান্তস্থিত মণিপুর রাজ্যে প্রবেশ করল।

এবং একদিকে রাজধানী ইম্ফল ও অন্যদিকে কোহিমা হলো আক্রান্ত।

এদিকে নব আষাঢ়ের সূচনায় আকাশে মেঘের দল হয়ে উঠেছে ঘন।

গুরু গুরু ডাক! বিদ্যুতের চকিত ইসারা।

ঝম··ঝম···ঝম। বৃষ্টি হলো সুরু।

রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত পিচ্ছিল ও অগম্য হয়ে উঠ্‌লো। ফেব্রুয়ারী মাসে বসন্তকালে আজাদ হিন্দ ফৌজের অভিযান সুরু হয়েছিল আর ছয় মাস পরে জুলাই মাসে আসামের বর্ষার দুর্যোগে, খাদ্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহে জাপানের অক্ষমতায় নানা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে গতি তাদের প্রতিরুদ্ধ হলো।

নেতাজির রণ-পরিকল্পনায় আকস্মিক বিঘ্ন এসে দেখা দিল।

একপ্রকার বাধ্য হয়েই তাদের পশ্চাদপসরণ করতে হলো। জাপবাহিনীও তখন পশ্চাদপসরণ সুরু করেছে।

এই সুযোগে ব্রিটিশবাহিনী ব্রহ্মের পথে অগ্রসর হলো দ্বিগুণ উৎসাহে।

বস্তুত মণিপুর অভিযানের ব্যর্থতাই আজাদ হিন্দ ফৌজের মধ্যে যে বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ সন্দেহ নেই, তথাপি মনের বল তারা সেদিন হারায়নি।

ভেঙ্গে পরেনি তারা হতাশায়।

নেতাজির সামনে এসে যখন তারা দাঁড়াল, শুনালেন তাদের তিনি নতুন আশার বাণী।

বললেন, আবার নতুন করে, আরো শক্তিশালী সৈন্যদল আমরা গড়ে তুলবো, দিল্লী আমাদের পৌছাতে হবেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, যুদ্ধের গতি তখন অন্যদিকে মোড় নিয়েছে।

জাপানীদের মনোবলে ধরেছে ভাঙ্গন। এবং কোহিমা হতে পশ্চাদপসরণের কিছু পূর্ব হতেই তারা প্রশান্ত মহাসাগরের অধিকৃত দ্বীপপুঞ্জ হ'তে অনেকটা বিনাযুদ্ধেই পিছিয়ে আসতে সুরু করেছে। ব্রহ্ম থেকেও তারা পিছনের দিকে চলল।

দ্রুতগতিতে ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে আসছে রেঙ্গুণের দিকে।

নেতাজী তখনও রেঙ্গুণে।

মন্ত্রীরা পদস্থ সেনানীরা প্রত্যেকেই নেতাজিকে রেঙ্গুণ ত্যাগের জন্য বারংবার অনুরোধ জানাতে লাগল, তিনি কিন্তু অচল অটল।

রেঙ্গুণ ত্যাগ করে তার সৈন্যদের ছেড়ে নিজ হাতে গড়া ঝান্সী বাহিনীকে আসন্ন ব্রিটিশ সৈন্যের মুখে ফেলে কিছুতেই তিনি কোথাও যাবেন না।

অবশেষে ২৪শে এপ্রিল আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের ও জাপানীদের অনুরোধ ও পীড়াপীড়িতে তিনি রেঙ্গুণ সহর ত্যাগ করতে একপ্রকার বাধ্য হলেন।

জাপানীদের একজন জেনারেল নেতাজিকে নিরাপদে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্বয়ং এসেছে।

জেনারেল বললে, 'নেতাজি, আর দেরী করবেন না। ব্রিটিশ সৈন্য এগিয়ে আসছে একেবারে দরজায়।'

'কিন্তু এদের এমনি করে অসহায়ের মত ফেলে আমি কোথায় যাবো। এরাই যে আমার জীবনের সব, আশা আকাঙ্খা—'

বিপ্লবীর চোখেও বুঝি দেখা দেয় অশ্রু।

'না না—আপনাকে যেতেই হবে—'

'না, যাবো না। এদের সকলের সঙ্গে যদি আমার যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন তবেই যাবো, নচেৎ আমি যাবো না। মরতে হয় এদের সংগেই আমি মরবো।—'

'এখানে থেকে আর কোনই লাভ হবে না নেতাজি। টোকিওতে গিয়ে হয়ত এদের কোন একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে। আপনি এখানে থাকলে সে সব কিছুই সম্ভব হবে না।

রাত্রি গভীর।

২৪শে এপ্রিলের জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রি।

একটু পরে সকলের প্রিয় আদরের নেতাজি চলে যাবেন।

সকলে এসে চারপাশে নেতাজিকে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। সকলের মনই অশ্রুভারে পীড়িত।

মেয়েরা নেতাজিকে যেন আঁচলের তলায় সমস্ত আসন্ন বিপদ থেকে আড়াল করতে চায়।

কে একজন তাদেরই মধ্যে নেতাজির প্রিয় গানটি গেয়ে উঠ্‌ল।

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে।
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার—

হুঁশিয়ার যাত্রী! হুঁশিয়ার।

রেঙ্গুণ সহরের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার ও ভারতীয় অধিবাসীদের ধনপ্রাণের নিরাপত্তার যাবতীয় ব্যবস্থার জন্য কর্ণেল লোকনাথনের নেতৃত্বে আজাদ হিন্দ ফৌজের একটি দল রেঙ্গুণে নেতাজির আদেশে থেকে গেল।

জাপানী হাওয়াই জাহাজে নেতাজি রেঙ্গুণ ত্যাগ করে ব্যাংককে যান, সেখান হতে যান সিঙ্গাপুরে।

সিঙ্গাপুর জাপানীরা যখন বিনা যুদ্ধে ত্যাগ করে গেল, নেতাজি বিমানযোগে আবার টোকিও অভিমুখে যাত্রা করেন।

১৯৪৫য়ের ২৩শে আগষ্ট জাপ নিউজ এজেন্সী ঘোষণা করে বিমান দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ফলে হাসপাতালে নেতাজির মৃত্যু-সংবাদ।

কিন্তু সত্যিই কি সেই মহামানবের দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটেছে?

সত্যিই কি নেতাজি নেই?

নেতাজি সুভাষের মৃত্যু ভারতের জাতীয় জীবনের এক শোচনীয়তম অবিশ্বাস্য দুর্ঘটনা। ভারতের আত্মা আজও ঐ মর্মান্তিক দুঃসংবাদকে সত্য বলে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে নি।

নেতাজির মৃত্যু হ'তে পারে না।

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিবৃত্তের পাতায় নেতাজির অমর অবদান—তার তো মৃত্যু নেই! শেষ নেই!

সুভাষ শুধু নেতাজিই নন, অগণিত জনগণের আপন জন—পরমাত্মীয়।

তিনি ভারতের লেনিন ও ওয়াশিংটন।

এগিয়ে গিয়েছেন নেতাজি:

তু শেরে হিন্দ্‌ আগে বঢ়—
মরণসে ফিরভী তু ন ডর,
আসমানতক উঠাকে শির
জোরসে বতন বঢ়ায়ে যা—

—নয়—

ভারতে ইংরাজ শাসনের সত্যিই তুলনা নেই।

ভগবানের গলাতেও তারা ফাঁসির দড়ি পরিয়ে দিয়েছে।

কায়েমী শ্বেতাঙ্গ শক্তির পদতলে অত্যাচারিত, দুঃসহ লাঞ্ছনা অবমাননা ও উৎপীড়নে রক্তাক্ত ভারতের দীর্ঘ পৌণে দুই বৎসরের সুদীর্ঘ ইতিহাসের পাতায় পাতায় যে সব অবিস্মরণীয় কীর্তির আখর পড়েছে তাদেরই অন্যতম দিল্লীর লালকিল্লার মধ্যে যুদ্ধ শেষে আত্মসমর্পিত আজাদ হিন্দ ফৌজের অফিসার ও সেনানীদের হাস্যকর বিচারের প্রহসন পর্ব।

অপরাধ তাদের গুরুতর, রাজদ্রোহ, সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার অভিযোগ।

কর্ণেল শাহ নওয়াজ, ক্যাঃ পি. কে. সাইগল ও ক্যাঃ ধীলন প্রভৃতি আজাদ হিন্দ বাহিনীর কয়েক জন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে শ্বেতাঙ্গ সরকার —সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ও খুন বা খুনের সহায়তা।

মকদ্দমা চলতে থাকাকালেই ২৬শে নভেম্বর বুধবার কলকাতা সহরে ছাত্রের দল বিরাট এক শোভাযাত্রা ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট থেকে বের হ'য়ে কয়েকটি রাস্তা ঘুরে কলেজ ষ্ট্রীটে যাবে বলে স্থিরীকৃত হয় নিজেদের মধ্যে এক সভায়।

পূর্বপরিকল্পনানুযায়ী শোভাযাত্রা ঐ দিন ধর্মতলা ষ্ট্রীট হয়ে যেমন ম্যাডান ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে হাজির হয়েছে, সশস্ত্র পুলিশ এসে শোভাযাত্রার পথ রোধ করে দাঁড়াল অপরাহ্ণ চার ঘটিকায়।

শোভাযাত্রা সেইখানে থেমে কয়েকজন নেতার উপদেশ চেয়ে সাক্ষাতের প্রার্থনা জানায় কিন্তু ইতিমধ্যেই পুলিশের হস্তধৃত অগ্নিনালিকা-মুখে মৃত্যু গর্জন করে ওঠে।

দুম। দুম্ দুদুম!

ছাত্রনেতা রামেশ্বর ব্যানার্জী প্রমুখ তিনজন সঙ্গে সঙ্গে রক্তাক্ত কলেবরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

এবং তাদের শেষ নিশ্বাস বায়ুস্তরে মিলিয়ে যায়।

সম্মুখে তাদের তিনটি সাথীর রক্তাক্ত প্রাণহীন দেহ ধূলায় পথের মধ্যে পড়ে আছে—সকলে স্থির নির্বাক অকম্পিত।

ক্রমে জনতা চারপাশে এসে হাজারে হাজারে লাখে লাখে জড়ো হয়।

ট্রাম বাস লোক চলাচল বন্ধ।

শ্বেতাঙ্গ পুলিশ শোভাযাত্রীদের মধ্যে এসে তাদের দুই ভাগে বিভক্ত করে দেবার চেষ্টা করে—একদল পূর্বদিকে একদল পশ্চিমদিকে।

এবং যে মুহূর্তে তারা মিলিত হবার চেষ্টা করে তাদের নিয়ন্ত্রণের অজুহাতে পুলিশ ছাত্রদের উপরে একদফা লাঠি চালিয়ে নেয়।

অনেকেই লাঠির আঘাতে আহত হয় কিন্তু তথাপি তারা কোন প্রতিরোধ জানায় না।

অহিংস।

ঐ সময় কোথা হ'তে দু'একটি ইষ্টকখণ্ড ঐ স্থানে এসে পড়ায় পুলিশ আবার গুলিচালায়।

আবার কয়েকটি ছাত্রের গুলিবিদ্ধ রক্তাক্ত মৃতদেহ মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে।

ঐ দুঃসংবাদ পেয়ে কিরণশঙ্কর, শ্যামাপ্রসাদ, রাধাবিনোদ পাল প্রভৃতি দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন।

রাত্রি এগারটায় বাংলার তদানীন্তন গভর্নর কেসিও ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয়।

সকলেই ছাত্রদের ফিরে যেতে অনুরোধ জানায়, কিন্তু ছাত্রের দল সঙ্কল্প হতে চ্যুত হয় না।

ইংরাজ শাসনে অনেক বর্বর নীতিরই স্বাক্ষর পড়েছে কিন্তু নিরস্ত্র অহিংস ছাত্রদের শোভাযাত্রার উপরে গুলিবর্ষণ করা বোধহয় একমাত্র ভারতে শ্বেতাঙ্গ শাসন-নীতিতেই স্থান পেয়েছে।

পরের দিন ২২শে শোভাযাত্রা আবার অগ্রসর হয় এবং সেদিনও পুলিশের দু'এক রাউণ্ড গুলিবর্ষণ সত্বেও তারা নিজেদের নির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হ'য়ে যায়।

রক্তদানের পর্ব কি শেষ হবে না!

এমনি করেই কি তা চলবে অব্যাহত!

মাষ্টারদা! সৃষ্টিধর সান্যাল তার কলকাতার মেসের ঘরে গভীর নিশীথে একাকী মোমবাতির আলোর সামনে বসে ডাইরী লিখছে।

পালিয়ে এলাম! মৃণালের ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

মনে পড়ছে আজ ওদের সকলের কথাই—নীলাঞ্জন, দিদি হিরণ্ময়ী, বিনয়, সতীশ, সতী, মৃণাল, সন্তোষ আর মহাশ্বেতা!

আশ্চর্য লাগলো ঐ মেয়েটিকে মহাশ্বেতা-শ্বেতা।

সতীও নয় মৃণালও নয়, মহাশ্বেতা-শ্বেতা।

আগামী ১৫ই আগষ্টকে ওরা মানে না।

১৫ই আগষ্টকে নাকি ওরা চায় নি। শ্বেতাঙ্গ পরিকল্পিত দ্বিখণ্ডিত ভারতকে ওরা চায়নি, চেয়েছিল অখণ্ড ভারত। কারণ ওরা বলে, এই দ্বিখণ্ডিত ভূখণ্ড নিয়েই অদূর ভবিষ্যতে আবার ভারতে জ্বলে উঠ্‌বে অগ্নিশিখা। তারই পূর্ব সূচনা তারই বীজ রোপন করে যাচ্ছে শ্বেতাঙ্গরা।

মহাশ্বেতা ত স্পষ্টই বললে, এই ক্ষমতা হস্তান্তরের পরেই ত' সুরু হবে আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের শেষ অধ্যায়। পলাশী থেকে সুরু করে এই ক্ষমতা হস্তান্তর পর্যন্ত দীর্ঘকালব্যাপী সঞ্চিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিশ্চয়ই আমরা করবো। আর সেই দিনের যজ্ঞে আপনাকেও আমরা আমাদের পাশে পাশে চাই সৃষ্টিধর বাবু!—

মৃদু হেসেছিলাম।

মহাশ্বেতা কিন্তু বলে উঠ্‌লো, হাসছেন যে, জানেন পাকা সৈনিক আপনারা। আপনাদেরই ত সেনাপতি করে সংগ্রামের পুরোভাগে দাঁড় করাবো!—

তারও কোন প্রয়োজন হবে না মহাশ্বেতা! আগামী দিনের সৈনিক ঘরে ঘরে তৈরী হচ্ছে, তারাই এসে অস্ত্র ধরবে দেখো। দুইশত বৎসর ধরে

যারা প্রাণ দিয়ে গেল, সঞ্জীবনী জীবন সুধা যারা ভারতবাসীর অন্তরে অন্তরে বিলিয়ে দিয়ে গেল সে কি এমনি করে ব্যর্থ হয়ে যেতে পারে।—'

আশ্চর্য সন্তোষ !

সেও যেন এই বয়েসে মহাশ্বেতার ডাকে সাড়া দিয়েছে।

দীর্ঘ দিনের রণক্লান্ত সৈনিক যেন নতুন করেই আবার যুদ্ধের প্রস্তুতিতে মেতে উঠেছে।

সন্তোষকে মহাশ্বেতা ডাকে, কমরেড্ বলে।

মহাশ্বেতাও সন্তোষকে ডাকে, কম্‌রেড্।

কর্মীরা নাকি প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কম্‌রেড্।

সাম্যের পূজারী ওরা সকলেই।

সাম্যবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা চায় ওরা।

আসবার সময় বার বার করে বলে দিয়েছে ওরা সময় পেলেই যেন কলকাতায় ওদের সঙ্গে গিয়ে দুটো দিন কাটিয়ে আসি।

প্রতিশ্রুতি দিতে পারিনি।

অত্যাসন্ন স্বাধীনতা উৎসবের জন্য সমগ্র কলকাতা মহানগরী জুড়ে চলেছে উৎসবের আয়োজন। সতীকে নিয়ে তাই চলে এসেছি গ্রামে।

শেষবারের মত গ্রামে কটা দিন বাস করে যেতে চাই। কে জানে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের পর এখানে আর বাস করা চলবে কি না।

মনে পড়ছে কত দিনের কত কথা।

ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে স্বাধীনতার জন্য ভারতভূমিতে যে নৌসেনাদের বিদ্রোহ হয়ে গেল মনে পড়ছে সেই নৌবিদ্রোহের কথাই।

নৌবলেই বলীয়ান ছিল ব্রিটিশ।

এবং বহুবার তারা ব্যক্ত করেছে, যতদিন ভারতে নৌশক্তি তাদের অক্ষুণ্ণ থাকবে কাউকে তারা ডরায় না।

১৯৭৬ সনের ফেব্রুয়ারীতে সেই নৌবাহিনীই যখন শ্বেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করল, ভারতে মুমূর্ষু শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদের শেষ ভিত্‌টাও যে নড়ে উঠেছে তা বুঝতে আর কারোই বাকী ছিল না।

২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সন—সহরের সর্বত্র সংবাদপত্রের বিশেষ সান্ধ্য সংস্করণে যেন সচকিত হয়ে উঠ্‌লো।

দাবাগ্নির মতই একটা সংবাদ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো।

বোম্বাইয়ে ভারতীয় নৌসেনাদের বিদ্রোহ।

নৌবিদ্রোহ! নৌসেনারা বিদ্রোহী।

বোম্বাইয়ের ভারতীয় নৌসেনারা অনেকগুলো জাহাজ দখল করে ফেলেছে এবং কাস্‌ল ব্যারাকের মধ্যে ঘাঁটি করে ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে রীতিমত লড়াই চালাচ্ছে।

Open fight!

কাসল ব্যারাকের অস্ত্রাগারটিও বিদ্রোহী নৌসেনারা নিজেদের দখলে নিয়েছে।

ইংরাজ বুঝতে পেরেছিল ঠিক ১৯৪৬ সনে নৌবিদ্রোহ ভারতে কুইট্ ইণ্ডিয়া—ভারত ছাড়োর অন্য একটি অধ্যায়।

বহুদিন থেকেই ভারতীয় পদাতিক ও নৌসৈন্যদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে এসেছে শ্বেতাঙ্গ কর্তারা। বহুজনকে প্রলোভন দেখিয়ে যুদ্ধের দরুণ সামরিক বাহিনীতেও টেনে আনা হয়েছিল। অতঃপর যুদ্ধ যখন থেমে গেল দেখা গেল সব ভুয়ো। সব ফাঁকি। স্রেফ্ ইংরাজ সরকারের ভাঁওতা।

সাম্রাজ্যরক্ষার তাগিদে ইংরাজ সৈন্যদলে ভর্তি করবার সময় সকলকে অনেক আশ্বাসই দিয়েছিল। এখন হতভাগ্যদের প্রতি বিন্দুমাত্রও দৃষ্টি না দিয়ে সৈন্যদল ভেঙে দিতে সুরু করল।

তারপর সৈন্যদের মধ্যে সাদা ও কালার পার্থক্য!

শ্বেতাঙ্গের চিরাচরিত ঘৃণিত নীতি।

'তলোয়ারের' যে নৌশিক্ষার্থীরা প্রথমে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাদের প্রধান অভিযোগই ছিল শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের তারতম্য।

যেমনি দৃষ্টিকটু তেমনি বিসদৃশ।

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ কর্তারা সৈন্যদের অভিযোগে কোনরূপ দৃষ্টিদান করাটাও প্রয়োজন মনে করলে না চিরদিন যেমন তারা কখনো করে আসেনি ঠিক তেমনি করেই।

ভুলে গিয়েছিল হয়ত তারা প্রায় পৌণে দুই শত বৎসর আগেকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল ও মালেকান সত্বই বুঝি চলে আসছে এখনো।

ইংরেজ সোলজার ও দেশী সেপাইতে অনেক অনেক তফাৎ।

তলোয়ারের শিক্ষার্থীদের আরো একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল নৌনায়ক—শ্বেতাঙ্গ কমাণ্ডার কিংয়ের বিরুদ্ধে।

কিং ভারতীয় সৈনিকদের কুলীর বাচ্চা ছাড়া কথনো সম্বোধনই করত না।

১৮ই ফেব্রুয়ারী 'তলোয়ার' নৌশিক্ষা কেন্দ্রে ধূমায়িত অসন্তোষের বহ্নি আর চাপা রইলো না।

এগার শ'ত কর্মী ধর্মঘট সুরু করল।

এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী 'তলোয়ার'য়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করলে 'নাসিক', 'কলাবতী', 'আউধ' ও 'নিলাস' জাহাজও।

অসন্তোষের আগুন ছড়িয়ে যেতে লাগল এবং দেখতে দেখতে এগারশত ধর্মঘটির সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াল বিশ হাজারে।

'ফিরোজ', 'আকবর' ও 'মাচলিমার' নৌশিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা ও ডকইয়ার্ডের সিগন্যাল ষ্টেশনের কর্মীরাও ধর্মঘটিদের সঙ্গে এসে হাত মিলাল।

পাশে এসে দাঁড়াল।

বিরাট শোভাযাত্রা সহরের রাজপথ ধরে এগিয়ে চললো।

যে সব লরী ও ট্রাক ধর্মঘটিদের অধীনে ছিল তার উপরে কংগ্রেস, লীগ ও মজদুরদের লালঝাণ্ডা পত্ পত্ করে উড়তে লাগল।

ঝাণ্ডা উঁচা রহে হামারা।

তু শেরে হিন্দ্ আগে বঢ়।

মরনে সে ফিন্ ভী তুন ডর।

২রা ফেব্রুয়ারী ভারতীয় নৌবহরের তদানীন্তন প্রধান সেনাপতি ভাইস এড্মিরাল গড্ক্রে যখন 'তলোয়ার' পরিদর্শনে গিয়েছিল তখন পদ ও শক্তিগর্বে গর্বিত সেনাপতি কি বুঝতে পারেনি যে সামরিক বাহিনীর গতানুগতিক চিন্তা ও নীতিতে একটা পরিবর্তনের রক্তরাঙা ইংগীত সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে?

টেলিগ্রাফিষ্ট পি, সি, দত্ত ত' স্পষ্টই দেওয়ালের গায়ে লিখে দিল: ভারত ছাড়ো! জয় হিন্দ্।

শ্বেতাঙ্গ গডক্রে আক্রোশে যেন একেবারে বোমার মতই ফেটে পড়লো।

অবিলম্বে দত্তকে গ্রেপ্তার করবার আদেশ জারী হলো।

মূর্খ সেনাপতি ভেবেছিল পি, সি, দত্তর কণ্ঠরোধ করতে পারলেই এবং

তাকে কারারুদ্ধ করতে পারলেই বুঝি শত শত লাখো লাখো কণ্ঠের দাবী 'ভারত ছাড়ো' দাবিয়ে রাখতে পারবে।

জয় হিন্দ্ ধ্বনিকে থামিয়ে দিতে পারবে।

১৮ই ফেব্রুয়ারীই তার প্রমাণ পাওয়া গেল।

বিক্ষুব্ধ ধর্মঘটিরা বহু ইউরোপীয় পুলিশ অফিসার ও সৈনিককে প্রহার করলো।

বহু ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠানের উপরে হামলা করলে।

দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত আক্রোষ লকলকে শিখায় যেন জ্বলে উঠ্‌লো।

২১শে ফেব্রুয়ারী দেখা গেল পুরোপুরি ভাবেই বিদ্রোহ চারিদিকে।

'তলোয়ার', 'নাসিক', 'কলাবতী' প্রভৃতি কুড়িখানা জাহাজের মাস্তুল-শীর্ষে কংগ্রেস ও লীগের পতাকা ত' পতপত্ শব্দে সগৌরবে উড়ছেই, এমন কি সেনাপতি গড্‌ফ্রের নিজস্ব ফ্লাগ্‌শীপ 'নর্মদা' পর্যন্ত বিদ্রোহীদের করতলগত।

'নর্মদার' মাস্তুল-শীর্ষেও উড়ছে না আর শ্বেতাঙ্গের ইউনিয়ন জ্যাক্—উড়ছে সেখানে কংগ্রেসের তেরাঙ্গা পতাকা!

নৌ-বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই নগরীতে সুরু হয়ে গেল ব্যাপক হাঙ্গামা!

চারিদিকে আগুন!

> ভৈরব, তুমি কী বেশে এসেছ,
> ললাটে ফুঁসিছে নাগিনী;
> রুদ্রবীণায় এই কি বাজিল
> সুপ্রভাতের রাগিনী!

বোম্বাই নগরীর কলহাবাও ও গিরগাঁও অঞ্চলে বিদ্রোহী জনতা ট্রাম, বাস আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে সরকারী অফিস ও দোকান লুঠ করে রাস্তায় ব্যারিকেড্ বানিয়ে ফেলল।

শ্বেতাঙ্গের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মুহুর্মুহু গুলি চালাতে লাগল।

ধোঁয়া-বারুদের গন্ধে ও রক্তে মহানগরীর আকাশ বাতাস বিষাক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

বোম্বাইয়ের মেরিণ ড্রাইভ ও আন্ধেরীতেও নৌ-সেনারা অন্যান্য নৌ-কর্মীদের প্রতি সমর্থনে করল ধর্মঘট।

বোম্বাই থেকে আগুন কলকাতায়, মাদ্রাজে এবং করাচীতেও ছড়িয়ে গেল।

কলকাতার বেহালাস্থিত শিক্ষাকেন্দ্র 'হুগলী'র শিক্ষার্থীরা, মাঝেরহাটের নৌ-সেনারা এবং মাদ্রাজে 'আদিয়ার' নামক রণতরীর সৈনিকেরা কাজ বন্ধ করে অন্যান্য ধর্মঘটিদের সঙ্গে সাড়া দিল।

করাচী নৌ-ঘাঁটিতে বিদ্রোহের আগুন ভীষণাকারে দেখা দিল: 'হিমালয়' ও 'বাহাদুর' জাহাজের শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষার্থীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে আর 'হিন্দুস্থান' জাহাজের নৌ-সেনারা সিগন্যাল ছড়িয়ে দিল: আমরা চরম ভাবেই জানিয়ে দিচ্ছি সন্ধ্যা ছয়টার মধ্যে সরকার আমাদের দাবী যদি না মেনে নেয় তাহ'লে অগ্নিনালিকা মুখেই আমরা যুদ্ধ ঘোষণা করব।

'হিন্দুস্থান' এসে দাঁড়াল সকলের পুরোভাগে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে।

এবং সর্বত্র হিন্দুস্থানের নৌ-সেনারা সিগন্যাল ম্যাসেজে অন্যান্য বিদ্রোহীদের নির্দেশ পাঠাতে সুরু করল। বিদ্রোহ!

নৌ-বিদ্রোহ!

সামরিক পুলিশ 'হিন্দুস্থান'কে লক্ষ্য করে গুলি চালাতেই প্রচণ্ড শব্দে কামানের মুখে অগ্নুদ্গার দেখা দিল। ২১শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে বিলাতের কমন্স সভায় ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী ক্লিমেট এট্‌লী এক বিবৃতি দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ভারতে যে নৌ-সেনাদের মধ্যে গোলযোগ দেখা দিয়েছে তার জন্য চিন্তার কোন কারণ নেই। কারণ ব্রিটিশ নৌ-বহরের কতকগুলো জাহাজ বোম্বাই অভিমুখে ইতিমধ্যেই রওনা করে দেওয়া হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে নয়াদিল্লীর হেডকোয়ার্টার থেকেও সগৌরবে জানান হল: ভয় নেই! বেশ বড় রকমের একটা নৌ, স্থল ও বিমানদল বোম্বাই, পুণা ও করাচীর দিকে রওনা হয়ে গিয়েছে।

ভারতের প্রধান নৌ-সেনাপতি গড্‌ফ্রে বোম্বাই বেতারকেন্দ্র হতে হুমকি দিল, বিদ্রোহীরা যদি মনে করে থাকে যে গভর্নমেণ্টের শক্তি এই সামান্য বিদ্রোহকে দমন করতে পারবে না তবে মহাভুলই তারা করেছে। এবং প্রয়োজন হলে তারা (গভর্নমেণ্ট) তাদের আজকের এই গৌরবের নৌ-বহরকে ধ্বংস করে ফেলতেও এতটুকু দ্বিধা বোধ করবে না। অতএব বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কোন লাভ হবে না। তবে হাঁ, যদি সব শান্ত হয় তবে নৌ-সেনাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত ও প্রতিবিধানের সম্পূর্ণ আশ্বাস দিচ্ছি।

অভাব অভিযোগের সম্পর্কে তদন্ত আর প্রতিবিধানের আশ্বাস।

শ্বেতাঙ্গের ঐ ধরণের নীতিবচন আওড়ান নতুন নয়। তাই নৌ-সেনারা কোন কর্ণপাতই করল না গড্‌ফ্রের কথায় এবং গড্‌ফ্রের কথাও যে একেবারে নেহাৎ একটা মৌখিক ভীতি প্রদর্শন নয় তারই প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ রাত্রেই।

বোম্বাইয়ের পোতাশ্রয়ে ভারতীয় নৌ-বহরের একটা অংশ এসে বিদ্রোহী

নৌ-বহরের পাহারায় নিযুক্ত হলো। রাত্রির নক্ষত্রখচিত কালো-আকাশ জুড়ে চলতে লাগল বোমারু ও জঙ্গী বিমানগুলোর ক্রুদ্ধ ভঁ-ভঁ প্রপেলারের শব্দ জাগিয়ে সদম্ভ সতর্ক প্রহরা।

এবং সমস্ত রাত্রি ধরেই প্রায় উভয় পক্ষে কামান ও মেসিনগানের মুখে মুখে বিনিময় চলতে লাগল গোলা-গুলির।

গোলাগুলি-মথিত ২১শে ফেব্রুয়ারীর দুর্যোগময়ী রাত্রি প্রভাত হলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী।

বোম্বাই নগরীতে বিদ্রোহের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে।

নগরীর পথে পথে বিক্ষুব্ধ জনতা—শ্রমিক, ছাত্র, সর্বসাধারণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে।

কলহবা, ভুলেশ্বর ও গিরগাঁওয়ে সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী সমস্ত দিনে কুড়িবার গুলি চালাল বিদ্রোহীদের উপরে বেপরোয়া।

ষাটজন সেই গুলিবর্ষণের মধ্যে প্রাণ দিল এবং ছয় সহস্রাধিক বিদ্রোহী হলো আহত।

রক্তে ভিজে গেল কলহবা, গিরগাঁও ও ভুলেশ্বরের পথের ধূলি।

বিদ্রোহীরাও ইম্পীরিয়াল ব্যাংকের তিনটি শাখায় হানা দিয়ে ভেঙ্গে-চুড়ে সব তচ্‌নচ্‌ লণ্ডভণ্ড করে দিল।

চল্লিশটা সামরিক লরী দিল আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে, বারটা ডাকঘর ও সরকারের ত্রিশটা র‍্যাসন শপ্‌ লুঠ করে নিল।

একজন পুলিশ হলো নিহত এবং সাঁইত্রিশজন অফিসার ও নব্বুইজন কনেষ্টবল হলো আহত।

নৌ-সেনাপতি গড্‌ফ্রের বেতার হুমকির উপযুক্ত প্রতিবাদ।

বিদ্রোহীরা জাতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করল।

বোম্বাইয়ের সমাজতন্ত্রী নেতা পুরুষোত্তম দাশ শান্তি স্থাপনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের পরামর্শক্রমে ও তাঁর আশ্বাসদানে বিদ্রোহী নেতারা আত্মসমর্পণে রাজী হলো।

২২শে ফেব্রুয়ারী রাত্রে 'তলোয়ারের' কেন্দ্রীয় বৈঠকে কাসল ব্যারাক ও বিদ্রোহী অধিকৃত জাহাজগুলিকে বিনা শর্তে আত্মসর্পণের জন্য নির্দেশ দেওয়া স্থিরীকৃত হলো।

এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্রত্যুষে ৬টা ১৩ মিঃ সময়ে সর্বত্র আত্মসমর্পণের সাংকেতিক বার্তা প্রেরিত হলো। একে একে বিদ্রোহী জাহাজগুলো আত্মসমর্পণ করল।

স্বষ্টিধর লিখে চলেছে তখনও।

এতদিনে বোধ হয় শ্বেতাঙ্গ শক্তি সত্যি সত্যিই বুঝতে পেরেছিল যে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে এই দীর্ঘ পৌণে দুইশত বৎসর ধরে তাদের শাসনযন্ত্র দাঁড়িয়েছিল এবারে তা নড়ে উঠেছে।

কসাইখানা থেকে আজ আর গরুতে গরুর মাংস বহে নিয়ে আসতে রাজী নয়।

সৈন্যবাহিনীর যে অন্ধ চির-আনুগত্যকে আশ্রয় করে শ্বেতাঙ্গের নির্মম শাসন ও রক্তশোষণের লৌহকঠিন কাঠামো ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অভিযানের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল আজ আর বুঝি তার উপর নির্ভর করা চলে না।

আজ আর ভারত ছাড়া ব্যতীত দ্বিতীয় কোন পথই নেই।

এবারে মানে মানে বিদায় নেওয়াই ভাল।

১৮৫৭র অগ্নিমুহূর্তে বিপ্লবের যে অগ্নিশিখা সর্বপ্রথম ভারতে যত শ্বেতাঙ্গ শক্তিকে বিদূরিত করবার জন্য দেখা দিয়েছিল তাই পরে ১৯০৫—১৯০৮ সনে যে বিদ্রোহের অগ্নিনালিকা মুখে গর্জন শোনা গিয়েছিল ক্রমে সেটাই প্রথম মহাযুদ্ধের পর সমগ্র ভারতব্যাপী জাগরণ আনে এবং ক্রমে সেই জাগরণের অগ্নিস্ফুলিংগ বিপ্লবের হুতাশন জ্বালিয়ে তুলল। সেই শিখার সঙ্গে যুক্ত হলো পৃথিবীব্যাপী নির্যাতীত ও পরাধীন মানুষের অত্যুগ্র মুক্তি-কামনা। মধ্য-প্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরের তীর হ'তে এশিয়ার পূর্ব দিগন্তের প্রশান্ত মহাসমুদ্রের কূল পর্যন্ত কোটি কোটি মানুষের তূর্যনিনাদে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বসে পড়ল।

১৯১৭ সালে ইউরোপের আকাশে রুশের গণবিপ্লবের যে রক্তছায়া পড়েছিল, ধনিকসমাজ তাতেই ভীত ও চকিত হয়ে ওঠে।

প্রণাম জানাল সেই রক্তাক্ত গণবিপ্লবকে দূর হ'তে ভারত ও চীনের অগণিত বিপ্লবী জনগণ।

অলক্ষ্য রুশ, এশিয়া ও ভারতের নাড়ীতে নাড়ীতে যেন একট বন্ধন পড়লো।

এবং ১৯৪৫ সনে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে সেই অলক্ষ্য নাড়ীর টানেই বিজয়ী রুশকে কেন্দ্র করে এশিয়ার অগণিত মানুষকে সাম্রাজ্যবাদের শেষ দুর্গ-প্রাকারের মূলে দুঃসাহসিক আঘাত হানবার জোগাল প্রেরণা।

ব্রিটেনের সমাজজীবনেও এক অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন ঘটে গেল।

গোঁড়া রক্ষণশীল দলের পরিবর্তে সমাজতন্ত্রবাদী শ্রমিক দলের রাষ্ট্রিক অভ্যুত্থান হলো এবং যার ফলে অবশ্যম্ভাবী গণবিপ্লবের সম্মুখীন না হ'য়ে শ্বেতাঙ্গ সরকার ভারতবাসীর সঙ্গে আপোষ ও শান্তির পথ খুঁজলো।

আগামীকাল ১৯৪৭য়ের ১৫ই আগষ্ট সেই শান্তি প্রতিষ্ঠার দিন।

এবং ঐ পনেরই আগষ্টই ভারতবর্ষ বৃটেনের সর্বপ্রকার শাসন ও শোষণের নাগপাশ হ'তে মুক্ত হ'য়ে আপন রাষ্ট্রিক স্বাধীনতায় হবে প্রতিষ্ঠিত।

ভারতের মানচিত্র হ'তে দীর্ঘ পৌণে দুইশত বৎসর পরে ব্রিটেনের সাম্রাজ্য-চিহ্নের লাল বর্ণ ১৫ই আগষ্ট মুছে যাবে এবং চল্লিশ কোটি মানুষের দেশে ব্রিটেনের ইউনিয়ন জ্যাকের বদলে সর্বত্র প্রাসাদ-শীর্ষে উড্ডীন হবে অশোকচক্র লাঞ্ছিত ভারতের নবপরিকল্পিত রাষ্ট্রীয় পতাকা।

পৃথিবীর চাকা অবিশ্রাম ঘুরে চলে।

ভারত-ইতিহাসের দুইশত বৎসরব্যাপী রক্ত-অশ্রু-অত্যাচার চিহ্নিত কলঙ্ক-কালিতে রেখাঙ্কিত অধ্যায়টি শেষ হলো।

ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হলো।

সুদীর্ঘকাল পরে আজ জাহাজ বোম্বাই হ'য়ে ব্রিটিশ সৈন্যরা—যাদের পূর্ব-গামীরা একদিন ক্লাইভের সঙ্গে সঙ্গে বেয়োনেট উঁচিয়ে ভারতভূমিতে পদার্পণ করেছিল, যারা দীর্ঘকাল ধরে বেপরোয়াভাবে শাসনের নামে হত্যা লুণ্ঠন ধর্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচার নির্বিচারে করে গিয়েছে দলে দলে,—তারা আজ ফিরে চলেছে।

জাহাজের সিটি বাজছে ভোঁ! ভোঁ···!

স্মৃতির পটে কি তাদের দুইশত বৎসরের রক্ত-স্মৃতি ভেসে উঠ্‌ছে না?

সত্যি, বিচিত্র আশ্চর্য এই ভারতবর্ষ।

সুনীল জলসমাধি হ'তে একদিন এই বিচিত্র ভূখণ্ড মূর্ত্যবিস্ময়ের মত জেগে উঠেছিল।

কোথায় কোন সুদূর অন্ধকার পর্বতগুহা হ'তে এসেছিল সর্বপ্রথম ভ্রাম্যমান যাযাবরের দল। তারপর আরো কত এলো, কত গেল।

শক হুন গ্রীক মুঘল পাঠান কত না জাতি কত না সংস্কার কত না ধর্ম!

কিন্তু কেউ চিরস্থায়ী হ'তে পারল না এই বিচিত্র ভারতভূমিতে।

ব্রিটিশ শ্বেতাঙ্গকেও তাই বুঝি আজ সুদীর্ঘকাল পরে বিদায় নিয়ে যেতে হলো একই নিয়মে।

পশ্চাতে রেখে গেল তারা বহু বিস্তীর্ণ পোড়ামাটি।

সিরাজ, মহারাজ নন্দকুমার, কাশেম আলি, ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল, কানাই, বাঘা যতীন, রামপ্রসাদ, রাজেন্দ্র, যতীন, সূর্য সেন, তারকেশ্বর, মাতঙ্গিনী, কনকলতা, রামেশ্বর প্রভৃতি বহু বিপ্লবীর বক্ষরক্তে সিক্ত এই ভারতের বহু বিস্তীর্ণ পোড়া মাটি কি আবার নতুন মানুষের পদধ্বনিতে মুখর হ'য়ে উঠবে না ?

অন্নহীন বস্ত্রহীন আচ্ছাদনহীন বাস্তুহারা অগণিত নির্যাতিত বঞ্চিত ভারতবাসীর মর্মভাঙ্গা হাহাকারে দিগদিগন্ত বিষিয়ে উঠ্‌ছে।

তাইত বিদ্রোহী ভারতের তামস-তপস্যা চলেছে আজো নবযুগের সেই নীলকণ্ঠের জন্য যে, অঞ্জলাভরে এই মৃত্যু-হলাহল আকণ্ঠ পান করে পরিবর্তে এই অগণিত বুভুক্ষিত নরনারীকে দেবে মৃতসঞ্জীবনী সুধা।

নতুন মানুষ রচনা করবে নতুন ইতিহাস।

হাঁ, রচিত হবে নতুন ভারতের ইতিহাস !

বিদ্রোহী ভারতের রক্ত-তপস্যার তাই এখনো শেষ পাই না।

দিগ্‌ হতে দিগন্তে তাই ভয়াল বিদ্রোহের রক্তিম অগ্নিশিখা।

হবে। তিমির রাত্রির অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে।

পলাশীর জনশূন্য প্রান্তরে আম্রকাননের নিবিড় বিষণ্ণ ছায়ায় মোহনলালের আত্মার দুই শতাব্দীব্যাপী মহানিদ্রা ভঙ্গের মহালগ্ন অত্যাসন্ন হ'য়ে এলো।

হবে না। বিদ্রোহী ভারতের মৃত্যুপণ ব্যর্থ হবে না।

যারা চলে গেল এই বিদ্রোহী ভারতের পৃষ্ঠায় রক্তস্মৃতি রেখে তাদের জানাই প্রণাম, আর জানাই সেই সঙ্গে আহ্বান—সেই অনাগতদের যারা আগামীকাল রচনা করবে নতুন ইতিহাস নতুন স্বাধীন ভারতের।

উদযাপন করবে বিদ্রোহী ভারতের মুক্তি-সঙ্কল্প।

প্রণাম।

বিদ্রোহী ভারত প্রণাম



—শেষ—